ভারতের সঙ্গীতগুণী

তৃতীয় খণ্ড

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩

নিবেদন

'ভারতের সঙ্গীতগুণী' তৃতীয় খণ্ড দেখা দিতেও অনেক সময় নষ্ট হল। সেই বিদ্যুৎ সঙ্কট, ছাপাখানায় বিশৃঙ্খলা, কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা আর চতুর্দিকে অব্যবস্থার ফলে অসহ পরিস্থিতি। এই দুর্যোগের মধ্যে বই প্রকাশের জন্যে ধন্যবাদ জানাতে হয় প্রকাশক মহাশয়কে।

মুদ্রণ, কাগজ ইত্যাদির দুর্মূল্যতা এবং সময়ের অপচয়ের জন্যে কি শোচনীয় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। বিগত যুগের স্মরণীয় শিল্পীদের জীবন-কথা ও দানের পরিচয় দেবার যে পরিকল্পনা ছিল, তা যেন সুদূরপরাহত হয়ে উঠছে নানা বিষম বাধাবিপত্তিতে। কিন্তু লেখক নিরুপায়। হতাশ্বাসে বাস্তব অবস্থাকে কেবল মেনে চলা ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

এই খণ্ডে যে কলাবৎদের প্রসঙ্গ বিবৃত হল, তাঁরা লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়র, মহারাষ্ট্র, আগ্রা, কাশী, গয়া ও বাংলার কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় গায়ক ও বাদক। তাঁরা অনেকেই স্বনামধন্য। আবার কোন কোন গুণী তেমন পরিচিত নন। কিন্তু উল্লিখিত প্রসিদ্ধ এবং অপরিচিত সকলেরই বিবরণ অপ্রকাশিত ছিল এ-যাবৎ। সেই হারানো-লোক থেকে উদ্ধার করা হল তাঁদের কীর্তি-কথা। এঁদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগের কোন প্রয়োজন নেই। এই মূল ভিত্তির ওপর তাঁদের মূল্যায়ন করা সম্ভব। সাঙ্গীতিক ইতিহাসের অঙ্গস্বরূপ শিল্পীদের সঙ্গীত-জীবন তথা সঙ্গীত-কৃতির পরিচয় দিয়েছি যথাসম্ভব যত্নে, যেমন সাধ্যমত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি। তাঁদের সম্পর্কে মুদ্রিত পুস্তক নেই বলা যায়, অন্তত বাংলায়। এসব বিবরণ আহৃত হয়েছে নানা নির্ভরযোগ্য পরম্পরা সূত্রে, এবং নিরপেক্ষ বিচার বিবেচনা করে। কখনো বা প্রকাশিত কোন কোন স্মারক পুস্তিকা থেকে মূল্যবান উপকরণ পাওয়া গেছে। বিশেষভাবে স্মরণ করি স্বর্গত জি. এইচ. রাণাডে মহাশয়ের সংগ্রহ থেকে সহায়তা পাবার কথা। মহারাষ্ট্রীয় গুণীদের সম্পর্কে তাঁর নিকটে আমি ঋণী।

বর্তমানের সঙ্গীত-শিল্পীরা বিগত যুগের গুণীদের দান এবং ভারতীয় সঙ্গীতের ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্য বিষয়ে অবহিত হোন, এই আবেদন জানিয়ে ইতি করি।

১৫ আগস্ট, ১৯৮১

ললিত নিলয়

৩৯ একবালপুর রোড,

কলিকাতা-২৩

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

উৎসর্গ

সঙ্গীতপ্রেমী শ্রীমুকুলচন্দ্র চক্রবর্তী

সঙ্গীতগুণী শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্তী

যুগল করকমলে

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

লেখকের অন্য কয়েকটি গ্রন্থ

সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ
বাঙ্গালীর রাগসঙ্গীতচর্চা
ভারতীয় সঙ্গীতে ঘরানার ইতিহাস
কথায় রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ
ভারতের সঙ্গীতগুণী (প্রথম খণ্ড)
ভারতের সঙ্গীতগুণী (দ্বিতীয় খণ্ড)
দরবার নটী কলাবন্ত (প্রথম পর্ব)
বিচিত্র প্রতিভা
আসরের গল্প
সঙ্গীতের আসরে
সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু
বিষ্ণুপুর ঘরানা
CHAITANYA

ছোটদের

কথায় কথায়
এশিয়ার রূপকথা
একদা যাহার বিজয় সেনানী

ভারতের সঙ্গীতগুণী

তৃতীয় খণ্ড

লক্ষ্ণৌ থেকে গোয়ালিয়র

গোলাম রসুল	হদ্দু, হস্‌সু খাঁ
শক্‌কর, মখ্‌খন	নিসার হোসেন
	এনায়েৎ হোসেন

আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ের কথা। তখন লক্ষ্ণৌর এক কলাবতের আসরে দেখা যায় এক আশ্চর্য দৃশ্য। তিনি গান শুরু করেছেন। সুরে বেশ জমে উঠেছে আসর। অমনি কটা বুলবুলি উড়ে আসে। জানলা দিয়ে ঢুকেই চড়ে বসে গায়কের কাঁধে, মাথায়। আর চোখ পিট্‌পিট্‌ করে গান শোনে স্থির হয়ে।

কলাকার বিরক্ত হন না। তাড়িয়েও দেন না বুলবুলিদের। তারাও যেন আসরের শ্রোতা। কেমন বসে বসে শুনছে, শুনুক না। জ্বালাতন তো করেনি। তিনি গেয়ে যান আগের মতন।

তারপর এক সময় গান শেষ হয়। আর এদিক ওদিক চেয়েই ফুর্‌র্‌র শব্দে উড়ে যায় বুলবুলিরা।

এমন মিষ্টি গলা গায়কের। এত কণ্ঠ-মাধুর্য যে পাখিরাও তাঁর সুরের বশ। সে গানের সঙ্গে যেন বুলবুলিদের নিজের সুরের মিল।

লক্ষ্ণৌর ওস্তাদ গোলাম রসুলের নামে এই কিংবদন্তী জড়িয়ে আছে। যাঁর গান পাখিদেরও প্রিয়, তিনি শ্রোতাদের তো মনোহরণ করতেনই।

তবে শুধু মিষ্টত্বের জন্য গোলাম রসুল বিখ্যাত হননি। খেয়াল অঙ্গে এক দিকপাল গায়ক তিনি। এমন কি তাঁর থেকে এক খেয়ালীয়া পরম্পরা সৃষ্টি হয়ে যায়, যা ঐতিহাসিক হয়ে আছে। লক্ষ্ণৌ থেকে গোয়ালিয়রে তাঁর পরিক্রমণ। সেখানে স্থিতি। তারপর মহারাষ্ট্র ও নানা অঞ্চলে বিস্তৃতি।

খেয়াল গানের লক্ষ্ণৌ-কলম যে গোয়ালিয়রের মাটিতে পুষ্পিত হয়, তা গোলাম রসুলের বংশধরদেরই জন্যে। কিন্তু তাঁর সেসব পরিচয় প্রায় লুপ্ত। গোলাম রসুলের নাম পর্যন্ত যেন বিস্মৃত। বরং তাঁর পুত্র অনেক বেশী প্রসিদ্ধ আছেন সঙ্গীত জগতে।

গোলাম নবী অর্থাৎ শোরী মিঞা, টপ্পা গানের প্রথম নামী কলাবৎ। নিজের রচনা গানে তিনি 'শোরী' ভণিতা দিতেন। শোরী নাকি তাঁর দয়িতার নাম। তাই তিনি টপ্পার আসরে আজও জীবন্ত আছেন শোরী মিঞা নামে।

গোলাম নবী গানকে 'শোরীর টপ্পা' নামে সবাই মনে রেখেছে। আর ভুলেছে তাঁর পিতা গোলাম রসুলকে। যাঁর জন্ম আঠার শতকের প্রথম দিকে। আর মৃত্যু ১৭৭০-এর কাছাকাছি, লক্ষ্ণৌতেই।

গোলাম রসুলের ওস্তাদ কে, তা জানা যায়নি। তবে শোনা যায় যে, গোলাম প্রথমে ছিলেন ধ্রুপদী, তারপর হন খেয়াল-গায়ক।

স্বনামধন্য সেনীয়া সদারঙ্গের কাছে গোলাম রসুল খেয়াল শেখেন, এসব কথাও কোন সূত্রে নেই।

এখানে সদারঙ্গের প্রসঙ্গ কেন? কারণ কোন কোন মতে সদারঙ্গের শিষ্য বংশ থেকেই গোয়ালিয়রের হদ্দু, হস্সু খাঁর উৎপত্তি হয়েছে। (যেমন বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান' পৃষ্ঠা ৫৩, ৫৪, ২য় সং, ১৩৪৬।)

আর এই অধ্যায়ের বিষয় গোলাম রসুল। শক্কর ও মখ্খন। হস্সু খাঁ ও হদ্দু খাঁ। এখানে দেখা যাবে যে গোলাম রসুলের বংশ থেকেই গোয়ালিয়রে খেয়াল গানের ধারা পত্তন হয়েছে। আর সেই পরম্পরায় আছেন স্বনাম-প্রসিদ্ধ হদ্দু খাঁ, হস্সু খাঁ ভ্রাতারা।

গোলাম রসুলের সঙ্গীতজীবন লক্ষ্ণৌতেই কাটে। আর খেয়াল গানের একটি পরিবার গড়ে ওঠে তাঁর পরিণত বয়সে। গোলাম রসুলকে কেন্দ্র করেই সেই সঙ্গীতধারা। সেই খেয়াল রীতিতে, তাঁর

পুত্র হয়েও গোলাম নবী নেই। তিনি মশগুল রইলেন জমজমা গিটকিরির দানাদার টানে।

এই মনোহারী টপ্পা রীতির ধারা প্রবর্তন করলেন গোলাম নবী বা শোরী মিঞা। তাঁর প্রধান শিষ্য গাম্মু। শাদে খাঁ হলেন সেই মিঞা গাম্মুর পুত্র। কাশী নরেশের দরবারী গায়ক হয়ে শাদে খাঁ শোরীর টপ্পাকে পূর্ব অঞ্চলে চলন করে দেন। তা আরেক প্রসঙ্গ।

ওদিকে গোলাম রসুলের দুই প্রিয় শিষ্যকে নিয়ে লক্ষ্ণৌতে খেয়ালীয়া ঘর গড়ে উঠল। শক্কর আর মখ্খন নামেই তাঁরা পরিচিত। ওস্তাদের বিদ্যা সম্পদ পেলেন শক্কর ও মখ্খন। যোগ্য দুটি আধার হয়ে তাঁরাই ওস্তাদের নাম রাখলেন।

শিষ্যদের এই অদ্ভুত নাম দুটি কিন্তু আসল নয়। সঙ্গীতগুণে নকল নামেই তাঁরা প্রসিদ্ধ। শর্করাবৎ মধুর আর নবনীতুল্য নমনীয় বলেই নাকি শক্কর, মখ্খনের নামকরণ।

শক্করের পৈতৃক নাম লুপ্ত হয়েছে স্বোপার্জিত গৌরবের আড়ালে। আর মখ্খনের নখন পীর বখস্ নামটি কোন রকমে রক্ষা পেয়েছে।

ওস্তাদের গানের সঙ্গে তাঁর ধরনের কণ্ঠসম্পদও পান দুই শিষ্য। শক্কর উপরন্তু গুরুকন্যাকেও লাভ করেন। গোলাম রসুলের জামাই হন তিনি। আর মখ্খন পুত্রবৎ প্রিয়। শক্কর মখ্খনের মধ্যে কোন আত্মীয় সম্পর্ক ছিল না।

উত্তর ভারতের সঙ্গীতে তখনো ধ্রুপদের প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য। আঠার শতকের সেই দ্বিতীয়ার্ধে খেয়ালের চর্চা খুবই কম। লক্ষ্ণৌর আরেকটি পরিবারে এ রীতির গান শোনা গেছে তাঁদের কিছু আগেই। সেই খেয়াল গায়করাও শিয়া সম্প্রদায়ের বটে। কিন্তু গোলাম রসুলের সঙ্গে তাঁদের কোন যোগাযোগ ছিল না। দুটি বংশ একেবারেই আলাদা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

তাঁদের সূত্রে সদারঙ্গের একটি কাহিনী আগে বলে নিতে হবে। তানসেনের কন্যাবংশীয় দিক্‌পাল গুণী ন্যামৎ খাঁ ওরফে সদারঙ্গ।

তাঁকে যথেষ্ট খাতির করতেন সঙ্গীত-প্রিয় মোগল বাদশা মহম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮)। তাঁর 'শাহ্ সদারঙ্গ' খেতাবও বাদশাহেরই দেওয়া। তবু দুজনের মধ্যে সেবার মনোমালিন্য ঘটে। সদারঙ্গ নিরুদ্দেশ হন দিল্লী দরবার ছেড়ে দিয়ে। তারপর অনেকদিন পরে আবার হঠাৎ এসে হাজির হন। সঙ্গে দুই তরুণ শিষ্য।

বাদশাহকে কুর্নিশ করে সদারঙ্গ বললেন, 'এই ছেলে দুটির গান একটু শুনবেন জাঁহাপনা? বড় ভাল গায়।'

মহম্মদ শাহ্ রাজি হতে, সদারঙ্গের সেই শিষ্যরা গান গাইলেন। আর শুনে চমৎকৃত বোধ করলেন বাদশাহ্। কারণ এই চালের গান তিনি কখনো শোনেননি।

সদারঙ্গ শিষ্যদের তালিম দিয়েছিলেন খেয়াল রীতিতে। আর এই অভিনব গান বাদশার এত ভাল লাগে যে সদারঙ্গের সঙ্গে তাঁর মনান্তরও মিটে যায়।

গল্পের মতন প্রচলিত আখ্যানটি। তবে এর মধ্যে সদারঙ্গের দুটি অনাত্মীয়কে তালিম দেওয়া কথাটি অন্তত সত্যি। কারণ সেই শিষ্য-বংশ সে গানের ধারা বজায় রাখেন। আর তাঁদের তিন পুরুষ পরেও পাওয়া যায় সে কথার সমর্থন। তার নজিরও পরে দেওয়া হবে।

সদারঙ্গের খেয়াল গান শেখানো লক্ষ্য করবার যোগ্য। কারণ, তানসেনের কন্যা বংশের ধারায় তিনি ধ্রুপদী এবং বীণকার। খেয়ালের চর্চা পরিবারে তিনিই প্রথম করলেন। ধ্রুপদের তুলনায় লঘুতর এই রীতি শেখালেন দুই অনাত্মীয় শিষ্যকে। সদারঙ্গ নিজে দরবারী আসরে খেয়াল গাইতেন না। (অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। নেপালের গোর্খা রাজদরবারে তিনি স্বরচিত একটি খেয়াল শোনান, সে প্রসঙ্গ অন্যত্র প্রাপ্তব্য।) সদারঙ্গের দুই পুত্র ফিরোজ খাঁ (অদারঙ্গ) ও ভূপৎ খাঁ (মহারঙ্গ) খেয়াল শোনাতেন না প্রকাশ্য আসরে। অথচ, খেয়াল সঙ্গীতের অন্যতম প্রচলন-কর্তা সদারঙ্গ। তাঁর রচনা বহু খেয়ালের বন্দিশ আজো আসরে আসরে শোনা যায়।

এখন সদারঙ্গের সেই শিষ্যদের বৃত্তান্ত। তাঁদের দুজনেরই জন্ম লক্ষ্ণৌতে। তাঁদের পিতা ছিলেন ধ্রুপদ-গায়ক। তাঁর নাম জানা যায়নি। তবে তিনি গোলাম রসুলের কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ভিন্ন ব্যক্তি। সে ধ্রুপদীর অকাল-মৃত্যু হয়। তাঁর দুই বালক পুত্রের নাম বাহাদুর ও দুল্‌হে।

নাবালক দুটিকে নিয়ে ধ্রুপদীর বিধবা স্ত্রী মহা বিপাকে পড়লেন। সহায়সম্বলহীনা। কোন সাহায্য পেলেন না আত্মীয়দের কাছেও। সন্তান দুটি পৈতৃক পেশা নিতে পারলেই ভবিষ্যতের আশা-ভরসা। আত্মীয়স্বজনরাও সেই বৃত্তিজীবী। কিন্তু তাঁদের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়েও অনাথিনী কোন আশ্বাস পেলেন না।

এই দুর্দিনে কোথা থেকে এসে পড়লেন এক ফকীর। নিজের কোন পরিচয় দিলেন না; কেবল বললেন, 'আমি গান বাজনা কিছু জানি।'

সেই বিধবা মহিলা তাঁকে প্রার্থনা জানালেন, 'দয়া করে আমার ছেলে দুটিকে তালিম দিন। আমাদের আর কেউ নেই। আমার স্বামীর মতন গানকেই যেন পেশা করতে পারে ওরা।'

তাঁকে দ্বিতীয়বার আর অনুরোধ করতে হল না। কারণ সেই উদ্দেশ্যেই তো এসেছেন ফকীর সেজে। তিনি ছদ্মবেশী সদারঙ্গ।

তাঁর কাছে বাহাদুর আর দুল্‌হের রীতিমত শিক্ষা আরম্ভ হল। যোগ্য আধার দুটিকে গড়ে দিলেন সদারঙ্গ। বাহাদুর ও দুল্‌হে খেয়াল গানে কৃতবিদ্য হলেন। তারপর সদারঙ্গ ফিরে গেলেন দরবারী জীবনে।

জ্যেষ্ঠ বাহাদুরের এক কন্যা ও পুত্র গাজী খাঁ। দুল্‌হের পুত্রের নাম ইউসুফ। পিতার শিক্ষায় গাজী ও ইউসুফ ভাল গায়ক হলেন বটে। কিন্তু দুজনেই অল্পায়ু। ইউসুফ মারা গেলেন নিঃসন্তান। আর গাজীর পুত্র নজর তখন নেহাত শিশু। তবে গাজীর বাবা বাহাদুর সে সময়েও বেঁচে। আর তাঁর দৌহিত্র আমীন একটু বড় হয়েছে।

বাহাদুর তালিম দিতে লাগলেন আমীনকে। তাকে তৈরী

করতে না পারলে এ বংশের বিদ্যাই যে শেষ হয়ে যাবে। লুপ্ত হবে সদারঙ্গের এই খেয়াল সম্পদ।

আমীনকে তিনি শেষ পর্যন্ত গড়ে দিলেন। আর মৃত্যুর আগে আমীনকে বাহাদুর আদেশ করে গেলেন, 'নজর আলী বড় হলেই তাকে ঘরানা বিদ্যা দস্তুরমত শেখাবে।'

তা কথা রেখেছিলেন আমীন। তাঁর তালিমে নজর আলী গুণী খেয়াল-গায়ক হয়েছিলেন বটে। সাতারার রাজসভাতে দরবারী কলাকার হন নজর আলী। ১৮০০ থেকে ১৮২০ এই বিশ বছর তিনি সাতারা দরবারে নিযুক্ত থাকেন।

আমীন তালিম দিতে শুরু করেন নিজের দুই ছেলে জয়নাল আবেদীন আর মুজঃফর হোসেনকেও।

আমীন প্রথম থেকেই দেখেন—মুজঃফর প্রতিভাবান। যা শেখান, সত্বরই সে আয়ত্ত করে। পনের-ষোল বছর বয়সেই মহা গায়ক হয়ে উঠলেন মুজঃফর।

আর বড় ছেলে জয়নালকে দেখে আমীন হতাশ হলেন। তার না আছে মেধা, না চেষ্টা বা আগ্রহ। গানে অনাদর দেখে জয়নালের তালিম তিনি বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু সেজন্যে আমীনকে অনুযোগ করতে লাগলেন নজর আলী —'যতই হোক, ঘরের ছেলে জয়নাল। তাকে শেখানো ছেড়ে দেবে কেন?'

তখন আমীন তাঁকে বলে পাঠালেন, 'বেশ, তাহলে আবেদীনকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। তুমিই তাকে তালিম দাও।'

রাজি হলেন নজর আলী। জয়নালকে কাছে রেখে শেখাতে লাগলেন, সস্নেহে। তিনি তখন সাতারা নিবাসী।

ক্রমে দেখা গেল এক আশ্চর্য ব্যাপার। জয়নাল বদলে গেছেন তাঁর আগ্রহ জেগেছে গানে। রীতিমত রিয়াজ করছেন। নজর আলী যেমন বাতিয়ে দিচ্ছেন, সাধছেন সেই রকম।

দেখতে দেখতে জয়নালও পারদর্শী হয়ে উঠলেন। সুপ্ত প্রতিভা মুখর হল বংশের ধারায়। আসরে আসরে গুণী বলে নাম করলেন।

এমন কি মজঃফরকেও অতিক্রম করে গেলেন। আর ত্রিশ বছরের আগেই আবেদীন গায়ক নিযুক্ত হলেন আঙ্গরের সঙ্গীতসভায়, কোঙ্কনের আলিবাগে।

তা হল ১৮৩০ সালের কথা। সেখানে বছর আষ্টেক থাকবার পর আবেদীন হায়দরাবাদ চলে গেলেন। সেখানে তাঁকে গায়ক হিসাবে নিয়োগ করলেন রাজা চান্দুলাল। এর মধ্যে আবেদীনের কলাবৎ বলে এমন প্রতিপত্তি হয় যে 'বড়ে মিঞা' বলে সবাই তাঁকে সম্মান জানাতেন। পরে বড়ে মিঞা নামেই আবেদীন প্রসিদ্ধ থাকেন সঙ্গীত-সমাজে।

তারপর হায়দরাবাদে যখন শিয়া সুন্নির দাঙ্গা বাধল, তিনি মিরাজে আশ্রয় নিলেন। তাঁর দুই প্রিয় শিষ্য মহাদেব বুয়া.ও আণ্টু বুয়া ছিলেন সে অঞ্চলের বাসিন্দা। তাঁরাই ওস্তাদকে সেই নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসেন। তখন জয়নাল আবেদীনের অতি পরিণত বয়স। আর, সময়টি হল উনিশ শতকের মাঝামাঝি।

বড়ে মিঞা বা তাঁর ভাই মুজঃফর হোসেনের পরের কথায় আর দরকার নেই। সদারঙ্গের এই শিষ্য বংশের বিবরণে দেখা গেল যে, তাঁদের মধ্যে গোয়ালিয়রের হদ্দু, হস্‌সু খাঁর অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ সদারঙ্গের খেয়ালীয়া শিষ্যধারা আর হস্‌সু, হদ্দু খাঁর পরিবার একেবারেই পৃথক—বংশে এবং সঙ্গীত পরম্পরায়। এখন আগেকার সেই প্রসঙ্গ। অর্থাৎ লক্ষ্ণৌর পূর্ব বৃত্তান্তের সূত্রে গোলাম রসুল ও শক্‌কর, মখ্‌খনের কথা।

গোলাম রসুল ১৭৭০ সাল নাগাদ যখন গত হলেন,তখন শক্‌কর, মখ্‌খনকে নিয়ে জমজমাট তাঁদের খেয়ালীয়া পরিবারটি। গোলাম রসুলের দুই প্রিয় শিষ্যের মধ্যে মধুর সাঙ্গীতিক যোগাযোগ।

কিন্তু এক পুরুষ পরেই সেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ভাঙন ধরে গেল।

চিরবিচ্ছেদ ঘটল শক্করের আর মখ্খনের বংশে। গোলাম রসুলের খেয়াল গানের চর্চা দুই শাখাতেই রইল। কিন্তু নষ্ট হয়ে গেল পারস্পরিক হৃদ্যতা, মমত্ব আর সহযোগিতা। হয়ত তার মূলে পেশাদারি স্বার্থ কাজ করেছিল।

গোলাম রসুলের জামাই শক্করের দুই ছেলে—(বড়ে) মহম্মদ ও আহম্মদ। আর মখ্খন বা নত্থন পীর বখ্সেরও তাই—কাদর্ বখ্স্ ও পীর বখ্স্। নওজওয়ান চারজনই পরম্পরার যোগ্য উত্তর-সাধক।

তাঁদের পিতার শিক্ষাতেই সঙ্গীত-জীবনের গঠন। বিশেষ প্রতিভাধর হয়ে দেখা দিলেন (বড়ে) মহম্মদ ও কাদর্ বখ্স্। যথাক্রমে শক্কর ও মখ্খনের জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁরা।

দুই শাখার দুই রত্ন, কিন্তু প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ক্রমে পেশার ক্ষেত্রে পারস্পারিক সম্পর্ক কটু আর অনমনীয় হয়ে উঠল। তাঁদের জনকদের সঙ্গীতকণ্ঠের ঠিক বিপরীত। সংঘর্ষ ঘটতে লাগল দুই উদীয়মান জ্যোতিষ্কের। প্রথমে ঘরোয়া ভাবে। তারপর আসরে আসরে। তাঁদের বিরোধ লক্ষ্ণৌর সঙ্গীত সমাজে কারুর জানতে বাকি রইল না আর।

এমন সময়, মাত্র কদিনের অসুখে কাদর্ বখ্সের মৃত্যু ঘটল। মহা শোকের আঘাত সহ্য করে নিলেন নত্থন পীর বখ্স্। কিন্তু তাঁর স্থির বিশ্বাস জন্মাল—কাদরের এই মৃত্যু 'স্বাভাবিক' নয়। কোন মারণক্রিয়ারই ফল। আর তার চক্রী—ওই বড়ে মহম্মদ—প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে পেশাদার জীবনে নিষ্কণ্টক হল।

মখ্খন অর্থাৎ নত্থন পীর সে সময় বার্ধক্যের সীমানায়। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র তখন তৈরী হয়েছে বটে। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য প্রতিকূল। কাদরের দুটি ছেলে হদ্দু ও হস্সু এখন নিতান্ত বালক। তবে এই বয়সেই অসামান্য মনে হয় তাদের। বংশের নাম ও ধারা তারাই রাখবে, যদি তালিম পুরো করা যায়।

বংশধরদের জন্য দারুণ দুশ্চিন্তাও জাগল নত্থন পীরের মনে।

তাদের নিরাপত্তার ভাবনা। হদ্দু, হস্সুর ওপরেও যদি কোন আভিচারিক কাণ্ড হয়? এই ভাবনায় অস্থির হলেন নথন পীর বখ্স্।

তাঁর ধারণা হল, লক্ষ্ণৌ আর নিরাপদ নয় তাঁদের পরিবারের পক্ষে। উপযুক্ত পুত্রকে হারিয়ে এই পরিণত বয়সে নিজেকে অসহায় বোধ হল। সুতরাং লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করাই মঙ্গল বিবেচনা করলেন নথন পীর (মখ্খন)।

কিন্তু এই বয়সে পরিবারবর্গ নিয়ে কোথায়, কার আশ্রয়ে থাকবেন? এই চিন্তায় পীড়িত হতে লাগলেন নথন পীর। এই অবস্থায় কাটল কিছুদিন।

অবশেষে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। শুনলেন, গোয়ালিয়রের মহারাজের দরবারী কলাবৎ দরকার। নথন তৎপর হয়ে যাত্রা করলেন গোয়ালিয়রে। শেষ পর্যন্ত দরবারের জন্যে মহারাজার মনোনীত হলেন।

তারপর এতকালের লক্ষ্ণৌর পাট উঠিয়ে গোয়ালিয়রে বাস করতে লাগলেন সপরিবারে। সে হল, ১৮১৬ সালের কথা।

এবার মখ্খন দরবারী শিল্পীর নিশ্চিন্ত জীবন, আশ্রয় আর নিরাপত্তা পেলেন। বংশধরদের নতুন উদ্যমে তালিম দেওয়া শুরু করলেন, বিশেষ হদ্দু, হস্সুকে। কিছুদিনের মধ্যে নথন কনিষ্ঠ পুত্রকেও হারালেন। তখন কনিষ্ঠ পৌত্র নথ্থুকেও শেখাতে গেলেন হদ্দু, হস্সুর সঙ্গে।

অতি দ্রুত হদ্দু, হস্সুর তালিম এগিয়ে চলল। নথন ঠিকই বুঝেছিলেন, মহা মেধাবী তারা।

তাদের জন্যে বেঁচে থাকবে এই ঘরানা। কাদরের অভাব তারাই পূরণ করবে। এখনই কি দাপটে গায়! কেমন সপাট তান ওঠায়! দু-একবার দেখালেই গলায় ঠিক তুলে নেয় ছন্দ লয়কারী। শেখাতে নথনেরই উৎসাহ বেড়ে যায়। পীর বখ্সের ছেলে নথ্থুও বেশ গড়ে উঠছে হদ্দু হস্সুর সঙ্গে।

ওস্তাদ হিসেবে নথনও আদর্শ। শেখাবার, গলা তৈরী করে

দেবার কায়দা-কানুন দস্তুরমত তাঁর জানা। আগে তো তাঁকে লক্ষ্ণৌয় অত বড় কালোয়াৎ হিসেবে সবাই চিনতেন। এখন গোয়ালিয়রে এসে ঘরের বাইরের একটি ছাত্রও করতে হয় তাঁকে।

আগ্রা ঘরানার খুদা বখ্‌স্‌ বিখ্যাত খেয়াল গায়ক হন নথনেরই তালিমে। আগে খুদা বখ্‌সের কর্কশ কণ্ঠের জন্যে খগ্‌গে নাম ছিল। মনের দুঃখে তিনি দিন কাটাতেন আগ্রায়। তারপর তিনি নথন বা মখ্‌খনের নাম শুনে গোয়লিয়রে চলে আসেন। নথনকে ধরে পড়েন তালিমের জন্যে। নথন ঠিক ঠিক কলাকৌশলে সাধিয়ে, তাঁর কণ্ঠ শুদ্ধ করে দিলেন। শেষে সুগায়ক হয়ে উঠলেন খগ্‌গে খুদা বখ্‌স্‌। কথাটি জড়িয়ে রইল তাঁর নামের সঙ্গে, কণ্ঠে নয়।

সেই নথনের অন্তরের শিক্ষা পেলেন হদ্দু, হস্‌সু আর নথ্থু। বিদ্যার সঙ্গে বাহ্য আর গূঢ় সব রাস্তা, কায়দাও। হদ্দু, হস্‌সু অতি মুন্সিয়ানায় সবই তুলতে লাগলেন।

কিন্তু তালিম দিতে দিতে একটা বড় অভাব বোধ করলেন নথন। নিজের আগেকার কণ্ঠ হারিয়ে গেছে। এমন কিছু তানকারী আর গলার কাজ আছে তা তিনি স্বয়ং দেখাতে পারছেন না হদ্দু, হস্‌সুকে। তাই তাদের তালিমে সেই সব ফাঁক থেকে যাচ্ছে। বয়সের ভারে অনিবার্য সেসব অক্ষমতা।

নথনের এখন এই ভাবনা। বয়সও হয়েছে যথেষ্ট। হঠাৎ কোন্‌দিন চলে যেতে হবে। বংশের যারা আশা-ভরসা, এসব জিনিস পাবে না তারা? এত কষ্টের তালিম থেকে যাবে অসম্পুর্ণ? নিজের আগেকার গলা থাকলে সমস্তই নিখুঁত শেখাতে পারতেন। এখন কি করে ওদের দেওয়া যায় পুরো ঘরানা তালিম?

অনেক চিন্তার পর একটা কথা মনে পড়ল। শক্করের বড় ছেলে মহম্মদ। দস্তুরমত ওস্তাদ গাওয়াইয়া হয়েছে সে। এখনও লক্ষ্ণৌতেই থাকে।

একমাত্র সেই বড়ে মহম্মদের গানে এসব পেতে পারে হদ্দু, হস্‌সু।

কিন্তু তার গান শোনা তো আরো অসম্ভব। দু পরিবারে কতকাল মুখ দেখাদেখি বন্ধ। তাছাড়া মহম্মদ আছে লক্ষ্ণৌতে। তাহলে উপায়?

পাকা বুদ্ধিতে নথন পীর এক রাস্তা ঠাওরালেন। তবে বড়ই কঠিন সেটা। সম্ভব হবে কি?

সব চিন্তা করে তিনি সিন্ধিয়া মহারাজার কাছে আর্জি পেশ করলেন। পরিকল্পনাটি জানালেন তাঁর বিবেচনা ও অনুগ্রহের জন্যে।

গোয়ালিয়রপতি নথনকে গুণী কলাকার বলে খাতির করতেন। এখন 'না' বলে দিতে পারলেন না। সম্মতি দিলেন ওস্তাদজীর অনুরোধ উপরোধে।

গোয়ালিয়র দরবার থেকে বড়ে মহম্মদের কাছে আমন্ত্রণ পাঠানো হল। মহারাজা সিন্ধিয়ার দরবারে খাঁ সাহেবকে নিযুক্ত করবার প্রস্তাব। যদি আপত্তি না থাকে, যেন চলে আসেন এ রাজ্যে।

মহারাজার আহ্বানে বড়ে মহম্মদ যেমন পুলকিত তেমনি বিস্মিত হলেন। গোয়ালিয়র দরবারে কলাবন্তর সম্মান ও দরাজ দাক্ষিণ্য সর্বপরিচিত। সেই সঙ্গীতপ্রেমী মহারাজার আনুকূল্য সকল পেশাদার গুণীরই কাম্য। আপত্তির কোন প্রশ্নই নেই।

কিন্তু বড়ে মহম্মদের অস্বস্তি এই যে, বৃদ্ধ নথন তো এখনো আছেন ওখানে। হদ্দু, হস্সুও তো তাঁর সঙ্গে থাকে। তারা নাকি তৈয়ারীও হয়েছে খুব। তাহলে তাদের সামনে গাওয়া উচিত কিনা।

ইতস্তত করে, দুদিক রক্ষার একটি পন্থা বড়ে মহম্মদ স্থির করলেন।

গোয়ালিয়রে এলেন তিনি। তারপর নিযুক্ত হবার কথায় মহারাজকে জানালেন, 'দরবারে আমি যোগ দেব, মহারাজ। তবে আমার একটি প্রার্থনা আছে।'

'কি?'

'আমি যখন আপনাকে গান শোনাব তখন আমাদের "ঘরের" কেউ যেন দরবারে না থাকে।'

'বেশ তাই হবে।'

নিশ্চিন্ত বোধ করলেন বড়ে মহম্মদ। দরবারে তাঁকে নিযুক্ত করবার আসল উদ্দেশ্য তিনি কল্পনাও করতে পারলেন না।

তখন থেকে নিত্য তাঁর আসর হতে লাগল মহারাজার সামনে, দরবারে। বড়ে মহম্মদের সম্পূর্ণ অঙ্গের খেয়াল গানে গোয়ালিয়র দরবার মুখর হয়ে উঠল।

কিন্তু আরেক দৃশ্যের অবতারণা হল তাঁর নেপথ্যে। তিনি যখন মহারাজকে গান শোনান, তখন পাশের কক্ষে বসে হদ্দু ও হস্সু তা শুনে নেন। সাধারণ শ্রোতা তো নন তাঁরা! একই চালের একই পরিবারের উদীয়মান গায়ক। তাঁরা নিবিষ্ট, উৎকর্ণ হয়ে মহম্মদের গান শোনেন। এই দুর্ধর্ষ গায়কের গাইবার সব রীতিনীতি লক্ষ্য করেন পুঙ্খানুপুঙ্খ।

রকমারী তানকারীর নিয়ম, কায়দা। রাগের রাস্তার ধরন ধারণ। অত্যন্ত তৈয়ারী গলায় নানা কঠিন আর জটিল কাজ। বিচিত্র সব ছন্দ-কারু। বুড়ো দাদা বয়সের ভারে যেসব জিনিস দেখাতে পারেন না। তাঁদের তালিমের তো কম্‌তি ছিল না বিশেষ। কিছু কিছু তান কর্তবের দৌড় বাকি কেবল। এখন তারা গ্রামের কিংবা দ্রুত মুন্সিয়ানার কাজ। সেজন্যে গলার তাকৎ দরকার। দাদার গানে যে তবিয়ৎ এ বয়সে থাকতে পারে না। বড়ে মহম্মদের কণ্ঠে এখন পাওয়া যাচ্ছে সমস্তই।

সেই সব জিনিস মহম্মদের গান থেকে দু ভাই উঠিয়ে নেন। আড়ালে বসেও ঠিক ঠিক তালিম। নিজেদেরই ঘরের সব চেয়ে বড় গাওয়াইয়া দিনের পর দিন গাইছেন। কত রকমের তান পাল্‌টা, গলা খেলাবার আর তান ঘোরাবার কলাকৌশল যে শুনে নিচ্ছেন দুজনে। তারপর বাড়ি ফিরে যখন রিয়াজে বসছেন, সে সব ঠিকঠাক নিজেদের গলায় উঠে আসছে।

নথন পীর বখ্‌সের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হল এত দিনে। আর বড়ে মহম্মদের সব সাবধানতা ব্যর্থ হয়ে গেল।

দুটি প্রতিভা আরও দীপ্তিমান হতে লাগল তাঁরই প্রভায়।

এইভাবে আরো কিছুদিন যায়।

মহারাজারও আগ্রহ ছিল এ ব্যাপারে। তিনি জানতেন আভ্যপান্ত পরিকল্পনাটি।

একদিন তিনি নত্থনকে বললেন, 'ছেলেরা কেমন তৈরী হচ্ছে, এবার আমায় শোনান।'

'মহারাজ যেদিন হুকুম করবেন সেদিনই ওরা গাইবে।'

ঠিক হল, মহম্মদ খাঁর যেদিন আসরে আসার কথা নয়, এমন একদিন হবে তাঁদের গান।

হদ্দু ও হস্সু খাঁ সেদিন সিন্ধিয়াকে গান শোনাতে এলেন। নত্থনও সঙ্গে এসেছেন, বলা বাহুল্য। পাত্র-মিত্রদের সঙ্গে গোয়ালিয়র-পতি সভায় আসীন হলেন। আজ দরবারে শুধু হদ্দু, হস্সুর গানের আসর। সঙ্গতকার ভিন্ন অন্য কোন কলাবৎও নেই। দুই উদীয়মান প্রতিভার পরিচয় বিশেষভাবে পেতে চান সমঝদার মহারাজা। এত কৌশলে যাদের তালিমের বন্দোবস্ত হল, তাদের গান শুনতে সিন্ধিয়ার বড়ই আগ্রহ।

জুটিতে গাইছেন দুজনে। আসর তখন জমে উঠেছে।

মহারাজা তরুণ কলাবৎদের গান শুনে বেশ খুশী।

এমন সময় হঠাৎ মহম্মদ খাঁ দরবারে হাজির হলেন। আসতে আসতেই, আসরে প্রবেশের আগেও, তিনি গান শুনেছেন খানিক। দু ভাইয়ের গলাও চিনেছেন। বুঝতেও তাঁর বাকী নেই যে, হদ্দু, হস্সু আত্মসাৎ করেছে তাঁরই কোন কোন নিজস্ব জিনিস। গোয়া-লিয়রে আসার আগে থেকেই যে আশঙ্কা করেছিলেন, তাই সত্য হল। অজ্ঞাতে তছরুপ করে নিয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বীর পরিবার।

অভাবিত পরিস্থিতিতে বিষম ক্রুদ্ধ হলেন মহম্মদ। কিন্তু নিরুপায়। বিদ্যা আর ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই। তবে আর নয়।

এদিকে তাঁকে দেখামাত্র স্তব্ধ হয়ে গেল হদ্দু, হস্সুর গান।

কয়েক মুহূর্ত সমস্ত দরবারও নীরব হল। নথন পীর বখ্‌স্‌
হতবাক, অপ্রস্তুত।

নিস্তব্ধ ভঙ্গ করলেন বড়ে মহম্মদ।

দরবারপতিকে কোনিশ করে বললেন, 'মহারাজ, আমায় বিদায় দিন। এখানে আমি থাকতে পারব না।'

সিন্ধিয়াও বুঝলেন। আর অনুরোধ করলেন না তাঁকে।

গোয়ালিয়রের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে মহম্মদ খাঁ লক্ষ্ণৌ চলে গেলেন। সেখানেই বাস করতে লাগলেন কনিষ্ঠ আহম্মদের সঙ্গে, পিতৃ-মাতামহের সাধন ক্ষেত্রে। লক্ষ্ণৌ থেকেই খেয়ালের এক দিক-পাল কলাকার হিসেবে উত্তর ভারতের নানা আসরে দরবারে যোগ দিতে যেতেন। কিন্তু গোয়ালিয়রে আর মহম্মদ খাঁ যাননি কোন দিন।......

কিন্তু পরে লক্ষ্ণৌতে ছাপিয়ে উঠল গোয়ালিয়রী খেয়ালের নাম-ডাক। হদ্দু আর হস্‌সু খাঁর দুর্ধর্ষ খেয়ালীয়া বলে প্রসিদ্ধি হতে লাগল। তাঁদের নামের সঙ্গে চিহ্নিত হল গোয়ালিয়রের খেয়াল গানের চাল—যে পরম্পরার আদি উৎস লক্ষ্ণৌর গোলাম রসুল। তাঁর দু পুরুষ পরে প্রাচীন লক্ষ্ণৌ ধারার চেয়ে নবীন গোয়ালিয়র শাখা বেশি দ্যুতিমান হল। তার একটি কারণ হয়ত বড়ে মহম্মদের বয়স এখন ঢলেছে পশ্চিমে।

হস্‌সু, হদ্দুকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে নথন পীর বখ্‌স্‌ জীবনের মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তাঁরই গোয়ালিয়রে বাসপত্তন (১৮১৬) ও এ রাজ্যে হদ্দু, হস্‌সুকে তালিম দেওয়া থেকে গোয়ালিয়রী খেয়াল ধারার সূচনা। তাঁর পরে হদ্দু, হস্‌সু খাঁ গোয়ালিয়র চালের খেয়াল গানের পালন-কর্তা।

তখন উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি। দুই ভ্রাতার সঙ্গীত-জীবনে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে গোয়ালিয়রের খেয়ালও নামে মানে আভিজাত্যে আপন আসন করে নেয়। গোয়ালিয়র ঘরানার খেয়াল।

এ রাজ্যেই প্রায় চারশ বছর আগে হয়েছিল ধ্রুপদের প্রবর্তন ও প্রচলন। গোয়ালিয়রপতি তখন মান সিং (১৪৮৬-১৫১৭)। তাঁর দরবারী কলাকারদের সহযোগিতা, স্বীকৃতি পায় অভিনব ধ্রুপদ রীতি। দরবারে সেই উপলক্ষ্যেই বিরাট সঙ্গীত সম্মেলন। আর তার ফলে রাজা মানের সঙ্গীত গ্রন্থ 'মান কুতূহল' প্রণয়ন! তাঁর দরবারী গুণীদের পরের যুগে তানসেন প্রমুখ। তারপর পর্যায়ে পর্যায়ের ধ্রুপদীদের সাধনায় গোয়ালিয়রে ধ্রুপদ গানের জীবন্ত, সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। এতকাল পরে এ কেন্দ্রেই রাগের বিস্তার পদ্ধতির অর্থাৎ খেয়াল রীতির একটি ধারার প্রচলন হল। এই রূপায়ণে কালাগত ধ্রুপদ পদ্ধতির পরোক্ষ প্রভাব পড়ল না কি? কারণ প্রাচীনতর ধ্রুপদ সঙ্গীতের চর্চা লুপ্ত হয়নি গোয়ালিয়রে।

হদ্দু, হস্সু খাঁ থেকে যে গোয়ালিয়রী চালের খেয়াল গানের প্রসিদ্ধি, তার গম্ভীর গঠন-কারু। সে খেয়াল যেন মহিমময় ধ্রুপদের স্মারক। রাগ-রূপের প্রশান্ত সৌন্দর্যেও তা ধ্রুপদ অনুসারী। তাই স্বাভাবিক। কারণ ধ্রুপদই খেয়ালের জনক। খেয়াল প্রচলন কর্তারাও সকলে ধ্রুপদী থেকে খেয়ালীয়া। যেমন সদারঙ্গ। যেমন গোলাম রসুল। যেমন আগ্রা ঘরানার খেয়ালী যাঁরা।

হদ্দু, হস্সুর খেয়ালও অচপল। নিজস্বপ্রতিভায় তাঁরা সংযোজনও করেন। নিছক নথন পীরের তালিমের সুফল তো নন। খেয়াল রীতিতে দুই ভ্রাতাই সৃজনশীল শিল্পী। তাঁদের কৃতিত্ব তানকারী ও ছন্দকর্মের নবত্বে।

হলক্ তান, বিজ্লী তান, আরো কত রকম তানকারী আর অলঙ্করণ তাঁদের গোয়ালিয়রী চালে। বিস্তার সুপরিকল্পিত, ক্রম-প্রসারী আর বর্ধিষ্ণু। সুরবিহারে নবনবোন্মেষী কল্পনার বাহার। ছন্দের ঐশ্বর্যও গোয়ালিয়র-খেয়ালের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। গোলাম রসুল এবং শক্কর মখ্খনের মাধুর্যই ছিল অন্যতম প্রধান সম্পদ। কিন্তু হদ্দু, হস্সু থেকে ছন্দ-লীলা বা লয়কারীর প্রাধান্য। তানের

প্রাচুর্য আর বৈচিত্র্য যার বাহন। পরে ছন্দের কাজ গোয়ালিয়রে মুখ্য স্থান করে নেয়। মাধুর্য গৌণ।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে হদ্দু, হস্সুর খেয়াল গানের এই প্রতিষ্ঠা। এখানে একবার স্মরণ করা যায়, সদারঙ্গের সেই খেয়ালীয়া শিষ্য বংশের কথা। হদ্দু, হস্সুর সমকালীন সেই বড়ে মিঞা বা জয়নাল আবেদীন এবং মুজঃফর হোসেনের প্রসঙ্গ। পরিণত প্রতিভায় শেষোক্তরা তখন মহারাষ্ট্রের মিরাজ অঞ্চলে রয়েছেন। জয়নাল মুজঃফর কিংবা তাঁদের কোন পূর্বপুরুষের সঙ্গীত-জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেনি গোয়ালিয়রের অর্থাৎ হদ্দু, হস্সুর ধারার সঙ্গে। তাঁরা গোয়ালিয়র ঘরানার একেবারেই বহির্ভূত।

হদ্দু, হস্সুর সঙ্গীত-জীবন আবাল্য অঙ্গাঙ্গী। শৈশব থেকে একই শিক্ষায়, চর্চায় ও পরিবেশে তাঁরা গঠিত, লালিত, বর্ধিত। একাত্ম, অবিচ্ছেদ্য তাঁদের অনুশীলন। আমৃত্যু সঙ্গীতে সহযোগী দুজনে। আসরেও তাঁরা অনেক সময় গাইতেন যুগলবন্দী। শ্রুতি স্মৃতিতেও তাঁরা একযোগে জীবন্ত হয়ে আছেন।

একত্র উচ্চারিত হয় দুজনের নাম। কিন্তু হদ্দু প্রথমে কথিত হলেও তিনি কনিষ্ঠ। হস্সুই জ্যেষ্ঠ। হয়ত উচ্চারণের সুবিধায় হস্সুর নাম পিছনে থাকে। কিংবা হদ্দুর গায়ন-শক্তি হয়ত কিছু বেশি। সেজন্যে আসরে আর সঙ্গীত-জগতে তাঁর নাম এসেছে আগে।

কিন্তু হস্সু অগ্রজ। তাঁর জন্মসন আনুমানিক ১৭৯৮। তাঁর মৃত্যুও হয় হদ্দুর পূর্বে, গোয়ালিয়রেই। মৃত্যু সন ১৮৫৫ কিংবা তার দু-এক বছর আগে পরে।

সঙ্গীত-জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়ে দুই ভাই ছিলেন প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক। পরস্পরের পরিপূরকও তাঁরা। সমান যশস্বী যেন। কিন্তু বিশেষ কথাও আছে।

তুলনায় হস্সুর কণ্ঠ-সম্পদ বেশি। তাঁর স্বরগ্রামে বিচরণ তিন সপ্তকেরও অধিক। তাও সাবলীল স্ফূর্তিতে। বোল্ তানে তিনি

সিদ্ধ। আসরে তাঁর কড়ক বিজ্‌লী ইত্যাদি তানকারী বিদ্যুৎ গতিতে বিচ্ছুরিত হত, এই প্রসিদ্ধি। তাঁর সঙ্গীত-ভাণ্ডার বিপুল।

শিক্ষক হিসাবেও বেশি কৃতী হস্‌সু। সুযোগ্য তাঁর শিষ্যমণ্ডলী। পুত্র গুলে ইমাম (অকালগত ত্রিশ বছর বয়সে), বাসুদেব বুয়া যোশী, রামকৃষ্ণদেব বা দেবজী বুয়া ও বাবা দীক্ষিত। (দেবজী বুয়া ধ্রুপদ গানে চিন্তামণ মিশ্রের শিষ্য।)

তালিম কাকে দেওয়া হবে এবং কাকে নয়, এ বিষয়ে হস্‌সু ও হদ্দু্‌র ছিল একই পক্ষপাতী মনোভাব। তেমন দৃষ্টান্ত প্রায় দেখা যায় না। পরে তা বলা যাবে হদ্দু্‌র কথায়।

দু ভাইয়ের তানকারীর ক্ষমতা প্রবাদ বাক্যের মতন। আর তাই নিয়ে অবিশ্বাস্য কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়।

যেমন, একদিন দুজনে জুটিতে গাইছেন আসরে। লয় বাড়িয়ে বিষম দাপটে একেকটি তান ছুটিয়ে দিচ্ছেন। কি হৃদ্‌স্তম্ভনকারী তাদের গতি-প্রকৃতি। কি দুর্বার তাদের প্রবাহ। তার মধ্যে হস্‌সু হঠাৎ দম নিয়ে এমন একটি তান ছাড়লেন যে তার ধাক্কায় নিজেরই পাঁজরের একটা হাড় উঁচু হয়ে উঠল। আর রয়ে গেল সেই অবস্থায়, সকলের চোখের সামনে। তখনি তাঁর গান বন্ধ হয়ে গেল। প্রাণও বুঝি যায়। 'হায় হায়' করে উঠলেন তাঁর গুণমুগ্ধ শ্রোতারা।

তখন হদ্দু্‌ সবাইকে অভয় দিলেন, 'বেফিকর রহিয়ে।'

বলেই এক দমকে তেমনি ওজনের একটি পাল্‌টা গর্জালেন। সঙ্গে সঙ্গে 'খটাশ্‌' শব্দে স্বস্থানে স্থির হল হস্‌সুর পাঁজরের উদ্‌গত অস্থিটি।

আসরসুদ্ধ লোক হদ্দু্‌ খাঁকে সাবাস দিয়ে উঠলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সকলে। হস্‌সু খাঁর বিপন্ন প্রাণ রক্ষা হল।

এমনি গালগল্প লক্ষ্ণৌ গোয়ালিয়রে সরল বিশ্বাসীর মুখে শোনা গেছে। কিন্তু হস্‌সু, হদ্দু্‌কে নিয়ে যে নানা উদ্ভট গল্প রটে, তা তাঁদের তানকারীতে অসাধারণত্বের জন্যে। গায়ন-শক্তির দুর্লভ পারদর্শিতার ফলেই দুই ভাই কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন।

হদ্দু র জন্ম উনিশ শতকে প্রথম ক'বছরের মধ্যেই। জন্ম সাল জানা যায়নি সঠিক। আর তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৭৮ বা তার কাছাকাছি বছরে। বয়স হয়েছিল আশীর কিছু কম। হস্সু এত আয়ুষ্মান হননি।

হদ্দু খাঁর প্রতিভা আলাদাভাবে কিছু বলা বাহুল্য। তিনিও খেয়াল গানে ইতিহাস সৃজন করেছিলেন জ্যেষ্ঠের সঙ্গে।

গোয়ালিয়র ঘরানা বলতে যে খেয়াল গানের ধারা ধরা হয় তার বেশি নাম ডাক হস্সু, হদ্দু খাঁর সময় থেকে। কিন্তু তার উত্তরাধিকার যেমন অভাবিত তেমনি বিচিত্র। তাঁদের এক পুরুষ পরেই এই সঙ্গীতপরম্পরা এ পরিবারের একেবারে বাইরে চলে যায়। সম্পূর্ণ অনাত্মীয়দের মধ্যে রক্ষিত হয় গোয়ালিয়র ঘরানা। তাঁদের ঘরানা সঙ্গীত-সম্পদের ধারক-বাহক হন মারাঠী হিন্দু শিষ্যমণ্ডলী।

দুই ভ্রাতারই পুত্র ভিন্ন, প্রধান শিষ্যরা সকলেই মহারাষ্ট্রীয়। হস্সু খাঁর শিষ্যদের নাম আগে দেওয়া হয়েছে। হদ্দু র দুই পুত্র ভিন্ন তাঁর উত্তরসাধক হন দুজন মারাঠী গুণী। বিষ্ণুপন্থ মোরো (ধ্রুপদ গানে তিনি তাতু ভাইয়ার শিষ্য) ও বালা গুরু। তা ছাড়া, কলকাতার বিখ্যাত ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা গায়ক (যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রধান সভাগায়ক) গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীও খেয়াল গানে হদ্দু খাঁর শিষ্য বলে কথিত।

হস্সু ও হদ্দু দুজনেরই বংশ শেষ হয়ে যায় তাঁদের পরের প্রজন্মে। কিন্তু সেজন্যে তাঁদের সঙ্গীত-সম্পদ ও পরম্পরা লুপ্ত হয়নি। শিষ্য গঠন বিষয়ে দুই ভ্রাতার ছিল আশ্চর্য দূরদৃষ্টি এবং সমদর্শন। ভবিষ্যৎকাল তার সারবত্তা প্রমাণ করে দেয়।

সে কথার আগে তাঁদের বংশের অন্তিম প্রসঙ্গ।

হস্সুর একমাত্র পুত্র গুলে ইমাম। পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরী তিনি। অল্প বয়সেই প্রতিভাবান গায়করূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ইমাম। কিন্তু মাত্র ত্রিশ বছরেই ছেদ পড়ে যায় তাঁর জীবনে।

হস্সু তখনো জীবিত। সেই শোকেই হয়ত তাঁরও পরমায়ু শেষ হয়ে আসে।

হদ্দুর পুত্র প্রসঙ্গ আরেক রকমে মর্মান্তিক। তাঁর দুই ছেলে—মহম্মদ ও রহিমৎ। এ মহম্মদকে বলা হত 'ছোটে'। শক্কর পুত্র ছিলেন 'বড়ে' মহম্মদ, যাঁর গান গোয়ালিয়র দরবারে হদ্দু, হস্সু লুকিয়ে শুনতেন। সেই 'বড়ে' মহম্মদের সূত্রে হদ্দুর ছেলে 'ছোটে'। বৈরী-ভাব সত্ত্বেও তাঁরা একই পরিবার গণ্য করতেন নিজেদের।

আপন প্রতিভায় আর হদ্দুর তালিমের গুণে সেই ছোটে মহম্মদ অসাধারণ গায়ক হয়ে ওঠেন; তরুণ বয়সেই আসরে আসরে বিখ্যাত গুণী। পিতার নাম রাখার সম্পূর্ণ যোগ্য। কিন্তু রাহুগ্রস্ত হল তাঁর ভাস্বর শক্তির প্রভা। সুরের অমৃত সুরার গরলে জর্জরিত হয়ে গেল। অপরিমিত পান-দোষে প্রাণ হারালেন তিনি, মাত্র ২৯ বছর বয়সে। ছোটে মহম্মদের জন্ম সন (আনুমানিক) ১৮৪৭ এবং মৃত্যু ১৮৭৬ সালে।

হদ্দুর দ্বিতীয় পুত্র রহিমৎও অসামান্য কলাকার হিসেবে সঙ্গীত জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। স্বীকৃতি পান সমকালীন এক মহাগুণী বলে। কণ্ঠসম্পদে, গায়নক্ষমতায়, রাগবিদ্যায়। উত্তর ভারতের বহু আসরে দরবারে গুণপনা দেখান। নেপালের বিখ্যাত সঙ্গীত সম্মেলন 'বগড়ির জলসা'য় যোগ দেন ভারতের শ্রেষ্ঠ কলাকারদের সঙ্গে, সম মর্যাদায়।

সঙ্গীত-জগতের অনেক প্রত্যাশা ছিল তাঁকে নিয়ে। রহিমৎ আয়ুষ্মানও হয়েছিলেন। ৭১ বছরের জীবনকাল। কিন্তু অধিকাংশই নিষ্ফলা হয় তাঁর দীর্ঘ জীবন। একাধিক নেশার বশে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন। আর সেই কারণেই অসাড় স্নায়ুতে হয়ে যান বিকৃত-মস্তিষ্ক। সংবিৎ থাকলে, অনেক সময় অপ্রতিদ্বন্দ্বী খেয়াল-শিল্পী। তখন রহিমৎই এ ঘরানায় বিজয়কেতন উড্ডীন রাখেন।

কিন্তু তাঁর সঙ্গীত-জীবন হয়ে পড়ে যেমন অনিশ্চিত, তেমনি

অনিয়মিত, অনিয়ন্ত্রিত। মধ্য-জীবন থেকেই রহিমৎ খাঁর সাময়িক অর্ধোন্মাদ অবস্থা। তাঁর অনুরাগীরাও আর আস্থা রাখতে পারতেন না তাঁর অব্যবস্থিত জীবনের প্রতি।

একবার কয়েক মাস রহিমৎ বারাণসীতে কাটান। সে সময় তাঁর কাছে কিছু শিক্ষা সংগ্রহ করে নেন তরুণ মৌজুদ্দিন। কাশীর আরেক উদীয়মান গুণী (ধ্রুপদী) গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও রহিমতের কাছে আদায় করেন বলে প্রকাশ।

জীবনের শেষ সাত বছর রহিমৎ থাকেন কুরুন্দওয়াড়ে, রাজ আশ্রয়ে। সেই বিপর্যস্ত অবস্থায়ও রাজার উদ্যোগে তাঁর কখানি গ্রামোফোন রেকর্ড হয়েছিল। সে পর্বেও গায়ন-শিল্পীর সঙ্গীত-শক্তি অন্তর্ধান করেনি একেবারে। তারপর ১৯২২ সালে রহিমতের শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। তাঁর জন্ম সন আনুমানিক ১৮৫১।

কোন কোন মতে, হায়দর খাঁও হদ্দুর আরেক পুত্র। কিন্তু গোয়ালিয়র ঘরানার বিশেষজ্ঞ মহারাষ্ট্রীয় মহলে একথার সমর্থন পাওয়া যায় না। ওয়াকিবহাল মতে হদ্দু খাঁর দুই ছেলে। ছোটে মহম্মদ ও রহিমৎ।

গুলে ইমাম, ছোটে মহম্মদ, রহিমৎ। হস্সু, হদ্দুর এই তিন বংশধরই অপুত্রক। সুতরাং তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গেই এ পরিবারও নিঃশেষ।

এখানে নত্থুর কথাও উল্লেখ করতে হয়। নত্থন পীর বখস্ বা মখ্খনের অপর পৌত্র নত্থু। হদ্দু, হস্সুর সঙ্গে তিনিও পান দাদার তালিম। একই পরিবেশে তাঁরও সঙ্গীতচর্চা। এঁদের তুল্য প্রতিভাধর না হলেও নত্থু আজীবন হস্সু, হদ্দুর সহযোগী ছিলেন। গোয়ালিয়র ঘরানার এক যোগ্য গুণীরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তিনি। আর, আশ্চর্যের বিষয়, নত্থুও অপুত্রক।

শ্যালিকা-পুত্র নিশার হোসেনকে তিনি পোষ্য নেন। নত্থুর তিনি উপযুক্ত শিষ্যও। নামী গায়ক হয়ে গোয়ালিয়রেই থাকেন। নিশার হোসেন ছাত্র তৈরি করেন এখানে। তাঁরও নিজের কোন সন্তান ছিল

না। কিন্তু কোন আত্মীয়স্বজনকে তালিম দেননি নিশার হোসেন। তাঁরও হদ্দু, হস্‌সুর মতন অনাত্মীয় শিষ্য। এ ব্যাপারেও তাঁদের অনুরূপ নিশার হোসেনের পক্ষপাতিত্ব। হদ্দু ও হস্‌সুর মতনই তাঁর শিষ্যরা সবাই মারাঠী ব্রাহ্মণ, যথা—শঙ্কর রাও পণ্ডিত (যাঁর পুত্র কৃষ্ণরাও শঙ্কর পণ্ডিত অশীতিপর বৃদ্ধ হয়ে আজও গোয়ালিয়র ঘরানার প্রতিভূরূপে বিদ্যমান) ও ভাউরাও যোশী; রামকৃষ্ণ বুয়া ভজে ও শঙ্কর রাও হার্দেকর।

নিশার হোসেনের শিষ্যরাই যে শুধু মারাঠা ব্রাহ্মণ তা নয়। তাঁর নিজের জীবনচর্যাও ছিল অনেকখানি সেই রকম।

ধ্যান ধারণায় এমন কি আচার-ব্যবহারেও হিন্দু ভাব তাঁর। সংস্কৃত চর্চায় নিশার হোসেন আনন্দ পেতেন। পছন্দ করতেন মারাঠী ব্রাহ্মণদের খাদ্য। উপবীতধারীও ছিলেন নাকি! শেষ বয়সে প্রিয় শিষ্য শঙ্কররাও পণ্ডিতের বাড়িতেই বাস করে গেছেন। যেন সেই পরিবারেরই একজন।

সেইভাবেই গোয়ালিয়রে প্রয়াত হন নিশার হোসেন, ১৯১৫ সালে। ১৮৪৪ সনে তাঁর জন্ম।

নিশার হোসেনের চার ঘনিষ্ঠ শিষ্যই যে মারাঠী, তা কি হদ্দু, হস্‌সুর দৃষ্টান্তে?

এখন তাঁদের সেই প্রসঙ্গ। ঘরানা বিদ্যা দানের ব্যাপারে দুই ভাইয়ের সেই মতামত। পুত্র ভিন্ন অন্য কোন আত্মীয়-স্বজনকে শেখাবার তাঁরা বিরোধী ছিলেন। এমন কি জামাতাও ব্যতিক্রম নন।

তালিম সম্পর্কে এই মনোভাব অবশ্য সেকালের প্রায় সব খাঁ সাহেবদেরই। কিন্তু হস্‌সু, হদ্দুর এ বিষয়ে ছিল এক পক্ষপাতিত্ব, যা হয়ত অনন্য। তাঁরা দুজনেই বিশেষভাবে মারাঠী ব্রাহ্মণদের শেখাতে চেয়েছেন। শিখিয়েছেনও সযত্নে। তাঁরা ভিন্ন অন্য অনাত্মীয় শিষ্য নেই হস্‌সুর। আর হদ্দুর অ-মারাঠী শিষ্য শুধু গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী।

দু ভাই অকৃপণ হাতে মারাঠী শিষ্যদের ঘরানা সম্পদ দান

করেছেন। এই শিষ্যদের প্রতি বিশেষ আস্থার জন্যেই কি? এ'দের সততা ও কৃতজ্ঞতাবোধের পরিচয়ে কি মুগ্ধ হন হস্সু, হদ্দু? রৌপ্য মূল্যে যে বশীভূত হয়েছিলেন তাও তো নয়। আরেক অধ্যায়ে সেসব কাহিনী দেওয়া যাবে।

যাই হোক, হদ্দু-হস্সুর অনাত্মীয় শিষ্য বলতে মারাঠীরাই। হস্সুর শিষ্য চতুষ্টয়—বাসুদেব বুয়া যোশী (আ. ১৮২৯-আ. ১৮৮২), দেবজী বুয়া বা রামকৃষ্ণদেব বুয়া (১৭৯৮-১৮৫৮), বালকৃষ্ণ বুয়া (প্রথম) ও বাবা দীক্ষিত। আর হদ্দুর শিক্ষায় গঠিত হন বিষ্ণুপন্থ মোরো ও বালা গুরু। লক্ষ্য করবার বিষয়, হস্সু ও হদ্দুর কোন মুসলমান ছাত্র নেই।

গোয়ালিয়রের সেই মহান ওস্তাদের বংশ কবে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁদের সাধের আর সাধনার সঙ্গীত-সম্ভার ধারণ বহন করে রেখেছেন মারাঠা গায়ক-মণ্ডলী। গোয়ালিয়রী খেয়ালের উত্তর-সাধক হয়ে রইলেন হস্সু, হদ্দুর অনাত্মীয় শিষ্যপরম্পরা।

গোয়ালিয়রের এই সঙ্গীত ধারা কেমন করে মহারাষ্ট্রে প্রসারিত হল, সে প্রসঙ্গ এখানে নয়।

তার আগে হদ্দু খাঁর এক জামাতার কথা আছে। তাঁর উল্লেখ না করলে অসম্পূর্ণ থাকবে হদ্দু খাঁর কাহিনী।

তাঁর নাম এনায়েৎ হোসেন খাঁ। তিনি বীণাবাদক ছিলেন আগে। কিন্তু পরে তো খেয়াল-গায়ক হিসেবেও যথেষ্ট নাম করেন। গোয়ালিয়রী চালের গাওয়াইয়া বলে গণ্য করা হয় তাঁকে। কিন্তু এনায়েৎ হোসেনকে তো শেখাননি হদ্দু। হস্সুও নয়। তাহলে?

একটু আগে থেকেই শুরু করতে হয়।

হদ্দু খাঁর দুই জামাই। দুজনেই বীণকার। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হলেন বন্দে আলী খাঁ। ইন্দোরে একটি বীণাবাদক পরম্পরা পত্তন করেন তিনি।

হদ্দু খাঁর কনিষ্ঠ জামাতার নাম এনায়েৎ হোসেন। ১৮৪৯ সালে তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু ১৯১৯-এ। তাঁদের পরিবারটি বীণাবাদক। তাঁর অন্য দুই ভাইও বীণা যন্ত্রের সাধক—আলী হোসেন ও মহম্মদ হোসেন। এনায়েৎ হোসেনরা উত্তর-প্রদেশের শাহ্‌শোয়ান নামক জায়গার বাসিন্দা।

এনায়েৎ হোসেন বীণকার হলেও তাঁর সঙ্গীতকণ্ঠ ছিল। গানের সখের সঙ্গে তাঁর সাধও ছিল শ্বশুরের বিদ্যা লাভ করবার। ওঁদের এই খেয়াল গানের চাল এনায়েতের মন প্রাণ কেড়ে নেয়। ওই ধরনেব খেয়াল গায়ক হবার বড় সাধ জাগে তাঁর।

গানের এত বড় খানদান শ্বশুরের। তা ছাড়া শ্বশুর নিজে এমন দুর্ধর্ষ গায়ক। সেই ঘরে যখন শাদী হয়েছে, দামাদ এসব খেয়ালের চীজ পাবেন না?

এমন হয়ত ভেবেছিলেন এনায়েৎ হোসেন। তখনো শ্বশুরের মতিগতির পুরো পরিচয় তো পাননি।

তাই অনেক আশা করে হদ্দু খাঁর কাছে আর্জি পেশ করলেন ছোট জামাই।

কিন্তু এক কথায় তা নাকচ হয়ে গেল, অবশ্য মোলায়েম ভাষায়।

হদ্দু খাঁ বুঝিয়ে বললেন, 'বীণা বাজাচ্ছ, ওই নিয়ে থাক। আবার খেয়াল গান কেন? অমন করলে কোনটাই হবে না। দুটোর কায়দা-কানুন একেবারে আলাদা। বুঝলে না?'

কিন্তু বুঝলেন না এনায়েৎ হোসেন। তিনি দমবার কি ছাড়বার পাত্র নন। এসব উঁচুদরের ঘরানা খেয়াল এত কাছে থেকে, এমন আপন হয়েও পাওয়া যাবে না, গাওয়া যাবে না, তা কি হয়? রোখ চাপল তাঁর। তবে শ্বশুরের কাছে আবেদন আর নয়। অন্য উপায় দেখতে হবে।

ভাবতে লাগলেন এনায়েৎ হোসেন। লুকিয়ে শুনে ওড়ানো? না। সে বিষয়েও হুঁশিয়ার হদ্দু খাঁ। নিজেই তো সিন্ধিয়ার দরবারে

কিন্তু এনায়েৎ হোসেনের অভিনব পন্থা। তিনি শরণ নিলেন রাওজী বুয়া মস্থরকরের।

তখনকার গোয়ালিয়রে প্রসিদ্ধ বৈদ্য রাওজী বুয়া। তিনিও মহারাষ্ট্রীয়। হদ্দু্র বিশেষ ঘনিষ্ঠ। দরকার হলেই খাঁ সাহেব দাওয়াই নেন তাঁর কাছে।

রাওজী গানও করেন। সৌখীন গায়ক হিসেবে শেখেনও হদ্দু্র কাছে। খাঁ সাহেবের প্রিয়-পাত্র তিনি। এদিকে এনায়েতেরও প্রায় সমবয়সী। বন্ধুর মতন দুজনে মেলামেশা আছে। ওস্তাদের দামাদ বলে রাওজী খাতিরও করেন তাঁকে।

সব দিক ভেবে বৈদ্যজীর কাছে এনায়েৎ প্রস্তাব করলেন, 'আমি আপনাকে বীণা শেখাব। তার বদলি আপনি আমায় দেবেন খেয়ালের চীজ্। আমার শ্বশুরের কাছে এতদিন যা পেয়েছেন, সেসবও নেব। আর আমি যেমন যেমন চাইব, তাও ওখান থেকে আদায় করে দেবেন। কিন্তু সাবধান। উনি যেন কোন রকমেই টের না পান।'

সঙ্গীতের সখ্‌দার রাওজী বুয়া খুশী হয়ে রাজি হলেন। নতুন ওস্তাদের কাছে বীণা শেখা আর তাঁকে খেয়ালের বন্দিশ, তান, পাল্‌টা সরবরাহ করা। এই অভিনব বিদ্যা বিনিময় চলতে লাগল বেশ।

অতিশয় উদ্‌যোগী, কৃতী এনায়েৎ। আর বীণ্‌কার হিসেবে অগ্রসর তো ছিলেনই সঙ্গীতজীবনে। তারপর গানে দস্তুরমত রিয়াজী, পরিশ্রমীও হয়েছিলেন। এইভাবে শ্বশুরের ঘরানা বিদ্যা অনেকখানি আয়ত্ত করলেন তাঁর অজ্ঞাতে, অমতে। তাঁর গান তো বহুদিন শুনেও ছিলেন। সুতরাং অসুবিধা হল না বিশেষ।

তার সুফল পরবর্তীকালে দেখা গেল।

বীণকার এনায়েৎ হোসেন প্রতিষ্ঠা পান ইলেম্‌দার খেয়াল-

গাওয়াইয়া হিসেবেও। তাঁর সর্বভারতীয় খ্যাতি হয়েছিল। হায়দরাবাদে ছিলেন কিছুকাল। নেপাল দরবারেও আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দেন। গুণপনা দেখান আরো নানা আসরে দরবারে। নিজে আবার টপ্‌খেয়াল চালেরও পত্তন করেন। সে আরেক প্রসঙ্গ।

নিজে অনেক খেয়ালের বন্দিশও এনায়েৎ রচনা করেন, যা সঙ্গীত-সমাজে প্রচলিত আছে। আর, অনেকের কাছে স্বীকৃতি পান গোয়ালিয়র ঘরানাদার হিসেবে। হদ্দু খাঁর জামাই বলে অনেকে তাঁকে শ্বশুরের শগীর্দ্‌ বলেও ধরে নেন। বাইরের মানুষ কি করে জানবে তাঁর তালিমের গূঢ় কথা!

তা এক হিসেবে তিনি হদ্দু খাঁর শিষ্য বটে। কারণ তাঁরই ঘরের খেয়াল তো গাইতেন, শ্বশুরের দেখাশোনা চালে। সেই চীজ, সেই-রকম চালের তান, পালটা আর লয়কারী। আর প্রতিভাবান বলে নিজস্ব কিছুও যোগ করে দেন।

কিন্তু আসলে, হদ্দু খাঁর শিষ্য গোষ্ঠীতে এক রকমের একলব্য এনায়েৎ হোসেন। অবশ্য গোয়ালিয়র ঘরানার তালিকায় তাঁর নাম থাকে না। কারণ হদ্দু খাঁ কখনো শিষ্য বলে স্বীকার করেননি জামাই এনায়েৎকে

গোয়ালিয়র থেকে মহারাষ্ট্রে

বাবা দীক্ষিত
বাসুদেব বুয়া যোশী
বালকৃষ্ণ বুয়া (প্রথম)
রামকৃষ্ণদেব বা দেবজী বুয়া

ছত্রে বিষ্ণুপন্থ মোরো
বালাসাহেব গুরু
বালকৃষ্ণ বুয়া ইচল্‌করঞ্জীকর

মারাঠী গুণীরা কি সহজে পেয়েছিলেন গোয়ালিয়র ঘরানার খেয়াল ? কত কাণ্ডই যে একেক জনের জীবনে ঘটে যায় ! কি দুর্ভোগ, কত সাধ্যসাধনা, কি কষ্ট আর হীনতা স্বীকার। কত অশ্রুঝরা প্রহর। কত ত্যাগ, তিতিক্ষা। আবার কোথাও বা ঘটনা-চক্রেই ওস্তাদকে হস্তান্তর করতে হয়েছে, যক্ষের ধন রাগ-বিদ্যা।

একেবারে ভিন্ন সম্প্রদায়ের পেশাদার পরিবার থেকে বেরিয়ে আসা ঘরানা সম্পদ এমন ক্বচিৎ দেখা যায়।

অথচ ইতিহাসের দিক থেকে যেন কত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। গোয়ালিয়র থেকে মহারাষ্ট্রে এই সঙ্গীতধারার পরিক্রমা।

সেকালের গোয়ালিয়র যেন বৃহত্তর মহারাষ্ট্রের এক অঙ্গ। অন্তত সঙ্গীতে তো বটেই। আর রাজনীতিক সূত্রও ছিল। গোয়ালিয়রপতি সিন্ধিয়া বংশীয় মহারাষ্ট্রীয়। সে রাজারা যেমন সঙ্গীতপ্রেমী, তেমনি গায়ক-বাদকদের দরাজ পোষক। আবার রাষ্ট্রীয় যোগাযোগে বহু মারাঠী ব্রাহ্মণ পরিবার হন গোয়ালিয়র-নিবাসী। আর মারাঠীদের তুল্য সঙ্গীতসেবীর তুলনা পশ্চিম বা উত্তর-ভারতে কোথায় ?

তাই গোয়ালিয়র পরম্পরার ধারক-বাহক যে মহারাষ্ট্রীয় কলা-কাররা, তা যেন ঐতিহাসিক নির্বন্ধ। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদক থেকে নিরবচ্ছিন্ন সেই ধারা। শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে প্রসারিত, বিপুল

বিস্তারিত। সূচনায় দশ ব্যক্তির সাধনা। পরিণতিতে কয়েক শো উত্তরাধিকারীর গায়নমণ্ডলী। মহারাষ্ট্রের সঙ্গীত-খাতে নেমে আসা দুকূলপ্লাবী খেয়াল গানের ঢল।

সেই প্রথম পর্যায়ের দশজন মারাঠা গুণী হিসাবে স্মরণীয় আছেন—(১) দেবজী বুয়া নামে বিখ্যাত রামকৃষ্ণদেব বুয়া (আ. ১৭৯৮-১৮৭৮)। (২) বাবা দীক্ষিত (আ. ১৮১০-১৮৮৩)। (৩) বাসুদেব বুয়া যোশী (আ. ১৮১৯-আ). ১৮৮২)। (৪) বালকৃষ্ণ বুয়া (প্রথম) (উনিশ শতকের মধ্যভাগে বিখ্যাত গায়ক)। (৫) ছত্রে বিষ্ণুপদ মোরো (১৮৪০-১৯০৬)। (৬) বালা গুরু (১৮৪৬-১৯২১)। (৭) শঙ্কর পণ্ডিত (১৮৬২-১৯১৭)। (৮) ভাউরাও যোশী। (৯) রামকৃষ্ণ বুয়া ভজে (১৮৭১-১৯৪৩)। (১০) শঙ্কর রাও হার্দিকর।

তাঁদের মধ্যে প্রথম চারজন হস্সু খাঁর শিষ্য। পঞ্চম ও ষষ্ঠের ওস্তাদ হদ্দু খাঁ। শেষের চারজন নিশার হোসেনের শিষ্য।

তাঁরাই মহারাষ্ট্রে গোয়ালিয়র ঘরানার ধারক-বাহক। একই রীতিনীতির খেয়াল গানের সাধক।

তাঁদের আগেও আরো দুজন মারাঠী খেয়ালীয়া ছিলেন।

যথা—মহাদেব বুয়া গোখেল (১৮১৯-১৮৯১) ও আণ্টু বুয়া (আ. ১৮২০-আ. ১৯১০)। দুজনেই বাসুদেব বুয়া যোশী কিংবা দেবজী বুয়ার আগে খেয়াল গানের চর্চা করেছেন।

তবে গোয়ালিয়র ঘরানাদার নন তাঁরা। সেই যে সদারঙ্গের খেয়ালীয়া শিষ্য বংশ ছিলেন লক্ষ্ণৌতে? যে পরিবারে পরে দেখা দেন জয়নাল আবেদীন অর্থাৎ বড়ে মিঞা? মহাদেব বুয়া গোখেল আর আণ্টু বুয়া সেই জয়নাল আবেদীনের শিষ্য। এই দুই মারাঠী খেয়াল গায়কের প্রভাব বৃহত্তর মহারাষ্ট্রের সঙ্গীতক্ষেত্রে বিশেষ দেখা যায়নি। তাঁরা নিজেদের আবদ্ধ রেখে দেন একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীতে। তাঁদের শিষ্যধারাও প্রসারিত হয়নি মহারাষ্ট্রীয় সমাজে।

শিক্ষা দেন চার পুত্রকে—গণপতি বুয়া, বিষ্ণু বুয়া, কৃষ্ণ বুয়া ও শিবরাম বুয়া। চারজনের কেউই বংশের বাইরে শিষ্য করেননি। তাঁদের পরের পর্যায়ে বিখ্যাত হন সদাশিব বুয়া। গণপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনি।

এমনিভাবে মহাদেব বুয়া গোখেলের ধারা পরিচিত হয় গোখেল ঘরানা নামে। কিন্তু সে ঘরানা সম্পদ পরিবারের বাইরে কেউ পায়নি।

জয়নাল আবেদীনের দ্বিতীয় শিষ্য আণ্টু বুয়া ছিলেন গণেশওয়ারির সন্তান। তাঁর তিন ছাত্র—ভানু বুয়া আপ্‌টে (পুত্র), বলবন্ত রাও কেটকর ও বালুটক কনিটকর। তাঁদের পরে এই পরম্পরার আর বিস্তারলাভ হয়নি।

সদারঙ্গের খেয়াল-গায়ক শিষ্যধারায় জয়নাল আবেদীনের মারাঠী শিষ্য প্রসঙ্গ এই পর্যন্ত।

এখন মূল মহারাষ্ট্রীয় খেয়ালীয়াদের কথা। বিশেষ যাঁরা শিখেছিলেন হস্‌সু আর হদ্দু খাঁর কাছে।

প্রথমে বাবা দীক্ষিতের কাহিনীই বলা যায়।

হস্‌সু খাঁর চার শিষ্যের মধ্যে তিনিই সব চেয়ে সুকণ্ঠ। কিন্তু কি কঠিন মূল্য তাঁকে দিতে হয় শুধু শিক্ষার জন্যে। সেই অপরূপ কণ্ঠ-মাধুর্য তাঁর সম্পদ না হয়ে বিপদের কারণ হল।

যে বৃহত্তর সঙ্গীত-জগৎ বাবা দীক্ষিতের যশে পূর্ণ থাকার কথা, সেখানেই তিনি রয়ে গেলেন প্রায় অপরিচিত। 'গুণ হয়্যা দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।' নিজের দুর্ভাগ্যের ভার বাবা দীক্ষিত বহন করে এনেছিলেন।

১৮২৪-২৫ সালের কথা। স্থান গোয়ালিয়র নগর।

বাবা দীক্ষিতের তখন চোদ্দ-পনের বছর বয়স। গোয়ালিয়রেরই সন্তান তিনি। তাঁর পিতা ছিলেন সরকারী চাকুরে। আরো কজন

মহারাষ্ট্রীয়দের সঙ্গে কাজ করতেন মহারাজার অশ্বারোহী বাহিনীতে। তবে তিনি সিপাহী নন, একজন করণিক। সেনাদলের হিসাব বিভাগে তাঁর কাজ।

যেখানে তাঁর কর্মস্থল, তার পাশেই হস্‌সু খাঁর বাড়ি। খাঁ সাহেব তখন বহু-বিখ্যাত গায়ক। গোয়ালিয়রপতির বিশিষ্ট দরবারী। কনিষ্ঠ হদ্দু খাঁর সঙ্গে তাঁর নাম-ডাক শহরের সকলের জানা। বাবা দীক্ষিতেরও।

পিতার বড় সঙ্গপ্রিয় দীক্ষিত। সারাদিনই বাবার কাছে কাছে থাকেন। তাঁর সেই কার্যালয়েও যাওয়া চাই প্রত্যহ। পিতার খাতা-পত্রের কাজ সেখানে। কিন্তু দীক্ষিতের অসুবিধা নেই সেজন্য। তাঁর আর এক প্রিয় জিনিস সেখানে মেলে। খেলা নয়, সমবয়সীদের সঙ্গও নয়—গান।

দীক্ষিতের সবচেয়ে ভাল লাগে, গান। নিজেরও আছে মিষ্টি গলা। আর মনের মতন গান শুনলে, নকল করে গাওয়ার ইচ্ছা। তেমনি শোনবার আগ্রহ।

পিতার এই কাজের জায়গাতেও সে সুযোগ বিলক্ষণ। অমন ওস্তাদ হস্‌সু খাঁর গান শোনা যায় পাশের বাড়িতেই। সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত। আবার বিকালে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর গান চলতে থাকে। এখান থেকে শোনা যায় স্পষ্ট।

কি চমৎকার লাগে দীক্ষিতের। গানের সময় এ ঘরের জানলায় বসে থাকেন। তন্ময় হয়ে শোনেন। গানের মানে কিছু বোঝা যায় না বটে। কিন্তু মন টেনে নেয় তার সুর। দোলা দেয় ছন্দ।

শুধু শোনা নয়। সেই সুরের সঙ্গে দীক্ষিতের কণ্ঠে গানও এসে যায় গুণগুণ করে। গলায় বন্দিশ খানিক উঠে আসে, তানেরও কিছু ধরন-ধারণ নিয়ে।

সে-সব গান বাড়িতেও দীক্ষিতকে গাইতে শোনা যায়। শুনে শুনে মুখস্থ স্থায়ী, অন্তরার আদল।

তাঁর সঙ্গীতে এই আসক্তি আর পিতার দৃষ্টি এড়াল না। তিনি নিজেও ভালবাসেন গান বাজনা। পুত্রের কথা তিনি চিন্তা করে দেখলেন।

লেখাপড়ায় মন নেই দীক্ষিতের। আর এমন সহজপটুত্ব গানে! এত একান্ত টান সঙ্গীতে! এখন দস্তুরমত শিক্ষা পাওয়া দরকার। তাহলে স্বাভাবিক প্রবণতায় পরে বড় গায়ক হতে পারবে। আর তাঁর কর্তব্য, দীক্ষিতের ভালভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

এ ব্যাপারে হস্‌সু খাঁর কথাই মনে পড়ল প্রথমে। এত বড় গুণী রয়েছেন এখানে। ওস্তাদজীর কাছে যাওয়া অবশ্য কঠিন। সচরাচর কাউকে তালিমও তিনি দেন না বটে। তবে অন্য সুযোগ একটু আছে।

সেই চেষ্টাই করলেন দীক্ষিতের পিতা। কাজের সূত্রে তাঁরও তো রাজদরবারে যাতায়াত করতে হয়। কিছু জানাশোনাও ছিল মহা-রাজার পাত্রমিত্রদের সঙ্গে।

কজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে এ বিষয়ে তিনি জানালেন। তাঁদের সাহায্য চাইলেন হস্‌সু খাঁকে অনুরোধ করতে। রাজ-সভাসদ বলে খাঁ সাহেবও তাঁদের খাতির করতেন।

রাজী হলেন তাঁরা। দীক্ষিতকে শেখাবার জন্যে খাঁ সাহেবের কাছে আর্জি পেশ করলেন।

বৃত্তান্ত শুনে হস্‌সু খাঁর মনে মনে পছন্দ হল না এই প্রস্তাব। কিন্তু এক কথায় প্রত্যাখ্যান করতেও পারলেন না।

তাঁদের বললেন, 'আগে ছেলেটিকে আনুন। তার গলা কেমন শুনি, শিখতে পারবে কি না। তারপর বলব।'

ভেবেছিলেন, গলার কোন দোষের অজুহাতে নাকচ করে দেবেন।

তখন দীক্ষিতকে নিয়ে আসা হল হস্‌সুর কাছে।

ওস্তাদজী বললেন, 'কি গান জান, একটু গাও তো।'

দীক্ষিত যে বন্দিশ শোনালেন, তাজ্জব বনলেন খাঁ সাহেব। এ তো তাঁরই গান! আচ্ছা নকল করে নিয়েছে দেখছি। উচ্চারণ ভুল বটে। তানও ঠিক মতন করতে পারে না। রাগ-তালের জ্ঞান নেই। পদ্ধতিও জানে না কিছু। কিন্তু গলা চমৎকার। খেয়ালের সব রকম কাজের উপযুক্ত। অনুকরণের ক্ষমতাও বেশ। নিয়ম-মাফিক তালিম পেলে এ ছেলে তুরন্ত গাওয়াইয়া হবে বেফিকর।

বিলক্ষণ জানতেন, তবু পরীক্ষা করতে হস্সু জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথা থেকে এ গান শিখেছ?'

দীক্ষিত সত্য উত্তরই দিলেন।

খাঁ সাহেবের মনে কি রকম চিন্তা জাগল, কে জানে! হয়ত ভাবলেন, তিনি তালিম না দিলে ছেলেটি অন্য কারুর কাছে শিখতে পারে। যা গলা আর গাইবার ক্ষমতা, ওকে আটকে রাখা যাবে না।

অনেক ভেবেচিন্তে, শেখাতে রাজি হলেন দীক্ষিতকে। কিন্তু এক অদ্ভুত শর্ত দিলেন।

দীক্ষিতের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমাকে আমি তালিম দেব। কিন্তু তুমি কসম খাও, তৈরি হবার পর কখনো প্রকাশ্য আসরে গাইবে না, মহারাজার দরবারেও গান শোনাবে না কোনদিন।

একে ছেলেমানুষ। ওস্তাদজী শেখাতে রাজি হয়েছেন, তাতেই মহা খুশী। তাই তারুণ্যের উন্মাদনায় হস্সুর কথা তখনই মেনে নিলেন। প্রতিজ্ঞাও করলেন যথারীতি। কারণ শেখাই তখন তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় কথা।

কিন্তু পরে নিজের ভুল বুঝেছিলেন। এমন শপথ নেবার অর্থ গায়ক-জীবনে আত্মহত্যারই তুল্য। তবু এই অন্যায় শর্ত আমৃত্যু তিনি পালন করে যান।

মহারাষ্ট্রের সঙ্গীত ইতিহাসে এক আশ্চর্য করুণ চরিত্র বাবা দীক্ষিত।

হস্সু খাঁর তালিম ভালভাবেই পেয়েছিলেন তিনি। অপরূপ

তাঁর কণ্ঠসম্পদ ছিল। সবেরই পরিচয় তিনি দিতেন ঘরোয়া আসরে। কিন্তু বাইরের সঙ্গীত-সমাজ তাঁর গুণপনার পরিচয় পায়নি।

বাবা দীক্ষিতের শপথের কথা জানতেন মহারাজা সিন্ধিয়া। তাই তাঁর ঘরে গানের সময় তিনি অদূরে থেকে শুনতেন, ছদ্মবেশে।

বাবা দীক্ষিত যে কাউকে শিষ্য করেননি, তাও হয়ত ওই অন্যায় প্রতিজ্ঞার জন্য।

যেন একলব্যের মতন বাবা দীক্ষিতের গুরুদক্ষিণা। নিজেরই প্রকাশনীয় বিদ্যাকে গুপ্ত রেখে দেওয়া গুরুর তৃপ্তিতে। শিষ্যের স্বেচ্ছায় আত্ম-বলিদান। বাবা দীক্ষিতের বিস্তৃত সাঙ্গীতিক পরিচয় তাই বিশেষ দেবার নেই, প্রতিভাধর হওয়া সত্ত্বেও।

হস্সু খাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত এবং প্রধান শিষ্য হলেন বাসুদেব বুয়া যোশী।

তাঁকে বাবা দীক্ষিতের মতন দুর্ভাগ্য মেনে নিতে হয়নি। কিন্তু যে মূল্যে তিনি এই ঘরানা সম্পদ পান, তাও আর এক রকমে মর্মান্তিক। কি কঠোর দুঃখভোগের পর বাসুদেব বুয়ার সঙ্গীতজীবন যে সার্থক হয়েছিল! বিদ্যা আহরণের জন্য কি বিপুল ত্যাগ স্বীকার!

কোঙ্কনের সুপরিচিত সঙ্গীতকেন্দ্র আলীবাগ। তার কাছেই নর্গাঁও নামে একটি গ্রামে বাসুদেব বুয়া যোশীর জন্ম। আনুমানিক ১৮১৯ তাঁর জন্মসন।

গ্রামটি এমনিতে তো অখ্যাতই ছিল। কিন্তু সেখানে শুধু বাসুদেব নন, পরে অভ্যুদয় হয় আরও দুজন দিকপাল গুণীর। দুর্ধর্ষ গায়ক বালাসাহেব গুরুজী ও স্বনামধন্য পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাটখণ্ডে এই গ্রামেরই সন্তান। সুতরাং নর্গাঁওয়ের সঙ্গীতমাহাত্ম্য অনন্য-সাধারণ মানতেই হয়।

সেই গ্রামের ছেলে বাসুদেব। অল্প বয়স থেকেই অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়। সবচেয়ে ভাল লাগে তাঁর গান গাইতে আর ভাল

করে শিখতে। কিন্তু কি ভাগ্যহীন বেচারি—গানের উপযুক্ত গলারই অভাব। সুরহীন কণ্ঠ তাঁর।

কিন্তু অদম্য তাঁর সঙ্গীতে উৎসাহ। গান শিখতেই হবে এই জিদ নিয়ে বালক বাসুদেব নগাঁও ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

প্রথমে এলেন আলীবাগে। লক্ষ্ণৌর সেই বড়ে মিঞা অর্থাৎ জয়নাল আবেদীন তখন এখানে ছিলেন। ১৮৩০ থেকে ১৮৩৭ পর্যন্ত বড়ে মিঞা থাকেন আলীবাগের বাবা-সাহেব বিওয়াল্‌করের আশ্রয়ে। খেয়াল-গায়ক হিসেবে মিঞা সাহেবের সে সময় খুবই নামডাক।

বাসুদেব তাঁর কাছে এসে গান শিক্ষার প্রার্থনা জানালেন।

আবেদীন তাঁর কণ্ঠের পরিচয় পেয়ে রায় দিলেন, 'গান ছাড়া অন্য যে কোন বিষয় শেখো। তোমার যা গলা, এতে সঙ্গীত হবে না।'

কিন্তু নিরাশ হলেন না বাসুদেব। বড়ে মিঞার এক তৈরী শিষ্য ত্র্যম্বকরাও গোড়বলের সঙ্গে তাঁর বিশেষ জানাশোনা। এবার তাঁকে শেখাবার জন্য অনুরোধ করলেন।

ত্র্যম্বকরাওও রাজি হলেন না। বললেন, 'ওস্তাদ তোমার গলা খারাপ বলে বাতিল করেছেন। এখন আমায় বলে আর লাভ কি?'

বাসুদেবের বড়ই অপমান বোধ হল।

ত্র্যম্বকরাওকে মুখের ওপর বলে দিলেন, 'আচ্ছা দেখে নিও—একদিন আমি তোমার চেয়েও ভাল গাইতে পারব। আর না হলে নিজের গাঁয়ে কোনদিন ফিরে আসব না।'

তারপর কাউকে কিছু না জানিয়ে যোশী বুয়া আরও দূরে পাড়ি দিলেন।

আগে থেকেই শুনেছিলেন গোয়ালিয়রে গান-চর্চার কথা। হদ্দু, হস্‌সু খাঁর নাম। তাই সেখানেই যাত্রা করলেন।

বহুদূরের পথ। সহায়সম্বলহীন অবস্থা। রেলগাড়িও সে যুগে

হয়নি। কিন্তু অদম্য বাসুদেব। পায়ে হেঁটে চললেন অজানা গোয়া-লিয়রের উদ্দেশে।

অনেক কষ্ট স্বীকার করে এক সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌছলেন। তারপর কিভাবে যে হস্সু খাঁর সঙ্গে পরিচিত হলেন আর ওস্তাদজী তাঁকে শিষ্য বলে গ্রহণ করলেন, সে বৃত্তান্ত জানা যায়নি।

তবে শোনা যায়, গোয়ালিয়রের কোন কোন মহারাষ্ট্রীয় পরিবার আশ্রয় দিয়েছিলেন বাসুদেবকে। তাঁদেরই সহায়তায় হস্সু খাঁ তাঁকে শেখাতেও রাজি হন।

তার আগে থেকে হস্সু খাঁ তালিম দিচ্ছিলেন তাঁর আরও তিনজন মারাঠী শিষ্য:কে। তাঁরা হলেন বাবা দীক্ষিত, বালকৃষ্ণ বুয়া, আর দেবজী বুয়া। শেষের দুজনের কথা পরে বলা হবে।

খাঁ সাহেবের সম্মতির সঙ্গে বাসুদেব আশ্রয়ও পেলেন তাঁর গৃহে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। আসল ব্যাপার অর্থাৎ গানের তালিম বহুৎ দূর অস্ত।

ওস্তাদজীর মতিগতি অন্যদিকে।

ছাত্রকে সঙ্গীতে আগ্রহের চেয়ে অন্য নানা রকমের যোগ্যতা দেখাতে হত। সে সব কাজের ফিরিস্তি দেওয়া অসম্ভব। এক কথায় বলা যায়, গুরুর সেবা-পরিচর্যায় হামেহাল নিযুক্ত থাকা। তিনি যে-কোন সময় যে-কোন ফরমায়েস করবেন, তা পালন করা। সব অবস্থায় বিনত ব্যবহার, ইত্যাদি। অর্থাৎ বিনা মাহিনায় সর্বার্থসাধক পরিচারক বা খিদ্‌মদগার হয়ে রইলেন যোশী বুয়া।

এইভাবে মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। অসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, শ্রমে ওস্তাদজীর সেবা তিনি করে গেলেন। তবু তাঁর আসল তালিম কবে হত, সে বিষয়ে সন্দেহ। তবে হস্সুর বিবির নাকি মনে দয়া জাগে শিষ্যের দুর্গতি দেখে। তাঁর প্রবল ইচ্ছায় আর বাসুদেবের নিষ্ঠায় অবশেষে রীতিমত শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে।

সেই নবীশী পর্বের স্মৃতিচারণ যোশীজী করতেন পরিণত বয়সে। বলতেন—

'প্রথম দশ-বার বছর বলতে গেলে ওস্তাদজী কিছুই শেখাননি। কি প্রাণান্তকর ছিল সেই সব বছরের পর বছর কাটানো। প্রায় এক যুগ পরে তালিম দেওয়া শুরু হয়।'

তখন থেকে ভালভাবেই শেখেন বাসুদেব। দস্তুরমত নিয়মে গলা সেধে সেই কণ্ঠও শুদ্ধ হয়। সুরেলা, সাবলীল, যথেচ্ছ তান কর্তবের যোগ্য।

বাসুদেব বুয়া শুধু দিক্‌পাল গায়ক হলেন না। মহারাষ্ট্রের এক সম্মানিত আচার্য হন পরিণত বয়সে। তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের ধারায় খেয়াল গান মারাঠী সঙ্গীত-সমাজে বিস্তারলাভ করে।

অনেক ছাত্রকে তিনি ভালভাবে শিক্ষা দেন গোয়ালিয়রে। তাঁর শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী হন জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাইয়া সাহেব যোশী (আ. ১৮৫৫-১৯২০) ও বালকৃষ্ণ বুয়া ইচল্‌করঞ্জীকর (১৮৪৯-১৯২৭)।

বাসুদেবের আর এক কৃতী শিষ্য পান্না গুরুজী (১৮৫০-১৯২১)। তিনি বিখ্যাত বালাসাহেব গুরুজীর কনিষ্ঠ ভাই। পান্না গুরুজীও নামী খেয়াল-গায়ক হয়েছিলেন মহারাষ্ট্রে।

বাসুদেব বুয়ার যোগ্য পুত্র মধুরকণ্ঠ ভাইয়া সাহেব। তিনি পনের-ষোল বছর বয়সেই গায়ক হয়ে আসরে দেখা দেন। বিপুল রাগ-বিদ্যা আর সুদক্ষ গায়কী নিয়ে পিতার উপযুক্ত উত্তরসাধক হন যৌবন কালেই। গুরুভাই বালকৃষ্ণ বুয়া ইচল্‌করঞ্জীকরের (বিবরণ পরে দেওয়া হবে) সঙ্গে পিতার অনেক আসরে সহ-গায়ক থেকেছেন। বাসুদেব বুয়া যখন ১৮৭৮ সালে সারা মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন গানের অনুষ্ঠানে, তরুণ ভাইয়া সাহেবও হন সহযোগী।

হস্‌সু খাঁর মৃত্যুর পরেও বাসুদেব যোশী গোয়ালিয়রেই বাস করতে থাকেন। তারপর হদ্দু খাঁর মৃত্যুতে এই ঘরানার নেতারূপে মান্যতা পান জীবনের শেষ পর্যন্ত।

তাঁর প্রধান শিষ্য বালকৃষ্ণ বুয়া ইচল্‌করঞ্জীকর। তিনি মহারাষ্ট্রের অঞ্চলে অঞ্চলে গুরুর আসর করতেন। বাসুদেব যোশীর সঙ্গীতে

তখন পরিতৃপ্ত হতেন তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী। মারাঠী সঙ্গীত-সমাজের সেসব অপূর্ব অভিজ্ঞতার দিন। অভিনব গায়ন-রীতি খেয়ালের প্রথম প্রসার আর সমাদর বাসুদেবের কল্যাণে। মহারাষ্ট্রে খেয়াল গানের জয়যাত্রা।

আলীবাগের সেই যে গায়ক ছিলেন ত্র্যম্বকরাও গোড়বোলে? বাসুদেব বুয়াকে গলা খারাপ বলে গান শেখাতে চাননি? তিনিও ফিরিয়ে নিয়েছিলেন বাসুদেব সম্পর্কে সেদিনের মন্তব্যটি।

তেমনি সম্মান বাসুদেব পান মহারাষ্ট্রের বাইরেও, যেখানে যেখানে গান শুনিয়েছেন। দ্বারবঙ্গ, বেতিয়া, কলকাতায়—নবাব ওয়াজিদ আলীর মেঠিয়াবুরুজ দরবারে। সঙ্গীতগুণী নবাব তাঁর গান শুনে দস্তুরমত তৃপ্ত হন। তারিফ করেন আন্তরিকভাবে। আবার যোশীজীর অনুরোধে স্বয়ং নৃত্য দেখান ওয়াজিদ আলী শাহ্।

নেপাল দরবারেও বাসুদেব বুয়ার আসর হয়েছিল। তাঁকে দরবারী নিযুক্ত রাখতে চান গুণমুগ্ধ রাণা প্রধান মন্ত্রী। অনেক মূল্যবান উপহারও গায়ক শিল্পীকে দেন। কিন্তু যোশীজী সে অনুরোধ রাখতে পারেননি নেপালের শীত, নিজের প্রাচীন বয়স ইত্যাদির জন্যে।

কোঙ্কণের অখ্যাত দরিদ্র বালক বাসুদেব বুয়া। কিন্তু পরিণত বয়সে প্রয়াণ করেন গোয়ালিয়রের মাননীয় সঙ্গীতাচার্যরূপেই।

তিনি ভিন্ন হস্সু খাঁর আর এক বিশিষ্ট শিষ্য বালকৃষ্ণ বুয়া (প্রথম)। বাসুদেব বুয়া যোশীর প্রধান শিষ্যের নামও বালকৃষ্ণ বুয়া (ইচল্‌করঞ্জীকর)। তাই হস্সু-শিষ্য জ্যেষ্ঠ বালকৃষ্ণ বুয়া হলেন 'প্রথম'।

সেই আদি বালকৃষ্ণ বুয়াও গোয়ালিয়রের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। তিনি জন্ম থেকেই এক দুর্ভাগ্য বহন করে আসেন। দৃষ্টিহীন বালকৃষ্ণ।

জন্মান্ধ পুত্রের আর আশা ছিল না কোন দিকেই। কিন্তু

স্বভাবদত্ত এক সম্পদ তিনি পান। সুমিষ্ট-কণ্ঠ এবং গানে একান্ত অনুরাগ।

বালকৃষ্ণের পরিবারের পক্ষে অনেক তদ্বির করা হয় রাজসভায় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দিয়ে। তাঁদের উদ্‌যোগে হস্‌সু খাঁ বালকটিকে শেখাতেও রাজি হন।

কিন্তু তালিম পাবার আগে শগীর্দের বছরের পর বছর কাটে খিদমৎগারিতে। বাসুদেবের মতনই বালকৃষ্ণ বুয়া ধীর স্থির ভাবে ওস্তাদের সমস্ত ফাই-ফরমাস খেটে চলেন।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় দীর্ঘ কাল পরে। তাঁর সুকণ্ঠ, মেধা, অধ্যবসায় সার্থকতায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে। হস্‌সু খাঁর ঘরানাদার হিসেবে গুণীর স্বীকৃতি পান উনিশ শতকের মধ্যভাগে। তবে তাঁর তেমন শিষ্য-গঠনের কথা জানা যায় না। একমাত্র শঙ্কর পণ্ডিত প্রথম জীবনে কিছুদিন খেয়াল শেখেন বালকৃষ্ণ বুয়ার কাছে। শঙ্কর পণ্ডিত পরে নিশার হোসেনের শিষ্য হন। আর খাঁ সাহেবের তালিম পান অনেক বছর।

হস্‌সু খাঁর অপর কৃতী শিষ্য রামকৃষ্ণদেব বা দেবজী বুয়া। খাঁ সাহেবের বীর শিষ্যের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ তিনি। তাঁর জন্ম আঠার শতকের শেষ দিকে।

হস্‌সুর তালিম পাবার জন্যে দেবজী বুয়াকে অমন হীনতা স্বীকার কিংবা দুঃখভোগ করতে হয়নি, বাসুদেব বুয়া কিংবা বালকৃষ্ণের মতন। তবে তাঁর কাছেও খাঁ সাহেব আর এক রকমে আদায় করেছিলেন।

দেবজী বুয়ার সঙ্গীত-জীবনের ইতিহাস বড় বৈচিত্র্যময়। মহারাষ্ট্রে তাঁর তুল্য বহুমুখী প্রতিভাধর গায়ক দুর্লভ। একাধারে তিনি ধ্রুপদী, ধামারী, খেয়ালীয়া এবং টপ্পাগুণী। প্রতি রীতিতেই দিক্‌পাল কলাবতের তালিম পেয়েছেন। স্বয়ং আচার্যরূপেও সম্মানিত থেকেছেন উত্তর জীবনে।

যখন হস্‌সু খাঁর কাছে দেবজী খেয়াল শিখতে আসেন গোয়া-

লিয়রে, তখনই তিনি প্রতিষ্ঠিত গায়ক। ধ্রুপদ, ধামার ও টপ্পা অঙ্গে পরিচিত গায়নশিল্পী। বয়স ৪১ বছর অর্থাৎ পরিণত বয়সী। কিন্তু তখনো তিনি শিক্ষার্থী।

হস্‌সু খাঁর কাছে দেবজী বুয়া খেয়াল শেখবার প্রার্থনা জানালেন।

খাঁ সাহেব তাঁকে জানতেন আগে থেকে।

অমনি পাল্টা প্রস্তাব দিলেন, 'আমি তোমায় শেখাব। কিন্তু তার বদলে তুমি আমার ছেলে গুলে ইমাম আর খুড়তুত ভাই নথ্থুকে শেখাও ধ্রুপদ, ধামার আর বিশেষ করে টপ্পা।'

দেবজী রাজী হলেন। হস্‌সু গাণ্ডাবাঁধা শিষ্য করলেন তাঁকে।

পাল্টাপাল্টি দু পক্ষেই তালিম দেওয়া চলল। গুলে ইমাম ও নথ্থু খাঁর উপরন্তু বন্দে আলী খাঁকেও কিছুদিন শেখান দেবজী। তরুণ বন্দে আলী খাঁ হলেন হদ্দু খাঁর জামাতা এবং পরবর্তী কালের স্বনামধন্য বীণ্‌কার। গোয়ালিয়রে শ্বশুরালয়ে থাকবার সময় বন্দে আলী টপ্পার চীজ্‌ বুয়াজীর কাছে নিয়েছিলেন।

দেবজী এসবের পরিবর্তে ভাল তালিম পেয়েছিলেন খেয়ালে। হস্‌সু খাঁর কাছে প্রায় বার বছর শিক্ষায় মহা-কৃতী খেয়াল-গায়ক হন। তখন তিনি পঞ্চাশ বছর উত্তীর্ণ। সঙ্গীতে প্রবীণ। ধ্রুপদ ধামার টপ্পা খেয়ালের দিক্‌পাল কলাবৎ।

কিন্তু তারপর হস্‌সু, হদ্দু খাঁর পরিবারের সঙ্গে দেবজীর সম্পর্ক দাঁড়াল বৈরিতার। তাঁর নিজেরই ছাত্র গুলে ইমাম আর নথ্থু খাঁ তাঁর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠলেন।

১৮৫৪ সালে হস্‌সুর মৃত্যু হল। তখন মহারাজা সিন্ধিয়া দেবজীকে নিযুক্ত করতে চাইলেন দরবারে।

দেবজী বুয়াকে কিন্তু রাতারাতি গোয়ালিয়র থেকে পলায়ন করতে হয়। কারণ তাঁর এক বন্ধু জানান—তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে শত্রুপক্ষ।

গোয়ালিয়র থেকে দেবজী চলে যান ইন্দোরে।

এখানে তাঁর পূর্ববৃত্তান্ত বলে নেওয়া যায়।

রামকৃষ্ণদেব হলেন পুনার এক চিৎপাবন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। সেই দেব ছিল মূল পরাঞ্জপে গোষ্ঠীর এক শাখার একটি নতুন উপ্‌রি নাম। স্বর্গত শিবরাম মহাদেব পরাঞ্জপেও ওই পরিবারের।

রামকৃষ্ণ বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতপ্রিয় আর স্বভাবদত্ত সুকণ্ঠের অধিকারী। তখনকার এক বিখ্যাত গায়ক ও হরিদাস গড়্‌গি বুয়া। তাঁর সঙ্গে সাথীদার হয়ে তিনি অনেক সময় থাকতেন। সহ-গায়ক হয়ে রামকৃষ্ণ একবার বরোদা পর্যন্ত গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে।

দেবজীর দুর্ভাগ্য যে, গড়্‌গি বুয়া অকালে মারা যান। ফলে রামকৃষ্ণদেব হয়ে পড়েন নিঃসহায়। সঙ্গীত শিক্ষার ব্যাপারে আর কারুর সাহায্য পাবার আশা তাঁর রইল না।

বয়সে তরুণ হলেও গানে তাঁর দুর্জয় সংকল্প। মানসিক প্রবণতা এই যে, কোন বড় গুণীর কাছে গান ভালভাবে শিখতেই হবে। নচেৎ জীবনই বৃথা। সুতরাং সর্বদিকে তিনি অভীষ্টের সন্ধান করতে লাগলেন এক চিত্তে।

আত্মীয় বলতে তাঁর এক মাতুল ছিলেন রামচন্দ্র শাস্ত্রী শাঠে। তিনি পুরাণিক বংশীয়। শাস্ত্রীজী তখন থাকতেন বিঠুরে। কানপুরের নিকটে ব্রহ্মাবর্তে। নির্বাসিত শেষ পেশোয়া, বাজী রাওয়ের (দ্বিতীয়) বিঠুর দরবারে রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী চাকরি করতেন।

সে সময় ধ্রুপদ-গুণী, নায়ক চিন্তামন মিশ্রও ছিলেন বাজী রাওয়ের দরবারী গায়ক। চিন্তামন (১৭৮০-১৮৬০) শুধু বিখ্যাত গায়ক নয়, ধ্রুপদ গান-রচয়িতাও। তা ভিন্ন, তিনি 'সঙ্গীতদর্পণ'-প্রণেতা, পণ্ডিত দামোদর মিশ্রের বংশধর।

রামকৃষ্ণদেব এইসব সংবাদ নিয়ে বিঠুরে উপস্থিত হলেন। মাতুলকে সম্মত করলেন সনির্বন্ধ অনুরোধে। তাঁরই মাধ্যমে চিন্তামন মিশ্র রামকৃষ্ণকে শিষ্য করে নিলেন।

এমন আচার্য পেয়ে তিনিও শিখতে লাগলেন একান্ত আগ্রহে। নিরন্তর সে সাধনা বছরের পর বছর। গুরুরও অকৃপণ বিদ্যাদানে ধন্য তাঁর সঙ্গীত-জীবনের প্রকৃত শিক্ষাই পেলেন এখানে।

কয়েক বছরের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে রামকৃষ্ণদেব কৃতবিদ্য ধ্রুপদী হলেন।

সেসময় সর্দার হোসেন খাঁ নামে এক ব্যক্তি থাকতেন বিঠুরে। তিনি টপ্পাবাজ। শোরী মিঞার ধারায় টপ্পাগায়ক হোসেন খাঁ। রামকৃষ্ণদেব তাঁর গানেও আকৃষ্ট হন। আর চিন্তামন মিশ্রের কাছে ধ্রুপদ শিক্ষার পর টপ্পা শিক্ষা সংগ্রহ করেন হোসেন খাঁর নিকটে।

তারপর খাঁ সাহেবেরই পরামর্শে রামকৃষ্ণদেব কালপির মুগ্‌লু খাঁর তালিম নিতে যান। তিনি তখন দিল্লী-নিবাসী। মুগ্‌লু খাঁর কাছে রামকৃষ্ণ শিখতে থাকেন টপ্পা আর ধামার। এ যাত্রায় দিল্লীতে তিনি ১৮২৬ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত থেকে যান।

টপ্পা ও ধামারের সুদক্ষ গায়ক হয়ে রামকৃষ্ণ আসেন আলোয়ার রাজ্যে। রাজস্থানের এই দরবারে ১৮৩৪ পর্যন্ত সভাগায়ক নিযুক্ত থাকেন। তারপর উপস্থিত হন বারাণসীতে। এখানে তাঁর পরিচয় লাভ হয় বিখ্যাত মৃদঙ্গী জ্যোৎ সিংহের শিষ্য নানা পান্‌সের সঙ্গে।

কাশীতে রামকৃষ্ণদেব ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৯ পর্যন্ত থাকেন। এ ক বছরও তাঁর বৃথা যায়নি সঙ্গীত সঞ্চয়ে। জাফর খাঁ ও কাল্লান খাঁ ভ্রাতাদের কাছে অনেক ধ্রুপদ এই পর্বে শিখে নেন।

তারপরই দেবজী যান গোয়ালিয়রে, হস্‌সু খাঁর তালিম পাবার জন্যে। সে বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে।

হস্‌সুর মৃত্যুর পর দেবজী ইন্দোরে থাকেন এক বছর। তারপর ধারের মহারাজা দ্বিতীয় যশোবন্ত রাওয়ের দরবারী গায়ক নিযুক্ত হন। এখানেই সভাগুণী থাকেন ১৮৭৮ পর্যন্ত। অর্থাৎ জীবনের শেষ ২৩ বছর।

ধার রাজ্যে এই দীর্ঘ বাসের সময় দেবজী বুয়ার অনেক শিষ্য হন।

সেই মহারাষ্ট্রীয় গায়কদের তিনি শিক্ষা দেন ধ্রুপদ ধামার খেয়াল টপ্পা। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মহারাষ্ট্রের সঙ্গীতক্ষেত্রে নিজেদের নামকে স্মরণীয় রেখেছেন। যথা লালজী বুয়া ঢেক্নে ও তাঁর ভাই গণপৎরাও। পণ্ডিত বালকৃষ্ণ বুয়া (তিনি অবশ্য বাসুদেব বুয়ার প্রধান শিষ্য), রাওজী বুয়া গোগতে, বামন বুয়া কবথেকর প্রভৃতি। গোয়ালিয়রের শঙ্কর পণ্ডিত ও তাঁর ভাই একনাথ পণ্ডিতও পরে দেবজীর কাছে টপ্পা শিখতে যান ধার রাজ্যে। শঙ্কর পণ্ডিত তার আগে থেকেই নিশার হোসেনের শিষ্য এবং বিখ্যাত খেয়াল-গায়ক ছিলেন, একথা বলে রাখা যায়।

এমনিভাবে ধার মহারাষ্ট্রের এক মহান সঙ্গীত-কেন্দ্রে পরিণত হল। আর তা দেবজী বুয়ার নেতৃত্বে। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা রীতির ব্যাপক প্রচার ঘটল মারাঠী গায়ন সমাজে। দেবজীর নাম এজন্যেও স্মরণীয় হয়ে আছে। আর শুধু খেয়াল গানের চর্চা যদি ধরা হয়, সেক্ষেত্রেও তাঁর মহারাষ্ট্রে দান উল্লেখ্য। এই অঙ্গে তাঁর নিজেরই সাধন চলেছিল একযুগ যাবৎ। আর তার শিক্ষা দান ও বিস্তার করেন দু'যুগেরও বেশি।

এই পর্যন্ত হস্সু খাঁর চার মারাঠী শিষ্যের কথা। বাবা দীক্ষিত, বাসুদেব বুয়া যোশী, বালকৃষ্ণ বুয়া (প্রথম) ও দেবজী বুয়ার সঙ্গীত-জীবন তথা মহারাষ্ট্রে তাঁদের ভূমিকার বৃত্তান্ত।

এখন হদ্দু খাঁর দুই মহারাষ্ট্রীয় শিষ্যের প্রসঙ্গ। তাঁরা হলেন ছত্রে বিষ্ণুপন্থ মোরো এবং বালাসাহেব গুরুজী। দুজনেই যেমন বিখ্যাত গুণী, তেমনি মহারাষ্ট্রের সঙ্গীতক্ষেত্রেও কালজয়ী কীর্তি রেখে গেছেন।

ছত্রে বিষ্ণুপন্থ ওস্তাদের তালিম পান বহু কষ্টে। হস্সু খাঁর কাছে বাসুদেব বুয়া কিংবা বাবা দীক্ষিতের যেমন অভিজ্ঞতা, হদ্দুর কাছেও বিষ্ণুপন্থের প্রায় সেই রকম। তেমনি দুর্বার তাঁর অল্প বয়সেই সঙ্গীতশিক্ষার পণ। আর তা সার্থক করবার দুর্জয় অধ্যবসায়।

বিষ্ণুর জন্মসন ১৮৪০। সেকালের কুরুন্দওয়াড় রাজ্যের বিজাপুরের নিকটে টিকোটা তাঁর জন্মস্থান। সেখানকার ছত্রে পরিবারের সন্তান বিষ্ণুপন্থ।

তাঁর প্রথম জীবনে তাঁদের সাংসারিক অবস্থা বড়ই অসচ্ছল হয়ে পড়ে। বিষ্ণুর বাবা সামান্য চাকরি করতেন জামখণ্ডি রাজ্যে। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পর বৃটিশ প্রশাসক সে কাজও ঘুচিয়ে দেন। তখন বিষ্ণুকে রেখে দেওয়া হয় তাঁর মাতামহের আশ্রয়ে।

সে অঞ্চলে কোন বিদ্যালয় না থাকায় দশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর লেখাপড়াই হয়নি। ছেলেবেলা থেকেই বিষ্ণু যেমন স্বাস্থ্যবান তেমনি ঝোঁক সাঁতার ইত্যাদির দিকে। আর ভাল লাগত ঘোড়া, বাঁদর, কুকুর কিংবা আরও কোন কোন বন্য জন্তু বশ করতে। ঘোড়ায় চেপে ঘোরা আর পশু-পাখীদের নিয়ে খেলাতেও তাঁর তেমনি আগ্রহ আর পটুত্ব।

আরও একটি প্রিয় সখ বালক বিষ্ণুপন্থের। গান গাওয়া। নিজের গলায় মিষ্টত্ব বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু অন্যের শোনা গান গাইতে ইচ্ছে যায় অনেকক্ষণ ধরে। সঙ্গীতের সুর মনকে বড়ই আকর্ষণ করে।

এই অবস্থায় তাঁর বিয়ে হল ষোল বছর বয়সে। তারপর তিনি রামদুর্গায় গেলেন। ঘোড়সওয়ারের কাজ পেলেন সেখানে। মাসিক বেতন তিন টাকা। আহার ও বাসস্থানের বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

তার কিছুদিন পরের কথা। বিষ্ণু তখন ছুটিতে এসেছেন জামখণ্ডিতে। একদিন তাঁর বন্ধুবান্ধবরা গানের আসর করলেন। বাইরের কোন গায়কের জন্য নয়, নিজেরাই গাইবেন সেখানে।

বন্ধুদের কেউ কেউ বেশ সুকণ্ঠ। গান কিছু কিছু শিখেছেন। একে একে গান শোনাচ্ছেন সবাই।

বিষ্ণুর পালা এলে তিনিও যা হোক গাইলেন।

কিন্তু সকলেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে লাগলেন তাঁর গান শুনে, 'ওঃ কি সুরেলা গলা! আর কি সঙ্গীতের জ্ঞান!'

যেমন অপমান তেমনি কষ্ট হল বিষ্ণুপন্থের। মহা স্বাধীনচেতা তিনি।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'যারা হাসি-তামাশা করলে, মনে রেখ। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, গোয়ালিয়রের মতন জায়গায় যাব। সেখানে ওস্তাদদের কাছে দস্তুরমত গান শিখব। তারপর ফিরে এসে শিখিয়ে দেব তোমাদের।'

পরের দিনই তিনি ঘর ছেড়ে বেরুলেন। ইস্তফা দিলেন ঘোড়-সওয়ারের চাকরিতে। পায়ে হেঁটেই চললেন গোয়ালিয়রের উদ্দেশে।

দূর কষ্টকর যাত্রা। তাই পথে বিপত্তিও অনেক ঘটল। কিন্তু অদম্য বিষ্ণুপন্থ। অবশেষে গোয়ালিয়রে পৌঁছলেন ১৮৫৯ সন নাগাদ।

তারপর অনেক চেষ্টায় এখানে শ্রীমন্ত বাবা সাহেব আপ্‌টে নামে এক সর্দারের সঙ্গে পরিচয় করলেন। আর গান শেখাবার সুযোগ পেলেন তাঁরই সহায়তায়। ধ্রুপদী তাতু ভাইয়ার শিষ্য হয়ে রীতিমত শিখতে লাগলেন।

এখানে সবচেয়ে বড় ওস্তাদ যে হদ্দু খাঁ একথাও জানতে পারলেন বিষ্ণুপন্থ। তখন কি করে খাঁ সাহেবের কাছে শিখতে পারবেন, এই হল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। আর যার যা ভাবনা তা সিদ্ধ হয়, অনন্যতন্ত্র থাকলে।

হদ্দু খাঁর কাছে তিনি একেবারে ধর্ণা দিয়ে পড়লেন। গান শেখাতেই হবে তাঁকে। সেজন্যে ওস্তাদের যে কোন হুকুম মানতে তিনি রাজি। অনেক দূর থেকে অনেক আশা দিয়ে এসেছেন। সঙ্গীত ছাড়া অন্য কোন গতি নেই তাঁর জীবনে। নাছোড়বান্দা বিষ্ণুপন্থকে অবশেষে হদ্দু খাঁ বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। তিনিও যথাসাধ্য সেবাযত্নে তুষ্ট করতে লাগলেন ওস্তাদজীকে।

হদ্দু খাঁর গান তিনি এখন অনেক সময়েই শুনতে পান। এই মহা সুযোগ এসেছে খাঁ সাহেবকে পরিচর্যার সূত্রে। বিষ্ণু যখন যে কাজই করুন ওস্তাদের গান হলেই শোনেন একাগ্রচিত্তে। তাতেও শিক্ষার কাজ অনেকখানি হয়। এমনি করে কিছু কিছু চীজ সংগ্রহও চলতে থাকে। বুঝতে পারেন গানের খানিক ধরনধারণ। কিন্তু সেরকম করে তো আর শেখা যায় না পুরো।

তাই সুবিধা পেলেই হুজুরে আর্জি পেশ করেন। পদসেবায় কিংবা কোন হুকুম তামিলে পরিতুষ্ট অবস্থায়। প্রার্থনা জানান দস্তুরমত তালিমের।

কিন্তু ওস্তাদজীর কোন জবাব মেলে না। ও কথায় বোবা বনে যান। গ্রাহ্যই করেন না কোন আবেদন।

বিষ্ণুও অসীম ধৈর্যে সে বাড়িতে পড়ে থাকেন। ওস্তাদের কাজকর্মও পরিচর্যা করে যান যথারীতি। আপাতত লাভ এইটুকু যে, তাঁর গান শোনা থেকে বঞ্চিত হন না।

দেখতে দেখতে মাসের পর মাস শুধু নয়,, বছরও ঘুরে গেছে একাধিক। আরও কত দিন যেত বলা যায় না। ওস্তাদও সদা-সচেতন, যতদিন এড়ানো যায় তালিম। জামাইকেই অদেয়, এ তো কোথাকার পর।

এমন সময় ঘটল এক অঘটন। বিষ্ণুপন্থ তখন ওস্তাদের সংসার-যাত্রার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছেন। ঘাড়ে নিয়েছেন ওস্তাদের যাবতীয় খাস কাজ। কোথাও দুদিনের জন্যে গেলেও সঙ্গে নিতে হয় তাঁকে। সব সময়ে হুজুরে হাজির। এমন সেবককে না হলে এক দণ্ড চলে না তাঁর। সর্ব ব্যাপারে খিদমৎগার।

সেবার হদ্দু খাঁ মথুরায় বেড়াতে এসেছেন। অবশ্যই সপরিবারে। সুতরাং বিনা তলবে হুকুমবরদারও আছেন নিত্যসঙ্গী হয়ে।

সেদিন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে খাঁসাহেব বায়ুসেবনে বেরিয়েছেন।

নৌকাযানে চলেছেন যমুনা বেয়ে। বর্ষাশেষের ভরা নদী। তার যেমন স্রোত, তেমনি বাতাসের বেগ। নৌকো বাইতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল মাঝি। ক্রমেই হাওয়ার জোর বাড়তে লাগল।

হঠাৎ নৌকোর হাল ভেঙে গেল। তারপরই ভাঙল একটা দাঁড়। মাঝি আর সামাল দিতে পারলে না। নৌকো টালমাটাল করে ভেসে চলল স্রোতের টানে।

হদ্দু খাঁ সাঁতার জানতেন না। প্রমাদ গনলেন তিনি। আবার সঙ্গে রয়েছেন বিবি আর ছেলেরা। ওস্তাদজী আল্লা নাম জপতে লাগলেন। ভয়ে কম্পমান শরীর।

বিষ্ণু বুঝতে পারলেন বিপর্যয় আসন্ন। দুরন্ত সাঁতারু তিনি। করণীয় ঠিক করে নিলেন, আর দেরি না করে। নৌকোর লম্বা দড়ির একদিক নিজের কোমরে শক্ত করে বাঁধলেন। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদীতে।

বাঁচন-মরণ পণ করে ডাঙার দিকে সাঁতরাতে লাগলেন। ওই ভারী নৌকোকে টেনে নিয়ে যাওয়া কি প্রাণান্তকর ব্যাপার। ভাগ্যক্রমে একটা গাছের গুঁড়ি ভেসে আসছিল। বিষ্ণু সেটিকে জড়িয়ে ধরে সুবিধা পেলেন খানিকটা। কোমরের দড়ির সঙ্গে গুঁড়িটাকেও বেঁধে নিলেন। কোনরকমে এসে পৌছলেন তীরে। তারপর ডাঙায় উঠে, টেনে আনলেন নৌকো।

এতক্ষণ টানাপোড়েনের মধ্যে হদ্দু খাঁ ভাবছিলেন, 'ছেলেটা আমাদের বাঁচাতে গিয়ে নির্ঘাত মারা পড়বে।'

তার ওপর, তীরে উঠে বিষ্ণু অজ্ঞান হয়ে গেলেন, এই অমানুষিক ধকলের ফলে। জ্ঞান ফিরে আসতে বেশ সময় লেগেছিল। ছাত্রের হাল দেখে অনুশোচনা জাগল খাঁ সাহেবের মনে। সহানুভূতি আর অনুকম্পাও।

সেদিনই বিষ্ণুর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল, ওস্তাদের জন্যে প্রাণ বিপন্ন করে।

সকলের সামনেই হদ্দু খাঁ বিষ্ণুকে বললেন, 'আচ্ছা এবার থেকে তোমায় আমি তালিম দেব, যত নিতে পারো। ঘরানা চীজ কিছুই গোপন করব না তোমার কাছে।'

তা ওস্তাদজী কথা রেখেছিলেন। তাঁর শিক্ষাদানও সার্থক হয়েছিল বিষ্ণুপন্থের নিরলস সাধনায়। হদ্দু খাঁর এই শিষ্যও গোয়ালিয়র ঘরানার সুযোগ্য উত্তরসাধক হয়ে ওঠেন।

এমন কি, হদ্দু খাঁর যথার্থ উত্তরাধিকারীও বিষ্ণু। কারণ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র (ছোটে) মহম্মদ পিতার জীবিতকালেই প্রাণ হারান, অমিতাচারের ফলে। আর কনিষ্ঠ রহিমৎ খাঁও অপ্রকৃতিস্থ জীবন যাপন করেন। নানা নেশার কবলিত তিনি।

দীর্ঘজীবী এবং অসাধারণ প্রতিভাধর হয়েও রহিমৎ নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। অব্যবস্থিত, বিশৃঙ্খল, বিপর্যস্ত ছিল তাঁর জীবনযাত্রা। বহু বছর তো তিনি নিরুদ্দেশই থাকেন। সঙ্গীতবর্জিত, পরিচয়হীন কালহরণ। বিষ্ণুপন্থ বিস্তর চেষ্টায় তাঁকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনেন সঙ্গীত-জীবনে। তা হল ১৮৯৭ সালে।

যা হোক, বিষ্ণুপন্থ সেই যে বন্ধুদের সামনে শপথ করেছিলেন, তা রেখেছিলেন শেষ পর্যন্ত। শুধু বিখ্যাত নন, মহারাষ্ট্রের একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিক্ষক হিসেবেও নিজের নাম রাখেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যেও নামী খেয়াল-গায়ক হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন।

তবে তিনি নিজে সুকণ্ঠ গায়নশিল্পী হতে পারেননি, ওস্তাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েও। কারণ, সুদক্ষ গায়ক হয়েও কণ্ঠ তাঁর কর্কশই থেকে যায়।

ছত্রে বিষ্ণুপন্থ মোরোর আর একটি বিষয়ে নাম থাকে মহারাষ্ট্রে। সঙ্গীতের সঙ্গে তার অবশ্য কোন সম্পর্ক নেই।

তিনি এক সার্কাস দলের পত্তন করেন ১৮৮৩ সালে। মারাঠীদের মধ্যে এবিষয়ে তিনি একজন পথিকৃৎ। ছেলেবেলায় সেই যে জন্তু-জানোয়ারদের নিয়ে খেলায় পটু ছিলেন, তারই এই পরিণতি।

প্রথম সার্কাস দলপতি হিসেবেও লোকে মনে রাখে খেয়াল গানের ওস্তাদ ছত্রে বিষ্ণুপন্থকে। তাঁর মৃত্যু হয় ইন্দোরে, ১৯০৬ সালে।

তুলনায় তাঁর গুরুভাই বালাসাহেবের ভাগ্য ভাল, হদ্দু খাঁর তালিম পাবার ব্যাপারে।

বালাসাহেব গুরুজীর এক পূর্বপুরুষ মহারাজা জানকোজীর কম বয়সে গৃহশিক্ষক ছিলেন। সেই সুবাদে তাদের বংশগত উপাধি হয়ে যায় গুরুজী।

বালা গুরুর পিতা মোরেশ্বরের সঙ্গে হদ্দু খাঁর বিশেষ জানাশোনা ছিল। ছেলেবেলায় সর্দার পরিবারের ছেলে বালাসাহেব যাতায়াত করতেন খাঁ সাহেবের বাড়িতে। তখন সেখানে নিশার হুসেন খাঁ ছোটে মহম্মদ আর রহিমতের তালিম চলত।

বালা গুরুও হদ্দু খাঁর কাছে শিখতে থাকেন তাঁদের সঙ্গে। এমনিভাবে শিক্ষার সুযোগ পেয়ে সাধন-বলে তিনি নিজের গায়ক জীবন গড়ে নেন। পরে হয়ে ওঠেন গোয়ালিয়র ঘরানার সুদক্ষ কলাবৎ। খেয়াল গানের আচার্যরূপে সম্মানিত হন মহারাষ্ট্রে।

সমকালীন ভারতেও এক প্রসিদ্ধ খেয়াল-গুণী বালাসাহেব। প্রাচীন ভারতের গুরু-গৃহের আদর্শ তিনি সঙ্গীতজীবনে অনুসরণ করে গেছেন। আপন আবাসে শিষ্যদের ভরণ-পোষণের সঙ্গে বালাসাহেব শিক্ষা দিয়েছেন বিনামূল্যে। আজন্ম গোয়ালিয়র-নিবাসী বালা গুরুজী। তাঁর জীবনকাল ১৮৪৬ থেকে ১৯২১ সাল।

হস্সু, হদ্দু খাঁর এই ছজন শিষ্যের পর নিশার হুসেনের শিষ্য চতুষ্টয়। তাঁরা সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত গায়ক। শঙ্কর পণ্ডিত [তিনি আগে (প্রথম) বালকৃষ্ণ বুয়ার কাছেও শেখেন], ভাউরাও যোশী, রামকৃষ্ণ বুয়া ভজে ও শঙ্কর রাও হার্দেকর।

তাঁদের কিন্তু শিক্ষার জন্যে কঠিন মূল্য দিতে হয়নি, হস্সু, হদ্দুর বেশির ভাগ শিষ্যের মতন। কারণ প্রকৃতই উদার ছিলেন নিশার

হুসেন। তিনি কি সাত্ত্বিকভাবে শঙ্কর পণ্ডিতের বাড়িতে দিনচর্যা করতেন, তার উল্লেখ করা হয়েছে আগের অধ্যায়ে।

নিশার হুসেনের চারজন শিষ্যই গোয়ালিয়র ঘরানাদার হিসাবে মহারাষ্ট্রে খেয়াল গানের প্রচার করেন। প্রতিনিধি থাকেন। শিক্ষা দেন ছাত্রদেব। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কৃতী শঙ্কর পণ্ডিত। তাঁর পুত্র তথা শিষ্য কৃষ্ণরাও পণ্ডিত। এই ধারায় প্রবীণতম আচার্যরূপে আজও তিনি গোয়ালিয়রে বর্তমান। উনিশ শতকের শেষদিকে কৃষ্ণরাওয়ের গোয়ালিয়রে জন্ম

হস্সু হদ্দু নিশার হুসেনের শিষ্য এই ভাবে গোয়ালিয়র ঘরানা খেয়ালের ধারক-বাহক হন মহারাষ্ট্রে। তাঁদের আগে অবশ্য (সদারঙ্গের শিষ্যবংশীয়) মহাদেব বুয়া গোখেল ও আন্টু বুয়া মহারাষ্ট্রীয় খেয়াল গায়করূপে দেখা দিয়েছিলেন, মনে রাখা যায়

ওই তিন ওস্তাদের শিষ্যধারা বিস্তৃত হয় প্রশিষ্য পর্যায়ে। মহারাষ্ট্রের সঙ্গীতজীবনে ও মানসে সে এক অখণ্ড ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। ছাত্র-ধারায় বিশিষ্ট গীতরীতির ক্রমবিস্তৃতি। প্রথম দশজনের পরের প্রজন্মেই শতাধিক খেয়াল-গুণী দেখা দেন। পরবর্তী পর্যায়ে শ'য়ে শ'য়ে।

সুরৈশ্বর্যের সূত্রডোরে গাঁথা গায়ন-পরম্পরা মহারাষ্ট্রে। ভারতের অন্য কোন প্রদেশে খেয়াল গানের এমন ব্যাপক প্রসার ঘটেনি। গোয়ালিয়রী ছন্দপ্রধান, তান-লয়কারী সমৃদ্ধ ভারী চালের খেয়ালরীতির উত্তরাধিকারী মহারাষ্ট্রীয় গায়ন সমাজেই। গুণে ও পরিমাণে এত সঙ্গীত-সাধক, এত উদার সঙ্গীত-শিক্ষক, এত ত্যাগী সঙ্গীত-সেবী, এত মহৎ গায়নাচার্য অন্যত্র দেখা যায়নি। এ এক অনন্য উদাহরণ।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রশিষ্য পর্যায়ের কেবল এক গুণীর পরিচয় এখানে দেওয়া যাক। তিনি হলেন বালকৃষ্ণ বুয়া (দ্বিতীয়)। বাসুদেব বুয়া যোশীর সর্বোত্তম শিষ্য। (প্রথম বালকৃষ্ণ বুয়া ছিলেন হস্সুর শিষ্য,

অন্ধ গায়ক)। দ্বিতীয় বালকৃষ্ণ বুয়া, ইচল্‌করঞ্জীকর নামেই বিখ্যাত। কারণ তিনি দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের ইচল্‌করঞ্জীরাজ্যের নিবাসী হয়ে তাকে সঙ্গীতের এক পীঠস্থানে পরিণত করেন, সাধনায় ও বিদ্যাদানে।

খেয়াল গানের প্রচারে ও প্রচলনে ইচল্‌করঞ্জীকর বালকৃষ্ণ বুয়ার এক মহত্তম ভূমিকা। দেড় শতাধিক সঙ্গীত-শিষ্যের গুরুরূপে তিনি এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন মহারাষ্ট্রে। তাঁরই অন্যতম শিষ্য, স্বনামধন্য বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্‌কর।

সেই বিরাট তরুবরের জীবন সূচনা হয় সামান্য বীজের আকারে।

খেয়াল-সঙ্গীতের রীতি বিষয়ে ইচল্‌করঞ্জীকরের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা ছিল। কথাটির যেন তাৎপর্য আছে তাঁর নিজের জীবন সম্পর্কেও।

তিনি বলতেন, 'যখন আমরা গান গাই, যেন একটি গাছকে গড়ে তুলি।'

স্থায়ী, অন্তরার ভিত্তিতে তান বিস্তার বাড়তে রাগ-রূপ বিকশিত হয়ে ওঠে। মূর্তি লাভ করে সম্পূর্ণ বিগ্রহ। তেমনি গুণীর জীবনেও।

সার্থক খেয়াল গানের তুল্য ক্রমবর্ধমান। অঙ্কুর থেকে যেমন কাণ্ডের বৃদ্ধি। তার থেকে দেখা দেয় শাখা-প্রশাখা।

তারপর পত্রসম্ভার। ডালে ডালে উজ্জ্বল বর্ণে বিকশিত পুষ্প। খেয়ালের চীজ বন্দিশের ওপর বিস্তার, তান বণ্টন, ছন্দ-কর্ম ইত্যাদি সজ্জায় 'গাছ গড়ে তোলা'।

এইপ্রকার বিন্যাসে রূপায়িত ইচল্‌করঞ্জীকরেরও খেয়াল গান। মহারাষ্ট্রে এই রীতির তিনি ব্যাপক আকারে প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নিজের জীবনও এমনি পল্লবিত হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত। বহু আঁধার রজনীর অবসানে ঊষার আলোকচ্ছটা।

সঙ্গীত ভালভাবে শিক্ষার জন্যে অপরিসীম কষ্টভোগ আর ত্যাগ-স্বীকারেও দ্বিতীয় বালকৃষ্ণ এক দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। দারিদ্র্য,

সুযোগের অভাব, বিরুদ্ধ পরিবেশ কিছুই লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি তাঁকে।

১৮৪৯ সালে মামার বাড়িতে তাঁর জন্ম। পিতৃবংশের যজমানী পুরোহিত বৃত্তি। তবে বালকৃষ্ণের পিতার এ পেশা ভাল লাগেনি। সঙ্গীতচর্চায় মন ছিল তাঁর। কিন্তু উপযুক্ত অর্থ উপার্জনে আর সংসার প্রতিপালনে অক্ষম। তিনি হরিদাসী পদগান করতেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থা নৈরাশ্যকর। আর এই পেশার জন্য তাঁর ভ্রাম্যমান জীবন।

শৈশবেই মাতৃহারা হলেন বালকৃষ্ণ। তখন তাকে পাঠানো হয় কাকাদের কাছে, ইচল্‌করঞ্জীকরে। এখানে তাঁর লেখাপড়া শেখবার কথা।

কিন্তু নিতান্ত অবহেলার মধ্যেই বালকটিকে এখানে থাকতে হয়। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তো দূরের কথা। কাকারা চাইতেন, বালকৃষ্ণ বাড়ি বাড়ি পুরোহিতগিরি করুক। আর দক্ষিণা এনে দিক তাঁদের হাতে। নিষ্ঠুর তাদের ব্যবহার। অবাধ্য হলেই বালককে প্রহার ভোগ করতে হত। আরো নানা ধরনের নির্যাতন।

বালকৃষ্ণের তখন দশ বছর মাত্র বয়স। তবু তিনি কাকাদের আশ্রয় ত্যাগ করলেন তিক্ত-বিরক্ত হয়ে। কাউকে কোন কথা না জানিয়ে চলে গেলেন মহাইসাল নামে একটি জায়গায়।

এখানে তাঁর যোগলেকর বলে তাঁর এক হরিদাস পিতৃবন্ধু থাকতেন। বালকৃষ্ণের বাবার মতন যোগলেকরেরও হরিদাসী পদ গান করা পেশা। দুজনে মাঝে মাঝে দেখা হত কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে। কিন্তু সেসময় বালকৃষ্ণের পিতা এত দূর কোন অঞ্চলে চলে যান যে, তিন বছর যোগলেকরের সঙ্গে তাঁর দেখা হল না।

বালকৃষ্ণের সুকণ্ঠ লক্ষ্য করলেন যোগলেকর। তাঁকে হরিদাসী পদগান শেখালেন। ক্রমে এক-একটি অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে লাগলেন বালকৃষ্ণ। তাঁর মিষ্টি গলায় হরিদাসী পদাবলী শ্রোতারা

তৃপ্তির সঙ্গে শুনতেন। তিন বছর কাটল এইভাবে। তারপর হঠাৎ তিনি পিতার সন্ধান পেলেন।

এমনি একটি উৎসবে বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বালকৃষ্ণের। ছেলেকে এবার তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন। জাঠ নামে একটি জায়গায় থাকতেন, সেখানে।

কিন্তু বালকৃষ্ণের কি দুর্ভাগ্য! কিছুদিনের মধ্যেই পিতার মৃত্যু হল। আর সর্বস্বান্ত হলেন এবার। অথচ রীতিমত সঙ্গীত-শিক্ষার আগ্রহ এখন তাঁর তীব্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোন উপায় করতে পারলেন না ভালভাবে গান শেখার।

বছর খানেক ব্যর্থ চেষ্টার পর কোলহাপুরে গেলেন। এক ওস্তাদের কাছে জানালেন আবেদন নিবেদন। কিন্তু সেখানেও আশাভঙ্গ হল।

তারপর গেলেন সাঙ্‌লি। সেখান থেকে পুনায়। অবশেষে এলেন ধার নগরে। এতদিন পরে সুপ্রসন্ন হল ভাগ্য। এখানে বিখ্যাত দেবজী বুয়ার কাছে শিক্ষার সুযোগ পেলেন।

এ যাত্রায় চার বছর শিখলেন ধ্রুপদ, টপ্পা আর খেয়াল। কিন্তু তারপর তাঁর কাল হলেন গুরুপত্নী। সে এক উগ্রচণ্ডার দৌরাত্ম্য। তাঁর তাড়নায় বালকৃষ্ণকে দেবজীর আশ্রয় ও ধ্রুপদ শেখা ছাড়তে হল। পুনরায় বেরিয়ে পড়লেন পথে পথে। কিন্তু লক্ষ্য স্থির রইল। আর অদম্য অধ্যবসায়। কারণ সঙ্গীত-শিক্ষার এখনও অনেক বাকি।

আবার গুরুর সন্ধান করতে লাগলেন সহায়-সম্বলহীন তরুণ। সঙ্গতিতে নিঃস্ব। কিন্তু অজেয় মনোবল তাঁর। আর ভালভাবে গান শিক্ষার অদম্য অভিলাষ।

কিছুদিন পরে বারাণসীতে উপস্থিত হলেন। এখানে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার পোষকতা পেলেন সঙ্গীতগুণে। তাঁর কাছে বছরখানেক নিযুক্ত রইলেন। তারপর মহারাজা তাঁকে নিয়ে যেতে চাইলেন দাক্ষিণাত্যে, নিজের রাজধানীতে। কিন্তু তাহলে আর সঙ্গীত-

শিক্ষার সুযোগ হবে না। এই চিন্তায় রাজ-আশ্রয় ত্যাগ করে বালকৃষ্ণ রয়ে গেলেন কাশীতেই। কিন্তু কোন সঙ্গীত-গুরুর সন্ধান তখন মিলল না। সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল এখানে।

অবশেষে চলে এলেন গোয়ালিয়রে। এখানে তখন বাসুদেব বুয় যোশী সগৌরবে বিরাজমান। তাঁর কাছেও শিক্ষার প্রার্থনা করলেন কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হলেন প্রথমে। তবে শিষ্যের নিষ্ঠায় আর আত্ম-নিবেদনে বাসুদেব বুয়া সম্মতি দিলেন শেষ পর্যন্ত।

বালকৃষ্ণ তাঁর কাছে একাদিক্রমে ছ বছরেরও বেশী শিখলেন। কঠিন সাধনসাপেক্ষ হল এই শিক্ষাক্রম। কিন্তু কিছুতেই এ সুযোগ তিনি হারালেন না। ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে পালন করলেন গুরুর যাবতীয় নির্দেশ।

বাসুদেব বুয়া শিষ্যকে গোয়ালিয়রী চালের সমস্ত বিশেষত্ব, গুপ্ত বিদ্যা, কলাকৌশল শেখালেন। ক্রিয়াসিদ্ধির কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন বালকৃষ্ণ বুয়া। এতদিন তিনি স্বভাব-দত্ত সুকণ্ঠ ছিলেন। এবার কৃতবিদ্য হলেন রাগের ঐশ্বর্যে ও গভীরতায়। খেয়াল গানের সুনিপুণ রীতিনীতিতে। তানকর্তবের সৌকর্যে। লয়কারীতে।

স্বয়ং বাসুদেব বুয়া তাঁকে গোয়ালিয়র গায়কীতে পারঙ্গম বলে স্বীকৃতি দিলেন।

তারপর বললেন, 'এবার তুমি ঘরে ফিরে যাও। বিবাহ করে সস্ত্রীক আবার গোয়ালিয়রে এস।'

গোয়ালিয়রপতি জিয়াজীরাও বালকৃষ্ণের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তিনি পাঁচশো টাকা তাঁকে দান করলেন বিবাহের খরচপত্রের জন্য।

কিন্তু গুরুভক্ত বালকৃষ্ণ তার থেকে পঞ্চাশ টাকা মাত্র নিজে রাখলেন। আর সাড়ে চারশো টাকা প্রণামী দিলেন বাসুদেবকে।

দেশে ফেরবার পথে তিনি বোম্বাইতে যাত্রাভঙ্গ করলেন। শুনলেন যে, ছোটে মহম্মদ (হদ্দু খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র) তখন পরিভ্রমণরত এই অঞ্চলে।

বালকৃষ্ণ অমনি ছোটে মহম্মদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আসরে আসরে যেতে লাগলেন তাঁর ভ্রমণসঙ্গী হয়ে। আর বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য ও কঠিন রূপ আর চীজ বন্দিশ শিক্ষা সংগ্রহ করে নিলেন। মুলতুবি রাখলেন বিবাহ। এক বছরের ওপর এইভাবে কেটে গেল।

তারপব ছোটে মহম্মদ খাঁর কাছে বিদায় নিয়ে এলেন সাতারায়। এখন তাঁর অনেক বন্ধুবান্ধব অনুরাগী হয়েছেন। তাঁরা তাঁর খুব আড়ম্বরে বিয়ে দিলেন ১৮৭৭ সালে। বালকৃষ্ণ সাতারাতেই আপাতত স্থিত হলেন। দিনদিন তাঁর যশোবৃদ্ধি হতে লাগল মহান গায়ন-শিল্পী বলে।

তিনি এবার তৎপর হলেন গুরুর সঙ্গীত প্রচারে। বাসুদেব বুয়া যোশীর জন্যে মহারাষ্ট্রের অঞ্চলে অঞ্চলে আসরের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। সঙ্গীত-প্রিয় মহারাষ্ট্রীয় সমাজে সাড়া জাগল সেসব অনুষ্ঠানে। গুরুর সঙ্গে গুণপনায় শিষ্যের নামও লোকের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে লাগল।

এই ভ্রমণ-সূচীর পর বাসুদেব বুয়া নেপাল দরবারে গেলেন আমন্ত্রণ পেয়ে।

সেখান থেকে ফেরার কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হল। গোয়ালিয়রেই, ১৮৮০ সালে। গুরুর অন্তিমকালে বালকৃষ্ণ সেবা-পরিচর্যায় নিযুক্ত রেখেছিলেন নিজেকে।

যোশীজীর দেহান্তেব পর বালকৃষ্ণ বোম্বাইতে এসে রইলেন। আর সঙ্গীতের সেবা করতে লাগলেন সর্বপ্রকারে। এখানে সঙ্গীত বিষয়ে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ('সঙ্গীত দর্পণ') প্রকাশনা আরম্ভ করলেন, পণ্ডিত বিশ্বনাথ বুয়া কালের সহযোগিতায়। আর একটি 'গায়ন সমাজ' স্থাপন করলেন।

এবার মহা গৌরবের পর্ব আরম্ভ হল বালকৃষ্ণ বুয়ার জীবনে। মহারাষ্ট্রের ক'জন শ্রেষ্ঠ মনীষী, সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি তাঁর গুণমুগ্ধ শিষ্য হলেন। এই 'গায়ন সমাজে' বিখ্যাত ইতিহাসবিদ্

পণ্ডিত স্যার রামগোপাল ভাণ্ডারকর, ন্যায়াধীশ শ্রীকে. টি. তৈলাঙ্গ, আইনজ্ঞ শান্তরাম নারায়ণ, শ্রীএম. এম. কুণ্টে, মহাদেব চিন্তামন আপ্‌টে প্রমুখ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা সঙ্গীত শিক্ষা করেন তাঁর অধীনে।

বোম্বাইয়ের জলহাওয়া কিন্তু বালকৃষ্ণের সহ্য হল না। বোম্বাই থেকে তিনি চলে গেলেন প্রথমে পুনা। তারপর অন্ধ্র হয়ে মিরাজে। এখানে তিনি বেশ সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল বাস করলেন। এ সময়েই পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর তাঁর শিক্ষা পেলেন দশ বছর, একাদিক্রমে। পণ্ডিত গুণ্ডুবুয়া ইঙ্গলেও সেই সঙ্গে শিখলেন। পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন পণ্ডিত অনন্তমনোহর যোশী, নীলকণ্ঠবুয়া, বামনবুয়া চাপেকর প্রমুখ বালকৃষ্ণের আরও কজন কৃতী শিষ্য।

সঙ্গীতাচার্যের বিপুল সম্মান ও প্রতিষ্ঠা তাঁর মিরাজেই প্রথম লাভ হল।

আবার পারিবারিক শোকও পেলেন এখানে। ১৮৯৪ সালে তাঁর পত্নীর মৃত্যু ঘটল। আর পর্যুদস্ত হয়ে পড়ল বালকৃষ্ণের সংসার। একমাত্র পুত্র আন্না বুয়াকে তখন দেখবার কেউ রইল না। আন্না তখন মাত্র সাত বছরের বালক। সঙ্গীতগুণী পরম ধৈর্যে সংসারের সব দায়িত্ব বহন করতে লাগলেন।

ইচল্‌করঞ্জীর ভূস্বামী ছিলেন বালকৃষ্ণ বুয়াজীর গুণমুগ্ধ পৃষ্ঠপোষক। তিনি এই দুঃসময়ে সাহায্য-কর প্রসারিত করে দিলেন। ঈশ্বরপ্রেরিত যেন সে সহায়তা।

তাঁর সাদর উদার আমন্ত্রণে বালকৃষ্ণ এসে বসতি করলেন ইচল্‌করঞ্জীতে। রাজা তাঁর সুখে-স্বচ্ছন্দে বাসের সব ব্যবস্থা করে দিলেন। বাস্তবিক বালকৃষ্ণ সপুত্র রইলেন যেন রাজপরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে।

এবার তিনি সাংসারিক সব দায়িত্ব থেকে মুক্ত হলেন। আচার্যের মহৎ কর্তব্যে নিয়োজিত রাখলেন নিজেকে। সঙ্গীতের সেবায়, শিক্ষকতায়, প্রসারে।

ইচল্‌করঞ্জীতেই তাঁর বিশাল শিষ্যমণ্ডলী গড়ে উঠল। প্রায় দুশো ছাত্রকে তিনি গায়ন-শিক্ষা দেন জীবনের এই শেষ ত্রিশ বছর যাবৎ। তাঁদের মধ্যে মিরাশি বুয়া, দত্ত বুয়া কালে, উমা মহেশ্বর বুয়া, বেন্দ্রে বুয়া প্রমুখ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পুত্র আন্না বুয়াও হন উদীয়মান গায়ক।

মিরাজ থেকেই বালকৃষ্ণ বুয়ার শিক্ষাদান পর্ব আরম্ভ হয়েছিল। বলা যায় ১৮৮৭ থেকে।

তারপর ১৯২৭ পর্যন্ত পূর্ণ পঞ্চাশ বছর তাঁর জীবনের কুসুমিত অধ্যায়। যেমন কলাকার, তেমনি আশ্চর্য আচার্যরূপে গৌরবোজ্জ্বল। এই সুদীর্ঘকাল উচ্চে উড্ডীন থাকে তাঁর বিজয়কেতন। কোন আসর তাঁর ব্যর্থ হয়নি। কখনো তাঁকে নিরাশ করেনি সঙ্গীতকণ্ঠ। তিন সপ্তকে সাবলীল সুরেলা স্বর তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। তারা গ্রামে তিনি স্থির হতেন অবিকৃত স্বরে।

আর শিক্ষকরূপে? প্রাচীন ভারতীয় গুরুগৃহের আদর্শ তাঁরও। ছাত্রদের বিদ্যা দিয়েছেন সযত্নে, সস্নেহে। বিনামূল্যে, অকৃপণভাবে।

স্বভাবেও ইচল্‌করঞ্জীকর আদর্শস্থানীয়। নানা গুণের আধার। যেমন নিরহঙ্কার, তেমনি তোষামোদের উর্ধ্বে। সৌজন্যপূর্ণ তাঁর আচরণ। অথচ আত্মমর্যদাসম্পন্ন। সকল গুণীদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ এবং অসূয়াশূন্য।

যেমন শিল্পী-জীবনে তেমনি ব্যক্তিরূপেও পূত-চরিত্র। পরিচিত জনের আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতির পাত্র। তাঁরা অনেক সময় স্থির করতে পারতেন না—কোন্‌টি বেশি সুমিষ্ট। তাঁর গান, না শুদ্ধ হিন্দীতে কথোপকথন? এমন মনোরম, আন্তরিক আচার্যের কথাবার্তা।

আর সঙ্গীতক্ষেত্রে তো মহারাষ্ট্রীয় কলাকারদের কুলতিলক। অবিসংবাদিত, সাদর সে আসন সঙ্গীত সেবকদের হৃদয়ে হৃদয়ে।

কিন্তু শেষ জীবনে বড়ই মনস্তাপ পেয়েছিলেন বালকৃষ্ণজী। অমন উপযুক্ত উত্তরসাধক পুত্র আন্না বুয়ার অকাল-মৃত্যু হল। তার

এক মাসের মধ্যেই মারা গেলেন আচার্যের কন্যা। উপর্যুপরি দুই মহাশোকে বিপর্যস্ত হলেন গুরুজী। এই তনয়া পিতাকে সেবা, যত্ন আর সব রকমে দেখাশুনা করতেন। তাঁদের অভাব পূরণ করবার জন্যে তৎপর হলেন ইচল্‌করঞ্জীর রাজা। তাঁর চিকিৎসাদি নানা বিষয়ের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু নিয়তিকে খণ্ডাবে কে?

অবশেষে মরজগতের অমোঘ বিধান গায়নাচার্যের জীবনেও ঘনিয়ে এল। ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চিরবিদায় নিলেন তিনি।

মহারাষ্ট্রের সঙ্গীত-জীবনে এক অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি হল। আর মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীত-ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রইল তাঁর নাম। তাঁর কীর্তিকথা স্মরণ করতে লাগল সকলে। প্রদেশের বাইরে থেকে তিনি খেয়াল-সঙ্গীতকে বহন করে আনেন। মারাঠা গায়ন-সমাজে প্রবাহিত করে দেন সেই অভিনব সঙ্গীতধারা। তাকে সঞ্জীবিত রাখেন অর্ধশতাব্দব্যাপী আপন স্বর সাধন-জীবনে।

আর আচার্যের সেই ভক্ত পরিচয়টি? তা জানতেন শুধু তাঁর শিষ্য আর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী। কারণ বাইরে তার প্রকাশ ছিল না। দেশের এমন কোন অঞ্চল নেই যেখানে গানের আসর করেননি ইচলকরঞ্জীকর। গায়ক-জীবনে বহু ভ্রমণকারী তিনি। কিন্তু তারই মধ্যে ভক্তির উপচার নিবেদন করেছেন। প্রত্যহ তুলসী-রামায়ণ কিছু অংশ পাঠ করে গেছেন।

একটি দিনের জন্যেও বিরত থাকেনি তাঁর রামগুণগান।

গয়াসম্প্রদায়ের আচার্য

হনুমানদাস সিং

এ কি একজনের গানের আসর? না, অর্কেস্ট্রা দলের বাজনা হবে?

গয়ায় যাঁরা নতুন এসেছেন কিংবা হনুমানদাসজীর আসর প্রথম দেখছেন তাঁদের এমনি মনে হয় বটে। কিন্তু গান আরম্ভ হলে তাঁরা বুঝতে পারেন ব্যাপারটা। তবে যাঁরা আগে শুনেছেন তাঁরা এমন দৃশ্যে অভ্যস্ত। গায়কের সঙ্গে বসেছেন এত জন যন্ত্রী।

সেদিনও তেমনি অভিনব আসর দেখা গেল। মাঝখানে রয়েছেন ওস্তাদজী। আর তাঁর আশেপাশে এস্রাজীরা, হারমোনিয়ম-বাদক আর তানপুরা ছাড়বার লোক। তাঁদের সবই সুরের যন্ত্র। সেইসঙ্গে তবলা সঙ্গতকারের কথা তো বলা বাহুল্য।

মূল গায়ককে নিয়ে দশজন কলাকার। তিনজন এস্রাজী। হারমোনিয়ম-বাজিয়েও তিনজন। দুজনের হাতে তানপুরা। এক তবল্‌চী। এই জমজমাট আসব বসেছে উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের বাড়িতে। গয়ার কাছাড়ি রোডে, তাঁর সেই সুপরিচিত Sanctum নামের আবাসে। এমনি নানা দিনের আসরের জন্যে বিখ্যাত। আর গয়ালী বাঙ্গালী বহু মজলিসী সামাজিক মানুষের মিলন-মন্দির।

১৯০৭ সালের একটি সন্ধ্যার কথা।

আগ্রহী শ্রোতার দলে সেদিনও হল ঘরটি ভরে উঠেছে। গায়কের সঙ্গে বাদক দলও প্রস্তুত। এখন এস্রাজ তানপুরায় সুর বাঁধার পর্ব। আসর আরম্ভ হবে এবার।

গুরুজী একটি তানপুরা কোলে উঠিয়ে নিলেন। তিনি যে আসরের প্রধান, তা তাঁর ব্যক্তিত্বেই প্রকাশ।

চারটি তার বেঁধে তিনি সুর দিতে লাগলেন। তখন এস্রাজের সুর বাঁধছেন বলাকিলাল আর চন্দ্রিকাপ্রসাদ। আর ভেলুবাবু অর্থাৎ ডাক্তার যোগেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়। গয়ার তিন সেরা এস্রাজী তাঁরা।

সাত বছর আগে গয়ার স্বনামধন্য এস্রাজ-গুণী কানাইলাল ঢেঁড়ী গত হয়েছেন। কিন্তু ঐ তিন এস্রাজীকে দেখলে গয়াবাসীদের মনে পড়ে যায় ঢেঁড়ীজীর কথা। এই আসরেই কতদিন তিনি বাজিয়ে মাৎ করেছেন। একই সম্প্রদায়ের তো সকলে। হনুমানদাসজীরই শিষ্য। খেয়াল গান আর একই অঙ্গের এস্রাজ বাজনার গয়া ঘরানা।

হারমোনিয়ম নিয়ে বসেছেন শোনী, গুরুজীর তরুণ পুত্র। গয়া কেন্দ্রের এক প্রদীপ্ত প্রতিভা। তিনিও আসলে এস্রাজী ছিলেন। পরে হারমোনিয়ম ধরেছেন নিজের ঝোঁকে। আসরে আসরে একক হারমোনিয়মও বাজান। এখানে সঙ্গত করতে বসেছেন আরও দুজন হারমোমিয়ম বাজিয়ের সঙ্গে।

এতক্ষণে তিনটি এস্রাজ, তিনটি তানপুরা আর তবলার সুর ঠিক ঠিক মিলল। তারপর যন্ত্রগুলির ক্ষণিক স্তব্ধতার মধ্যে ভ্রমর গুঞ্জন করে উঠল ওস্তাদজীর হাতের তানপুরা। দৃষ্টি ঈষৎ নিমীলিত হয়ে তাঁর মুখে চোখে সুরের ধ্যান জাগল। এবার কণ্ঠে সুরের আবাহন। দরবারী কানাড়ার উদ্ভাসন হল মন্দ্র সপ্তকে।

ঢিমা ত্রিতালে তিনি গান আরম্ভ করলেন—রাজন কে শিরতাজ রামচন্দ্র আয়ে···

বুলাকিলাল, চন্দ্রিকাপ্রসাদ আর ভেলুবাবু ঝঙ্কার তুললেন এস্রাজে। শোনীজী আর দুজন হারমোনিয়মে সঙ্গত শুরু করলেন। বিলম্বিত ঠেকা ধরলেন তবলচী।

সুরের ছটি যন্ত্র বাজতে লাগল হনুমানদাসজীর গানের সঙ্গে। আর

তিনটি তানপুরায় মূল স্বর। কিন্তু তাঁর দরাজ স্বর সব সুরযন্ত্রকে ছাপিয়ে উঠল। সে উদাত্ত কণ্ঠের যেমন গভীরতা তেমনি বিস্তার। দরবারীর রূপায়ণে প্রাণমন ঢেলে গেয়ে চলেছেন আচার্য।

মনোরম সুরেলা গলা। চিত্তাকর্ষী গানের বন্দিশ। গায়ন-ভঙ্গিমা চমৎকার। প্রথমে স্থায়ী রূপটি পরিষ্কার সুরে দেখালেন।

তারপর আরম্ভ হল তাঁর সুরের কারুকর্ম রচনা। অতিশয় মুন্সিয়ানায় তান বিস্তার করতে লাগলেন। প্রতিটি তান নাদস্বরের এবং দানা-দার।

তানকারী অতি দ্রুত নয়, কারণ লক্ষ্য আছে সুস্পষ্টতার দিকে। তান যতই জটিল হোক, শ্রুতিমধুর। শিষ্যদের যেমন বলতেন, 'যো কুছ করো মিঠাস্ লে করকে।' সেই মিষ্টত্ব বা মাধুর্যে ভরপুর তাঁর নিজের গান।

শুদ্ধ বাণীতে মূর্তিমন্ত হতে থাকে দরবারী কানাড়া—

রাজন্ কে শিবতাজ রামচন্দ্র আয়ে
অধম উধারণ জন প্রতিপালক
হয় সব হি কে বন্ধু···

তন্নিষ্ঠ হয়ে গাইতে লাগলেন হনুমানদাসজী।

মনোহারী বিস্তারে গান জমাটি করে তুললেন। আর সেই সঙ্গে আসর প্রাণবন্ত হল আরেক অভিনবত্বে।

এতক্ষণ শিষ্যরা এস্রাজে বা হারমোনিয়মে অনুসরণ করছিলেন তাঁকে। এবার তাঁরা গানের পরিপূরক হতে থাকেন। এক-একজন তান বাজান পালা করে।

এখন গুরুজীর কণ্ঠে বিরতি। আর সেই অবকাশে তান বিস্তার করছেন বুলাকিলাল কিংবা চন্দ্রিকাপ্রসাদ। কখনো ভেলুবাবু, কখনো শোনীজী। এস্রাজ কিংবা হারমোনিয়মে একেকজন মূল শিল্পী হন। গুরুজীর অন্য আসরে গায়ক শিষ্য থাকলে তিনিও যোগ দেন এমনিভাবে।

হনুমানদাসজীর আসরের এই এক বৈশিষ্ট্য। শিষ্যদের সমান সুযোগ দেন তিনি। কোন সুরের কাজ করে, টুকরো গেয়ে বা তান বিস্তার করে, নিজে থেমে যান। আর একেক শিষ্য অনুরূপ কোন কাজ দেখান আপন শক্তি অনুযায়ী। নিজের নিজের যন্ত্রে কিংবা কণ্ঠে প্রত্যেকের বিকাশে গুরু এইভাবে সহায়ক হন।

এজন্যে এত সুরযন্ত্র বাজলেও কোন বিশৃঙ্খলা নেই তাঁর আসরে। গুরুর দৃষ্টান্তে প্রত্যেকেই আপন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন। আসরও জীবন্ত হয়ে ওঠে। শ্রোতারা উপভোগ করতে থাকেন এই অভিনবত্ব।

সেদিনও গুরুজীর আসরে সবাই পরিতৃপ্ত হলেন। সবিস্তারে বড় খেয়াল গেয়ে শোনালেন তিনি।

সেসময় বয়স তাঁর ৬৭-৬৮ বছর। কিন্তু যেমন পূর্ণ গায়ন ক্ষমতা তেমনি অটুট কণ্ঠ। গয়া সঙ্গীত সম্প্রদায়ের সর্বমান্য নেতা শুধু নন। উত্তর ভারতের এক সম্মানিত দিকপাল কলাকার। বহুমান্য খেয়ালীয়া।

প্রিয়তম শিষ্য কানাইলাল ঢেঁড়ী যতদিন বর্তমান ছিলেন, গুরুকে নিয়ে গয়া থেকে বেরুতেন। বছরে অন্তত একবার পরিক্রমা করতেন তাঁরা। প্রদেশে প্রদেশে, নানা সঙ্গীত-কেন্দ্রে। আসরে আসরে হনুমানদাসজীর গুণপনায় উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীত-সমাজ মুগ্ধ হতেন। আর তাঁর স্থান হয় গণনীয় আচার্যদের সঙ্গে, একাসনে।

কানাইলালের মৃত্যুর পর গুরুজীর পরিভ্রমণ বন্ধ হয়ে যায়। গয়ার চতুঃসীমার মধ্যেই অতিবাহিত করে যান সঙ্গীতসাধকের জীবন। কিন্তু তাঁর সর্বভারতীয় নিরিখে আচার্যের আসন চিরঅম্লান থাকে। যেমন সত্তরের প্রাক্‌কালীন এই আসরে, তেমনি পরবর্তী প্রায় তিন যুগ যাবৎ।

শতায়ু হনুমানদাস সিং সগৌরবে বিরাজমান ছিলেন সঙ্গীত-জগতের এক স্তম্ভস্বরূপ। আশী বয়স পার করেও আসর মাতানো সুকণ্ঠ শিল্পী থেকেছেন। পরিতৃপ্ত করেছেন সাধারণ থেকে প্রবীণ

গুণীজনকেও। নানা নেতৃস্থানীয় গায়ক বাদক ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ।

সেবার তাঁর গান শুনলেন বিষ্ণুদিগম্বর পালুসকর। স্বনামধন্য সুমিষ্ট কণ্ঠ গায়নাচার্য। রাগসঙ্গীতের অক্লান্তকর্মা প্রচারক। হৃদয়স্পর্শী ভজন গানেরও পরিশীলিত প্রচলনকর্তা তিনি। সঙ্গীত-জগতে মহারাষ্ট্রের মহান দান বিষ্ণুদিগম্বর। তিনিও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানালেন হনুমানদাসকে।

গয়ার গুরুজী তখন অশীতিপর। তাঁর গান শুনে পালুসকরজী বললেন, 'আপ বুঢ়াপেমে এয়েসা গাতেয়েঁ, না জানে জওয়ানীমে কেয়া করতে থেঁ।'

তার কয়েক বছর আগে বিখ্যাত ধ্রুপদী অঘোরনাথ চক্রবর্তী তাঁর গান শুনেছিলেন। চক্রবর্তী মশায় তখন পরিণতবয়সী। বেশির ভাগই থাকতেন কাশীতে। সর্বভারতীয় গুণীদের সঙ্গে সেসময় তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বারাণসীকে কেন্দ্র করে।

হনুমানদাসের কথায় অঘোরনাথ বলেছিলেন, 'ওস্তাদজীর তুল্য খেয়াল-গায়ক সারা ভারতে আঙুলে গোনা যায়।'

আরও কত গুণীর সমাদরে ধন্য ছিল তাঁর গায়ক-জীবন। তেমনি একটি দিনের কথা শেষে বলা যাবে।

কত আদর আহ্বানও তিনি পেতেন বদান্য সঙ্গীত-প্রেমীদের কাছে। তাঁদের দরবারে নিযুক্ত হবার জন্য আমন্ত্রণ আসত।

কোল্হাপুরের রাজা সেবার তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে বললেন, 'ওস্তাদজী আপনি আমার দরবারে থাকুন। তাহলে নিয়মিত আপনার গান শুনতে পাব।'

তিনি সবিনয়ে জানালেন তাঁর অক্ষমতা। বললেন, 'রাজা বাহাদুর, কোথাও চাকুরি নিয়ে থাকতে আমার পক্ষে অসুবিধা আছে। আর আপনার দরবারে তো রয়েছেন ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ।

কোল্হাপুরপতি বললেন, 'খাঁ সাহেবের জন্যে কি হয়েছে? আমার

দরবার এত ক্ষুদ্র নয় যে, সেখানে আরও কলাবৎ থাকতে পারবেন না। আপনিও স্বাগত।'

তখন হনুমানদাস বিনত চিত্তে প্রকাশ করলেন অনিচ্ছার আসল কারণ, 'বিষ্ণুপাদপদ্ম ছেড়ে, পিতা মহেশ্বর ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।'

পিতা মহেশ্বর হলেন গয়ার ধামিটোলার শিব-বিগ্রহ। প্রতিদিন ওস্তাদজী সেই পিতা মহাদেবের মাথায় ভক্তিভরে জল চড়াতেন। সে তাঁর অন্তরের একটি পূজা-বিধি।...

পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তখনকার এক দরাজ গুণী প্রতিপালক। অনুজ রাজা শৌরীন্দ্রমোহনেরই তুল্য তাঁর প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত-সভা। নানা সময়ে ভারতের কত শ্রেষ্ঠ কলাকার তাঁর দরবার অলংকৃত করেছেন।

তখনো কানাইলাল ঢেঁড়ী জীবিত। তিনিই গুরুজীকে এনেছেন কলকাতায়।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন সেবার তাঁর গান শুনে চমৎকৃত হয়েছেন। তাঁরও ইচ্ছা হল সভাগায়করূপে ওস্তাদজীকে রাখেন।

কিন্তু তিনি নারাজ। কারণ ঐ এক, 'গয়া ছেড়ে আমি কোথাও থাকতে চাই না, মহারাজ।'

সঙ্গীত-সাধক হনুমানদাস ব্যক্তি-জীবনেও শুদ্ধচিত্ত ধর্মাচারী নিষ্ঠাবান ভক্ত মানুষ। নির্লোভ, সদা-সন্তুষ্ট, আড়ম্বরবিমুখ। বহু উপার্জনের সুযোগ সত্ত্বেও অর্থের লালসাশূন্য। গান শুনিয়েছেন ভারতের নানা সেরা আসরে দরবারে। কিন্তু কোথাও মুজরো করেন-নি। স্বেচ্ছায় অপেশাদার, বিগত যুগের নানা হিন্দু গুণীদের আদর্শে। অর্থমূল্যে সঙ্গীত তাঁরও কল্পনার অতীত। বিবেকবিরুদ্ধ কাজ।

এত বিখ্যাত হয়েও যেমন নিরভিমান, তেমনি সরল সাধাসিধা তাঁর জীবনযাত্রার মান। কারণ বহির্জীবন নিতান্তই বাহ্য। প্রকৃত

জীবন তো সঙ্গীতকে অবলম্বন করে। তাই বৃথা অভাববোধে তাড়িত হন না কখনো। ঢেঁড়ীজী তো সংসারের সব প্রয়োজন পূরণ করে দেন। আর কিসের ভাবনা? কেন বেশি টাকার আশায় অন্যত্র থাকতে যাবেন বিষ্ণুতীর্থ ছেড়ে?

টাকা রোজগারের জন্যে তো গান শিখিনি। কখনো গান গেয়েও টাকা নেব না। গান বাজনা শেখাবও বিনামূল্যে। বেচাকেনার হাট নয়—এত সাধের এত সাধনার সঙ্গীত। গয়াতেই এমনি গান-বাজনা নিয়ে বসবাস করে যাব। দর্শন করব বিষ্ণুপদ। পিতা মহেশ্বরের মাথায় জল চড়াব। এই আমার সর্বতীর্থসার। আসর করব সব জায়গায়। কিন্তু গয়ারই বাসিন্দা থাকব। এই ছিল হনুমানদাসজীর প্রাণের ইচ্ছা।...

সে তাঁর জীবনে কত বছর আগেকার কথা।

বৃদ্ধ পিতা হরিসিং। তাঁর সঙ্গে সপরিবারে সেবার গয়া তীর্থে এসেছেন। হনুমানদাসের বয়স তখন ত্রিশ বছর। এখানে তাঁদের পাণ্ডা হয়েছেন রামহরি ঢেঁড়ী।

সেকালীন গয়াধামের এক প্রভাবশালী, ধনী পূজারী রামহরি। উত্তর ভারতের নানা অঞ্চল থেকে তাঁর অবস্থাপন্ন যজমানেরা এই বিষ্ণুতীর্থে আসেন। তীর্থের করণীয় সম্পন্ন করেন পাণ্ডা মহাশয়ের আতিথ্যে। তাঁদের প্রণামী দক্ষিণা দিতে রামহরির বিলক্ষণ আয়ের বৃত্তি।

ঢেঁড়ীজীর বিষয়-সম্পত্তি যথেষ্ট। আরেক দিকে তিনি শৌখীন রুচির মানুষ। মজলিসী এবং গান-বাজনা বড় ভালবাসেন। তাঁর বালক পুত্র কানাইলালের যেমন গানে ঝোঁক, তেমনি গায়ক হবার ইচ্ছা। রামহরিরও খুব শখ এবিষয়ে। কিন্তু তখন তেমন পছন্দমতন ওস্তাদ নেই গয়ায়।

এমন সময় গোয়ালিয়র থেকে হরি সিং তীর্থে এলেন। সপরি-বারে ঢেঁড়ীজীর অতিথি হলেন যজমান হিসেবে। কিন্তু কদিনের

আলাপ-পরিচয় সান্নিধ্যে দুই হরির মধ্যে বন্ধুত্বের সূচনা হল। গড়ে উঠল সহৃদয় প্রীতির সম্পর্ক।

কথাপ্রসঙ্গে নবাগতের নানা সংবাদও পাণ্ডাজী জেনে নেন।

তীর্থ সম্পূর্ণ হলে যজমানের সুফল প্রার্থনার রীতি। আর প্রার্থনার উত্তরে পূজারী মহাশয়ের কথাও মাননীয়।

যথাবিধি হরি সিং সুফল চাইলেন।

তখন রামহরি বললেন, 'আপনি গয়া থেকে আর বিদায় নেবেন না। সপরিবারে তীর্থবাস করুন। আপনাকে বসতবাড়ি দিচ্ছি। আপনার অন্য সব দায়িত্বও আমাদের। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন। আপনাদের সঙ্গীতচর্চারও কোন অসুবিধা হবেনা।'

অভিনব, আকাঙ্ক্ষণীয় প্রস্তাব। সুখের, সৌভাগ্যের সূচক। কোন কারণই নেই প্রত্যাখ্যান করবার।

সব দিক চিন্তা করে সম্মত হলেন হরি সিং। সেই থেকে তিনি সপরিবারে গয়াধামের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন।

বিষ্ণুমন্দির-সংলগ্ন এলাকাটি হল অন্দর গয়া। তার ওপরের অঞ্চলটির নাম উপরডিহি। ঢেঁড়ীজির সমবৃত্তি যাঁদের, তাঁরা অনেকেই এখানকার অধিবাসী। রামহরির প্রদত্ত বাড়িতে হরিসিংও উপরডিহিতে বাস করতে লাগলেন। পুত্র হনুমানদাসের সঙ্গে, সপরিবারে। আর তাঁরা ফিরে যাননি গোয়ালিয়রে।...

তাঁদের পূর্ববৃত্তান্ত এখানে বলে নেওয়া যায়।

বুন্দেলা রাজপুত হরিসিং। আসলে তিনি বুন্দেলখণ্ডের অধিবাসী। তাঁর পেশা ছিল 'কোম্পানী'র অর্থাৎ ইংরেজ সরকারের সেনাবিভাগে। কিন্তু নেশায় তিনি গায়নশিল্পী। গোয়ালিয়রের গুণী নারায়ণদাস বাবাজী তাঁর সঙ্গীতগুরু। নারায়ণদাসের কাছে রীতিমত শিক্ষায় হরি সিং গায়ক হয়েছিলেন।

গোয়ালিয়র-নিবাসী এবং খেয়ালের কলাকার হলেও গোয়ালিয়র

ঘরানার অন্তর্গত নন নারায়ণদাস। হদ্দু হস্সু খাঁদের ধারার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না।

হরি সিং ভিন্ন নারায়ণদাসের আরেক শিষ্য ছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি হলেন কৃতী গায়ক কণ্ঠেরাম।

১৮৫৭র মহাবিদ্রোহ যখন বুন্দেলখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে হরি সিং তখনো ফৌজের সিপাহী। আর হনুমানদাসের বয়স ১৭-১৮ বছর।

সেই রাজনৈতিক, সামরিক ঘনঘটার মধ্যে হরি সিং ফৌজী কাজ ছেড়ে দিলেন। বুন্দেলখণ্ডও ত্যাগ করে আশ্রয় নিলেন গোয়ালিয়রে। পরিবার-পরিজন নিয়ে এখানে বাস পত্তন করলেন। তাঁর সঙ্গীত-চর্চাও বজায় রইল গুরুর স্থানে।

গোয়ালিয়রে হনুমানদাসেরও সঙ্গীতশিক্ষার সুব্যবস্থা হল। পিতার গুরুভাই কণ্ঠেরামজীর শিষ্য হলেন তিনি।

হনুমানদাসের স্বভাবদত্ত সুকণ্ঠ। আর যেমন মেধা, তেমনি শিক্ষায় একান্ত আগ্রহ। অক্লান্ত পরিশ্রমীও। আদর্শ গুরুও পেয়েছিলেন। তাই সাধন করতে লাগলেন ব্রতের নিষ্ঠায়। গানকেই তিনি জীবনের বরণীয় করেছিলেন।

কণ্ঠেরামজী শিষ্যের কণ্ঠসাধনার স্থান নির্দেশ করলেন অন্যত্র। বাড়ি থেকে অনেক দূরে। লোকালয়েরও বাইরে। এক নির্জন মন্দিরে। সারা দিনের অধিকাংশ সময় সেখানে হনুমানদাসের রিয়াজ হত গুরুর বিধি-নিয়মে। স্থানটি এমনই নিরিবিলি যে বন্য জন্তুর আক্রমণের ভয় ছিল। কিন্তু শিষ্যের সাধনার যোগ্য জায়গা বলেই ভগ্ন মন্দিরটি নির্বাচন করেছিলেন কণ্ঠেরামজী। হনুমানদাসের এইভাবে প্রায় বারো বছর অনন্যতন্ত্র হয়ে কাটল সঙ্গীতের সাধনায়।

কণ্ঠেরামজীর প্রসঙ্গে তাঁর আরেক শিষ্যের নাম করা যায় এখানে। তিনি কানপুরের কানাহাইয়ালাল সান্তারা।

ওদিকে এক যুগের সাধনায় হনুমানদাস কৃতবিদ্য গায়ক হয়েছেন। এমন সময় হরিসিং তীর্থযাত্রা করলেন সপরিবারে।

তারপর ঘটনাচক্রে গয়ায় স্থায়ী হলেন।

রামহরি ঢেঁড়ী যে উদ্দেশ্যে এই পুনর্বাসন ঘটালেন, তাও সিদ্ধ হল। হরি সিং সঙ্গীতা-শিক্ষা দিতে লাগলেন কানাইলালকে। প্রণালীবদ্ধ তালিমের ব্যবস্থা হল।

ঢেঁড়ীজীর সঙ্গে হরি সিংয়ের যে সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল, তার ফলে তিনি সুখে শান্তিতে রইলেন। নিজেকে আর বহিরাগত মনে হল না এখানে। রামহরির প্রতিপত্তির কারণে সিং পরিবার গয়ালী সমাজেও অন্তরঙ্গ হলেন বিশেষ সঙ্গীতগুণে।

উপরডিহিতে দুখানি বাড়ি শুধু দেননি ঢেঁড়ীজী। হরি সিংয়ের সাংসারিক সব প্রয়োজনও তিনি মিটিয়ে দেন।

কানাইলালের গান শেখা চলতে লাগল এমনি স্বচ্ছ পরিবেশে।

কিছুদিন পরে হরি সিং শিক্ষকতা থেকে অবসর নিলেন, বার্ধক্যের জন্যে। এবার কানাইলালের শিক্ষার ভার হনুমানদাস পেলেন। তিনি তখন পূর্ণ যুবক এবং গায়ক হিসাবেও সুপরিণত।

প্রতিভাবান কানাইলালকে তিনি সযত্নে তৈরি করতে লাগলেন। তখন থেকেই স্বয়ং সুকণ্ঠ গায়ন-শিল্পীর সম্মানও পেলেন, গয়ালী সঙ্গীতপ্রিয় সমাজে। তাঁর সমমানের গায়ক গয়ায় ছিলেন না, বলা বাহুল্য। হনুমানদাস শহরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক হয়ে রইলেন।

মিষ্টত্বের সঙ্গে গানের যে উপদেশ দিতেন, স্বয়ং তার উদাহরণ হলেন হনুমানদাস। আর তাঁর আদর্শ শিষ্য কানাইলাল। ধনীর সন্তান হলেও গান-শিক্ষায় তিনি অকাতর অধ্যবসায়ী। আর ঐকান্তিক তাঁর নিষ্ঠা। উদার স্নেহ-প্রবণ আচার্যের কাছে শিক্ষার উপযুক্ত আধার।

গুণে, স্বভাবে কানাইলাল তাঁর মন অধিকার করে নিয়েছেন। শিষ্যকে তাঁর আদরের ডাকনাম হয়েছে 'বাবুয়া'।

তেমনি গুরুভক্তিও বাবুয়ার। গান শেখার সঙ্গে গুরুর সেবাতেও

সমান তৎপর। গুরুজীকে কোন অভাবের কথা মুখ ফুটে জানাতে হয় না। কানাইলালের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে সবদিকে।

গয়ালী সমাজে রামহরি ঢেঁড়ীর যে প্রভাব-প্রতিপত্তি, শিষ্য গুরুর জন্যে তার সদ্ব্যবহার করলেন। তা আরও সার্থক হল হনুমানদাসজীর নিজস্ব কৃতিত্বে। ক্রমে বৃহত্তর সঙ্গীত-জগতে তিনি গয়া কেন্দ্রের প্রতিভূ হয়ে উঠলেন।

গায়ক কানাইলালও প্রতিষ্ঠা পেতে লাগলেন তরুণ বয়সেই। কিন্তু এক অভাবিত সঙ্কট ঘনিয়ে এল তাঁর উদীয়মান সঙ্গীত-জীবনে।

একদিন গানের পর কানাইলালের গলা থেকে রক্তপাত হল। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

বিষম ভয় পেলেন বাড়ির সবাই। ওস্তাদজীও।

ঢেঁড়ীজী যথাসম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

বিশেষ পরীক্ষার পর চিকিৎসক জানালেন, 'কোন কোন কণ্ঠতন্ত্রী একেবারেই জখম হয়ে গেছে।'

তারপর সিদ্ধান্ত করলেন, 'গান করা আর চলবে না।'

রোগ-নির্ণয়ের চেয়ে নির্দেশ বেশি মর্মান্তিক হল কানাইলালের পক্ষে। গান বন্ধ করা যে কল্পনার অতীত। বিনা সঙ্গীতে জীবনই বৃথা। সাময়িক বিরতির পর আবার আরম্ভ করা যায় না গান?

'না।'

চিকিৎসকের সুচিন্তিত অভিমত—গান একেবারেই বন্ধ করতে হবে।

কানাইলালের সঙ্গীতকণ্ঠ নীরব হল। কিন্তু তিনি মেনে নিতে পারলেন না সঙ্গীত-বর্জিত হওয়ার দুর্ভাগ্যকে। আশার আলো দেখলেন—কোন যন্ত্র তো অবলম্বন করা যায়?

হনুমানদাসজীও অভয় দিলেন, 'ভাবনা কিসের? তারের যন্ত্র ধরো, এমনি কলাকারই হবে।'

শিষ্য সমস্যায় পড়লেন, 'কিন্তু কোন্ যন্ত্র বাজাব?'

কেন, যন্ত্রের অভাব ? বীণা আছে। সেতার, শরদ···

কানাইলাল তখন সঙ্কটের কারণ জানালেন, 'ওসব কোন যন্ত্র শিখতে হলে তো অন্য ওস্তাদের কাছে যেতে হবে। কিন্তু আমি আপনার যে শিষ্য হয়েছি তা বরাবরের জন্যে। অন্য কাউকে গুরু হিসেবে আমি মানতে পারব না। আর কারুর তালিমও জীবনে নেব না।

গুরু তখন বোঝালেন, আমি তো কোন যন্ত্র কখনো বাজাইনি। তাই অন্য ওস্তাদ ছাড়া তোমার উপায় কি ? কোন ঘরানদারের তালিম ছাড়া বীণা কি সেতার কি শরদ শেখা যাবে না। আর কোন ঘরানা শিক্ষা না পেলে তোমায় যন্ত্রী হিসাবে কেউ মানবে না। স্বীকৃতি দেবে না।'

শিষ্য কিন্তু নাছোড়বন্দ্, 'না। আপনার কাছেই যন্ত্রও শিখব। তাহলে এমন কোন যন্ত্র বলুন যার কোন ঘরনা নেই। আপনার কাছে শিখতে পারব নতুন ধারায়।'

হনুমানদাসজী তখন সন্ধান নিয়ে বললেন, 'যতদূর জানি, এস্রাজে কোন ঘরানা বা পুরনো ধারা নেই।'

'তাহলে আপনিই আমায় এস্রাজ শেখান।'

'কিন্তু আমি তো কখনো এস্রাজ বাজাইনি।'

শিষ্যের অগাধ বিশ্বাস, 'তাতে কি ? আপনি ইচ্ছে করলেই হবে।'

তা-ই হল। অবশ্য শুধু ইচ্ছায় নয়। গুরুজীরও এ একপ্রকার নতুন সাধনা। এস্রাজ যন্ত্রকে নিয়ে নতুন পরিকল্পনাও করলেন ধ্যান জ্ঞান দিয়ে। বীণার মতন অচল ঠাটের নতুন এস্রাজ তৈরী করলেন। অর্থাৎ ২২ পর্দাযুক্ত। কোন রাগ বাজাবার জন্যেই যেন ঠাট সরাতে না হয়। অসুবিধা না ঘটে তানকারীতে। যন্ত্রের আকারও বড় হল। মোটা তার চড়ালেন আলাপচারীর জন্যে। গমকাদির সৌকর্যে নানা মাপের অনেকগুলি যন্ত্র প্রস্তুত হল। গুরুজীর নির্দেশে, কানাই-লালের সাগ্রহ সহযোগিতায়। বড় আকারের যন্ত্র আলাপের জন্যে।

তারপর গৎকারীর আর তান বিস্তারের জন্যে মাঝারী মাপের এস্রাজ। আবার ঝালার কাজের জন্যে আরও ছোট যন্ত্র।

হনুমানদাসজীর শিষ্যের সঙ্গে এ যেন এক নতুন গবেষণা। এস্রাজ চর্চা করতে অভিনব যন্ত্রসঙ্গীতের প্রবর্তনা। তার কোন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আর ছিল না সে যুগে।

এসব তো যন্ত্রের বহিরঙ্গ ব্যাপার। যে রীতিতে খেয়াল গান আর রাগ-রূপায়নের সাধনা গুরুজী এতদিন করেছিলেন তা-ই তাঁর এস্রাজ বাজনারও অন্তর-অঙ্গ হল।

এই অনন্য পদ্ধতিতে তিনি কানাইলালকে গঠিত করতে লাগলেন যন্ত্রে। সম্পূর্ণ খেয়ালের চালে এস্রাজ বাদন। এজন্যে জমাটি গানের বন্দিশ থেকে গৎ তৈরি করলেন। তান বিস্তারও খেয়াল অঙ্গে। বাদনশৈলী ঠিক হল এমনিভাবে। আগে নিজের হাত তৈরি করে শিষ্যকে শেখাতে লাগলেন।

কানাইলালও নতুন উদ্যমে চর্চা শুরু করলেন নতুন যন্ত্রে। গানে তো রীতিমত তৈরি ছিলেন। সে প্রতিভা এখন প্রকাশ পেতে লাগল এস্রাজে। ক্রমে গয়ায় প্রকাশ্য আসরেও যন্ত্রীরূপে অভিনন্দন পেলেন। অভিনব যন্ত্রসঙ্গীতের শিল্পী।

বড় মাঝারি ছোট, নানা আকারের এস্রাজ সাজানো থাকে তাঁর আসরে। সব এক সুরে বাঁধা। আর একগুচ্ছ ছড়। আলাপচারী, গৎ তান তোড়া কিংবা ঝালার কাজের জন্যে আলাদা আলাদা যন্ত্র বাজে। এক এক রকমের ছড় তার সঙ্গে।

গুরুজী এস্রাজ ধরেন কেবল শেখাবার সময়। কিংবা ঘরোয়া-ভাবে। কখনো প্রকাশ্য আসরে যন্ত্র বাজান না।

কিন্তু তাঁর শিক্ষায় যখন কানাইলাল এস্রাজী তৈরী হলেন, তারপর আরও শিষ্য এলেন এ যন্ত্র শিখতে। গুরুজীর শিক্ষায়, কানাইলালের পর, তাঁদের সেরা হলেন চন্দ্রিকাপ্রসাদ দুবে। আর দুই এস্রাজী শিষ্য বুলাকিলাল ও ভেলুবাবুও (প্রথমে কানাইলালের ও পরে

গুরুজীর কাছে শেখেন) কৃতী এস্রাজী-বাদক। গয়ার পঞ্চুবাবুও এস্রাজে ওস্তাদজীর আরেক শিষ্য। তাঁরা সকলেই গয়া-নিবাসী।

সেই সঙ্গে, কলকাতার এস্রাজবাদক শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও হনুমানদাসজীর এক শিষ্য। তাছাড়া, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীও তাঁর কাছে কিছু কিছু শেখেন।

এমনিভাবে এস্রাজেও একটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে গয়ার আচার্যের, তাঁর নিজস্ব ধারায় এস্রাজ বাজনা। প্রিয় শিষ্য কানাইলালকে শেখাবার জন্যে ঘটনাচক্রে যার পত্তন হয়েছিল, আর যে চালের খেয়ালাঙ্গে এস্রাজ শোনা যায়নি অন্য কোথাও।

গুরুকে নিয়ে কানাইলাল নানা কেন্দ্রেই আসর করতে যান। গুরুজীর গান আর তাঁর এস্রাজ বাজনা।

কলকাতাতেও কানাইলাল আসেন প্রতি বছর। শিমলা অঞ্চলে নিজেদের বাড়িতে বেশ কিছু দিন করে থাকেন। গুরুজীকে সঙ্গে আনেন কোন বারে। আর তাঁদের গান-বাজনা হয় কলকাতার নানা আসরে।

তা হ'ল উনিশ শতকের শেষ দশকের কথা। কলকাতায় তখন এস্রাজী বলতে কানাইলাল। এস্রাজ শেখাতেও তিনি। কারণ হনুমানদাসজী কানাইলালের মতন কলকাতায় বেশি দিন থাকতেন না। তাই এখানে যাঁরা এস্রাজ চর্চা করেন, প্রায় সবই কানাইলালের কাছে। যেমন হাবু দত্ত (বিবেকানন্দের জ্ঞাতি ভাই, পরে উজীর খাঁ বীণকারের শিষ্য) কিংবা কালিদাস পাল (পরে করামতুল্লা খাঁ শরদীর শিষ্য)। কিংবা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অবনীন্দ্র, অরুণেন্দ্র আর সুরেন্দ্রনাথ।

কলকাতায় কানাইলালের শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ হনুমান-দাসজীর কাছেও আসতেন শিক্ষার্থী হয়ে। যেমন অমৃতলাল বা হাবু দত্ত। তাছাড়া এখানে শীতলচন্দ্র বা ব্রজেন্দ্রকিশোর তাঁর শিষ্য। সঙ্গীতজ্ঞ নাটোর মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়ও তাঁকে গুরুতুল্য মান্য করতেন।

তবে তাঁর মণ্ডলী গয়াতেই ধর্তব্য। তাঁর নিজেরও সুদীর্ঘকাল *সঙ্গীত সাধনের পীঠ। উনিশ শতাব্দীর শেষ সন পর্যন্ত সেখানে কি সানন্দ ছিল তাঁর সঙ্গীতজীবন আর সম্প্রদায়।*

আর বিশ শতকের প্রথম বছরেই সেই প্রিয় ক্ষেত্রে কি শোক তাঁকে ভোগ করতে হল। শ্রেষ্ঠ শিষ্য সেবক, পরম আদরের, হাতে-গড়া 'বাবুয়া'কে হারালেন আচার্য। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে কানাইলাল ঢেঁড়ীর মৃত্যু ঘটল (১৯০১)।

তখন ষাট উত্তীর্ণ হয়েছেন আচার্য। কিন্তু স্বাস্থ্য অটুট। মিতাচারী সংযতচরিত্র। স্নেহপ্রবণ হলেও মনোবল অসামান্য। তাই এই দুঃখকেও ধীরভাবে বহন করলেন আপন অন্তরে। রামচন্দ্রের পরম ভক্ত। প্রত্যহ তুলসী রামায়ণ থেকে কিছু অংশ পাঠ না করলে তাঁর দিনচর্যা অসম্পূর্ণ থাকে। শোকের অনুভবও যেন নিবেদন করেছিলেন শ্রীরামের চরণে।

তার বাহ্য প্রকাশ এই মাত্র দেখা গেল যে, বাইরেকার আসর একরকম বন্ধ করলেন। গান শোনাতেন কেবল গয়ার আসরেই। বিশেষ, উপরডিহির রাজাজীর বাড়ি আর বুলাকিলালের বৈঠকখানায়। কিংবা কাছারি রোডে, উপেন্দ্রচন্দ্রের sanctum-এ। কিন্তু সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁর যে সম্মানের আসন, তা রইল পূর্ববৎ। ভারতের নানা গুণীকে গয়ায় তাঁর গান শুনতে দেখা গেছে। আর বহিরাগত কোন কলাকারের গান-বাজনায় তিনিই হতেন আসর-পতি।

এখানে আচার্যের দায়িত্বও পালন করেছেন যখন বয়স হয়েছে ৯৫-৯৬ বছর। ধীরেন্দ্রচন্দ্রই তো এসময়ও তাঁর কাছে শিখেছেন। সেই বয়সেও গুরুজী সক্ষম শিক্ষক, স্মৃতিধর—আসরে গান গাওয়ায় বিরত হলেও তখনো তিনি রাগের জীবন্ত মহাকোষ। যেমন বিপুল তাঁর ভাণ্ডার, তেমনি গভীর রাগবিদ্যা। যে কোন রাগের জিজ্ঞাসুকে তিনি তা শুনিয়ে দেন। বর্ণনা করেন রূপ ও তত্ত্ব। বহু ধ্রুপদও জানা ছিল তাঁর, যদিও আসরে কখনো ধ্রুপদ শোনাননি।

সেই সঙ্গীতগুরুর দায়িত্ব থেকে অবসর নেননি, মৃত্যুর দু-এক বছর আগেও। আর কি স্মরণীয় আয়ুষ্কাল! ১৯৩৯ সালে যখন মহাপ্রয়াণ করলেন গয়া কেন্দ্রকে শূন্য করে, তখন শতবর্ষ পূর্তি হয়েছিল।

দীর্ঘায়ু লাভের চূড়ান্ত মাশুলও দিয়েছিলেন ব্যক্তিজীবনে। কানাইলাল বিয়োগের ত্রিশ বছর পরে। তার চেয়েও মর্মান্তিক শোক এবার পেলেন। একমাত্র পুত্র, প্রতিভাধর শোনীজীর মৃত্যু হল ১৯৩১ সালে। হনুমানদাসজীর বয়স তখন ৯১ বছর।

সে আঘাতও সহ্য করেছিলেন অবশ্য। সঙ্গীতচর্চা স্তব্ধ হয়নি। শিক্ষাদানেও বিরত থাকেননি আরো কয়েক বছর যাবৎ। সঙ্গীতাচার্য-কুলে এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত তাঁর জীবন।

তাঁর আরো একটি প্রসঙ্গ বলা হয়নি।

হনুমানদাসজীর এই গোয়ালিয়রের ধারায়—যা নারায়ণদাস, কণ্ঠেরামজীর অনুসারী—অনেক সময় আসরে প্রথম গাওয়া হত ইমন কল্যাণ। তিনিও যতদিন আসরে গেয়েছেন, ইমন কল্যাণে আরম্ভ করতে বেশির ভাগ শোনা গেছে। এই রাগ যেন তাঁদের আবাহন সঙ্গীত। তাছাড়া হনুমানদাসজীর প্রিয় ছিল কানাড়ার ঘর। বিশেষ দরবারী আর সুহা কানাড়া। তেমনি মেঘ, জয়জয়ন্তী, গৌড়সারঙ্গ এসবও গাইতে ভালবাসতেন।

সেবার তাঁর মেঘ রাগ শোনবার জন্যেই গয়ায় এসেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। বৃহত্তর বাংলার সুনাম-প্রসিদ্ধ গায়ক সুরেন্দ্রনাথ।

শৌখীন হলেও খেয়াল, টপ্‌খেয়ালের গুণী কলাকার তিনি। একাধিক ওস্তাদের কাছে রীতিমত শিখেছেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কাজের অবকাশে সঞ্জীবিত রেখেছেন গায়ন সত্তাটিকে। সুরকার কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে তাঁর কুটুম্বিতাতেও সঙ্গীতের প্রসঙ্গ আছে। দ্বিজেন্দ্র-অগ্রজ হরেন্দ্রলাল (রবীন্দ্রলাল ও হেমেন্দ্র-লাল গায়ক ভাইদের জনক) হলেন সুরেন্দ্রনাথের ভগ্নিপতি। এখানে

কথা এই যে, সঙ্গীতবিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল লাভবান হন সুরেন্দ্রনাথের সাহচর্যে।

দ্বিজেন্দ্র-পুত্র দিলীপকুমার প্রথম জীবনে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-শিষ্য ছিলেন, একথাও উল্লেখ্য। পরিণত বয়সে দিলীপকুমার রায় উচ্ছ্বসিত ভাষায় সুরেন্দ্রনাথের গীতপ্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন 'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের আরেক পরিচয়, তাঁর তৃতীয় অনুজ রাজেন্দ্রনাথ বা রাজু। সুকণ্ঠ গায়ক, সুমিষ্ট বাঁশী ও বেহালা-বাদক। কিন্তু বিচিত্র-চরিত্র এবং যৌবনেই নিরুদ্দেশের যাত্রী রাজু যে শরৎচন্দ্রের অমর সৃষ্টি ইন্দ্রনাথের বাস্তব বিগ্রহ, একথা বাংলা সাহিত্য পাঠকদের অজানা নয়।

সেই সুরেন্দ্রনাথ সেবার গয়ার এলেন গুরুজীর গান শোনবার জন্যে। সরকারী কাজে নানা জায়গায় থেকেছেন বলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় এ যাবৎ হয়নি। এবার সে অভাব পূরণ করে নিতে এসেছেন।

হনুমানদাসজীর বয়স তখন প্রায় ৮৫ বছর। প্রায়ই আসেন উপেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে। তাঁর মেয়ে আর ভাইপো ধীরেন্দ্রচন্দ্রকে গান শেখান। আর সঙ্গীত-জীবনে দক্ষিণা যেমন কখনো কোথাও নেননি, তেমনি এখানেও। তাছাড়া, এ বাড়িব সঙ্গে তাঁর বড় আন্তরিক সম্পর্ক। সেবা-যত্ন যা পান তাইতেই সন্তুষ্ট। অনুরোধে এক্কা ভাড়াটি নিতে হয়। আর সেবন করেন উৎকৃষ্ট অম্বুরী তামাক আর দুধের চা।

সেদিন সুরেন্দ্রনাথ এখানেই এসে নিজের পরিচয় দিলেন আর তাঁর গান শুনতে চাইলেন।

গুরুজী বললেন, 'আমার এ বয়সে গান আর কি শুনবেন? আসরে গাওয়াও একরকম ছেড়ে দিয়েছি। কানাইলাল মারা যাবার পর থেকে গান গেয়ে আর আনন্দ পাই'না।'

সুরেন্দ্রনাথ সবিনয়ে জানালেন, 'ওস্তাদজী আমি অনেক আশা

অনুগ্রহ করে মেঘের একটি গান শোনান, তাহলে কৃতার্থ হব।'

তিনি আর আপত্তি করলেন না। আসরের সব সরঞ্জামই ছিল হলঘরে। তবলচীকে কেবল খবর দিয়ে আনানো হল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শ্রোতারা আসছেন গুরুজীর গান হবে শুনে। গান আরম্ভ হতে আসরও ক্রমে ভরে উঠল।

সুরেন্দ্রনাথের ফরমায়েস মতন তিনি মেঘ রাগই শোনালেন। পরিপাটিভাবে গাইলেন স্থায়ী আর অন্তরা। রীতিমত তান বাঢ়ত করলেন। বিস্তারের কাজ দেখালেন মেঘের গভীর চিত্তস্পর্শী রূপে। কণ্ঠ এখনো সুরেলা। নিটোল আওয়াজ। তারা গ্রামেও অভগ্ন স্বর। কমনীয়, মোলায়েম মিড়।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে মজুমদার মশায় শুনছিলেন। ওস্তাদজীর এই বয়সেও এমন গান তাঁর পক্ষে আশাতীত! আসর শেষে তিনি জানালেন অন্তরের শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা।

ততক্ষণে অন্য শ্রোতারা এই বিশিষ্ট অতিথির পরিচয় জানতে পেরেছেন।

সুতরাং সুরেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করা হল আসরের পক্ষে, 'এবার আপনি গান শোনান।'

কিন্তু তিনি রাজী হলেন না।

হনুমানদাসজীর প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'ওঁর গানের পরে এখানে আমার গাওয়া উচিত নয়। ওঁর সামনে আমি কি গাইব?'

শ্রোতাদের সঙ্গে গুরুজীও অনুরোধ করলেন। কিন্তু সম্মত করা গেল না তাঁকে।

শেষে, সকলের আরেকটি প্রস্তাবে মজুমদার মশায়কে রাজি হতে হল। সে রাতেই গান শোনালেন, তবে এখানে নয়। অন্য একটি আসরে।

তাঁর গান শুনে সবাই আবার আশ্চর্য হলেন। বললেন, 'আপনি এত সুন্দর গান, অথচ ওখানে গাইলেন না?'

সুরেন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'উনি যেভাবে আসর মাৎ করলেন, আর কি তারপর গাওয়া চলে?'

আগ্রার অগ্রণী—খেয়ালে

গোলাম আব্বাস

'গাওয়াইয়া যদি ভাল না খায় তো গাইবে কি ?'

বলতেন গোলাম আব্বাস। আগ্রা ঘরানাদার, দিকপাল খেয়ালীয়া। ফৈয়াজ খাঁর মাতামহ। তাঁরই তালিমে ছেলেবেলা থেকে হাতে-গড়া ফৈয়াজ। নিজের কাছে রেখে পিতৃহারা নাতিকে তিনি তৈযারি করেছেন।

ভাল খাওয়ার অর্থ মুখরোচক আহার নয়। রীতিমত পুষ্টিকর খাদ্যই বুঝতেন গুলাম আব্বাস। আর যত দামী হোক তার সদ্-ব্যবহার করতেন।

এমন স্বাস্থ্য-সচেতন মানুষ দেখা যায় না সচরাচর। বিশেষ কলাবন্ত সমাজে। শুধু ভোজনের দিকেই যে তাঁর লক্ষ্য থাকত, তাও নয়। দেহের সুস্থতার বিষয়ে সামগ্রিক দৃষ্টি ছিল, বলা যায়। নীরোগ থাকতে হবে গান গাইবার জন্যে।

তাই তিনি শরীর-চর্চা করতেন সঙ্গীত-চর্চায় পূর্ণ শক্তি দিতে। অটুট স্বাস্থ্য না থাকলে অক্লান্ত সাধন কি করে সম্ভব? গোলাম আব্বাসের আহার-বিহারে একান্ত নিয়ম-নিষ্ঠা।

তাঁর সারাদিনের খাদ্যতালিকা দেবার দরকার নেই। কেবল সকাল আর শেষবারের কথা বলা চলে এখানে। দুটিই পানীয়।

প্রথম প্রাতরাশ হল, বাদামের শরবৎ। একুশটি বাদামের সঙ্গে পাঁচটি গোলমরিচ পেশাই করা। সেই সঙ্গে মিছরির জলের অনুপান। আর রাত্রে শয্যা নেবার আগে আধ সের খাঁটি দুধ।

সব কটি আহারের সময়ও নির্ধারিত। রিয়াজ কিংবা আসরের

ক্ষতি না করে তিনি তা মেনে চলেন যথাসম্ভব। তা ছাড়া, নিয়মিত ব্যায়াম আছে। প্রত্যহ ডন বৈঠক দেন প্রত্যুষে। তারপর বাদামের শরবৎ পান করে তানপুরা নিয়ে বসা। আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কণ্ঠ-সাধনা। বছরের পর বছর একনিষ্ঠ অধ্যবসায়।

তিনি নিজেই বলতেন, 'ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন করে কেবল রিয়াজ করেছি।'

সেই প্রথম জীবন থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে নজর। আর তা বজায় থাকে শেষ পর্যন্ত। শুধু আহারে নয়, শারীরিক সব বিষয়ে তাঁর যথাবিধি অভ্যাস দেখা গেছে।

গোলাম আব্বাসের ভ্রমণ ধীর পায়ে। কখনো দ্রুত হাঁটা নয়। কারণ জোর যেন না পড়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে। দমের পক্ষে তাহলে খারাপ। শ্বাসের শক্তি যে গায়কের এক প্রধান মূলধন, একথা ভোলেন না তিনি।

সেদিকে তাঁর কম লাভ হয়নি। দস্তুরমত দম্‌দার গোলাম আব্বাস। গানের আসরেও দেখিয়ে দেন সে এলেম। কি দীর্ঘ তাঁর শ্বাস। ওই পাল্লাদার গলায় বড় বড় তান কেমন ঘুরিয়ে আনেন এক দমে। স-দাপট কি দৃপ্ত ভঙ্গিমায় গানের চাল। তানের ব্যবহার। বোল বাঁট, বোল তানের দুর্গম গতিচ্ছন্দ। লয়কারী বা ছন্দ-কর্মের কতবৈচিত্র্য আগ্রা ঘরানা খেয়ালের। সেইসব বৈশিষ্ট্য শ্বাসের ক্ষমতাতেই তিনি ফুটিয়ে তোলেন। আর বলতে গেলে, তাঁর সময় থেকেই আগ্রা পরিবারের খেয়াল গানে এই চালের ধারা পত্তন আর ভারতব্যাপী প্রসিদ্ধি।

গোলাম আব্বাসের সুকণ্ঠে আগ্রা ঘরানার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাঁর কারুকার্যময় সুরিলি আওয়াজের ছিল এক নিজস্ব আবেদন। তানকারীর পর যখন সুরের ওপর স্থির হতেন, মুগ্ধ হয়ে যেত শ্রোতারা।

আগ্রায় এই খেয়ালের সূচনা অবশ্য তাঁর আগের পুরুষ থেকে।

কিন্তু গোলাম আব্বাসের সুদীর্ঘ আয়ুর সঙ্গীত সাধনাতেই এর স্থায়িত্ব ঘটে। তা তাঁর স্বাস্থ্যচর্চারও একটি সুফল। এমন ব্যাপক জীবনকালের জন্যেই তিনি গড়তে পারেন দৌহিত্র ফৈয়াজকে। মনের মত করে তৈয়ারি। সারা ভারতে আগ্রা ঘরানার তূর্য নিনাদ যে ফৈয়াজ খাঁ শুনিয়েছিলেন।

একশো দশ বৎসর অতিক্রম করেছিলেন গোলাম আব্বাস। ১৮২০-২১ সালে তাঁর জন্ম। আর মৃত্যু সন ১৯৩২। ভারতের গায়ক-কুলে এবং আধুনিক কালে সুদুর্লভ পরমায়ু। প্রসঙ্গত আরো কজন দীর্ঘজীবীর নাম করা যায় এখানে।

বারানসীর ধ্রুপদগুণী গোপালাপ্রসাদ মিশ্র শতবর্ষ অতিক্রম করে-ছিলেন, ঊনিশ শতকের শেষ দিকে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রধান সভাগায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর অন্যতম গুরু গোপালা-প্রসাদ। তেমনি কলকাতায় সুপরিচিত ওস্তাদ বদল খাঁও হন শতায়ু। গয়ার আচার্য খেয়ালীয়া হনুমানদাসেরও শতবর্ষ পরমায়ু ছিল।

বাঙালীদের মধ্যে দৃষ্টান্ত রেখেছেন টপ্পাচার্য নিধুবাবু (১৭৪০-১৮৩৮), ধ্রুপদী বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮০৪-১৯০০) এবং ধ্রুপদী রাম-শঙ্কর ভট্টাচার্য (১৭৬১-১৮৫৩)। যথাক্রমে ৯৮, ৯৬ ও ৯৩ বছর পরমায়ু তাঁদের।

সুতরাং ভারতবর্ষের তাবৎ দীর্ঘায়ু গুণীদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট আগ্রাওয়ালে গোলাম আব্বাস। সঙ্গীত-জগতের সেকাল ও একালকে যুক্ত করে তিনি বিরাজমান থাকেন সুদীর্ঘকাল। দৌহিত্রের সঙ্গীত-জীবন যখন সুপরিণত, সুপ্রতিষ্ঠ, তখনও গোলাম আব্বাস সক্ষম সঙ্গীতজ্ঞ। তারপরে ফৈয়াজ খাঁ যখন বরোদার রাজদরবারে সভাগায়ক, তাঁর কাছেই তিনি শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন। সেই তাঁর পূর্ণ বার্ধক্যের পর্যায়ে।

অপুত্রক তিনি। দুই কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠার একমাত্র সন্তান

ফৈয়াজ। সেকেন্দ্রাবাদের রঙ্গিলে ঘরানাদার সব্দর খাঁর পুত্র। কিন্তু নিতান্ত শিশু বয়সেই ফৈয়াজ পিতৃহীন হন।

তখন গোলাম আব্বাস তাঁকে জননীর সঙ্গে নিয়ে আসেন আগ্রায়। নিজের কাছে রেখে দেন। দৌহিত্রের তালিমও শুরু হয়ে যায় সেই সঙ্গে। ফৈয়াজের বয়স তখন বছর সাতেক। আর সত্তর পার হয়েছেন মাতামহ।

উনিশ শতকের আশীর দশক তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

সেই বয়সেও পূর্ণ সক্ষম গায়ক গোলাম আব্বাস। নাতিকে সমান উৎসাহে শিক্ষা দিতে লাগলেন, যেমন মাঝবয়সে অন্য শিষ্যদের দিয়েছেন। পরে ফৈয়াজের অন্য শিক্ষকও হন এ বংশে। যেমন কাল্লান খাঁ।

কিন্তু মাতামহের তালিম তাঁর পক্ষে অপরিহার্য, অমূল্য ছিল। এত ধৈর্যে, এত কষ্টে, এমন প্রাণের টানে আর কে শেখাতেন ফৈয়াজকে? কার এমন স্নেহ খাটাবার ক্ষমতা? পেশাদার বংশের সন্তানকে তৈরি করে দেবার জন্যে আপাত কঠিনতা। সাধনের জন্যে শাসন। সেই বালক বয়স থেকেই ফৈয়াজের ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রম। নির্দিষ্ট, প্রণালীবদ্ধ কণ্ঠচর্চার নিয়মিত অভ্যাস। সে দৈনিক রিয়াজ থেকে নিস্তার নেই মাতামহের নির্দেশে।

সেই তালিমের ধরনধারণ বোঝা যায় একদিনের কথা থেকে। শিক্ষানবীশদের পক্ষে একটি আদর্শ উদাহরণ।

সেদিন অন্য প্রকার সাধনার পর গোলাম আব্বাস ফৈয়াজকে একটি পাল্টা দিয়েছেন। এটি রিয়াজ করতে হবে কম সে কম পঞ্চাশ বার।

কিন্তু ততক্ষণে ধৈর্য হারিয়েছেন ফৈয়াজ। রিয়াজ ফেলে ঘর ছেড়ে পালিয়েছেন। আত্মরক্ষা করতে এসেছেন বাগানে। দাদাও পায়ে পায়ে আসামীর খোঁজে হাজির। শেষ আশ্রয়ের জন্যে বেচারা অগত্যা উঠে পড়েছেন গাছের ডালে। কিন্তু সেখানেও রেহাই নেই।

গাছের নীচে থেকে হুকুম দিলেন গোলাম আব্বাস, 'ওই পালটা পঁচাশ বার আমায় শোনা। তবে নাবতে পাবি গাছ থেকে। না হলে, থাকবি ওই ডালে বসে। আজ খানা বন্ধ।'

শেষ পর্যন্ত অতবারই শুনে শুনে ফৈয়াজের গলায় পালটাটি শুনেছিলেন। তবে গাছ থেকে নামবার অনুমতি মিলেছিল সেদিন।

এমনি নাছোড়বন্দ্ তালিম তাঁর। অমনি কঠিন সাধনে আদরের ফৈয়াজ অতবড় কলাকার হতে পেরেছিলেন। আদর দিয়ে শ্রমবিমুখ করলে আফতাব-এ-মুসিকীর নামও জানা যেত না সারা হিন্দুস্থানে।

ফৈয়াজ তো তাঁর বৃদ্ধ বয়সের, আর শেষ ছাত্র। পরিবারের অন্য ছেলেদেরও তালিম দেন অনেক আগে। তেমনি আগ্রহ করেই গোলাম আব্বাস আত্মীয়স্বজনদের শেখাতেন। দস্তুরমত নিয়মবদ্ধ তাঁর শিক্ষাক্রম। নিজের জীবন-চর্যার ধারার মতনই।

ছোট ভাই কাল্লান খাঁ, জেঠার নাতি (শের খাঁর ছেলে) নত্থন খাঁ—এঁরা গোলাম আব্বাসের হাতেই তৈরি।

সেই কাল্লানের জন্যেও এ ঘরানার বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল। তিনি তালিম দেন পুত্র তসদ্দুক হোসেন, নত্থনের পুত্র বিলায়েৎ হোসেন, নত্থনের এক পৌত্র (মহম্মদের পুত্র) বসির খাঁকে।

তা ছাড়াও শিখিয়েছিলেন খাদিম হোসেন, আনওয়ার হোসেন, নান্হে খাঁ প্রভৃতিকে। ফৈয়াজও কাল্লানের শিক্ষা পান। গোলাম আব্বাস তখনো জীবিত। তবে তাঁর শরীরের সে সময় অথর্ব, অশক্ত অবস্থা, তালিম দেয়াও অসম্ভব।

সুদীর্ঘায়ু খেয়ালিয়া গোলাম আব্বাস। আর তাঁর দানেই এমনিভাবে আগ্রা ঘরানার প্রসার হয়। তিনি তার মান ও স্থান সুনির্দিষ্ট করে দেন ভারতের সাঙ্গীতিক মানচিত্রে। অর্থাৎ আগ্রার খেয়াল গায়কীকে, ছন্দকারু-প্রধান, স-দাপট গায়ন রীতিকে ভারতীয় সঙ্গীত ক্ষেত্রে প্রচলিত করে দেন বোল-বাঁট, বোল-তান, লয়কারীর যে

জোরালো চালকে পরেই ফয়াজ খাঁ তাঁর বাজখাঁই গলায় মুখর ভাস্বর করে তোলেন আসরে দরবারে।

তবে এ বংশে খেয়াল চর্চার সূত্রপাত করেন গোলাম আব্বাসের বাবা। ঘগ্‌গে খুদা বখ্‌স্ নামে প্রসিদ্ধ তিনি। তাঁর আগে এটি ছিল ধ্রুপদী পরিবার, পুরুষানুক্রমে। খুদা বখ্‌স্‌ও প্রথমে ধ্রুপদ গাইতেন। কিন্তু ধিক্কার পেতেন ঘগ্‌গে অর্থাৎ কর্কশ কণ্ঠের জন্যে।

সেই মনোকষ্টে তিনি চলে যান গোয়ালিয়রে। সেখানে নত্থন পীর বখ্‌সের তালিম পান। সেই শিক্ষাতেই তিনি হন খেয়াল গায়ক। আর তাঁর কণ্ঠও পরিশুদ্ধ হয়ে যায়।

তারপর আগ্রায় ফিরে সঙ্গীতচর্চা করতে থাকেন খেয়ালীয়ারূপে। এই হিসেবে আগ্রা ঘরানার মূল গোয়ালিয়রে ধরা যায়। কারণ খুদা বখ্‌স্ থেকে এই পরিবার চর্চা করতে থাকেন খেয়াল। আগ্রা চালের খেয়ালে যে ছন্দ-কর্মের প্রাধান্য আর লয়কারীর মুন্সিয়ানা, তার সূত্র গোয়ালিয়রে। সেখান থেকে পেয়েছিলেন খুদা বখ্‌স্। নত্থন পীর বখ্‌সের অধ্যায়ে সেসব কথা বলা হয়েছে।

গোয়ালিয়রী চালের সেই খেয়াল খুদা বখ্‌স্ চর্চা করতে লাগলেন বটে। কিন্তু বংশের ধারায় তাঁর ধ্রুপদের ভিত্তি রয়ে গেল। কারণ আগে তো রাগালাপ, ধ্রুপদ, ধামার খুদা বখ্‌স্ আপন পরিবারেই শিখেছিলেন। তেমনি তাঁর পরেও এ বংশের শিক্ষায় ধ্রুপদ থাকে আবশ্যিক। গোলাম আব্বাস, ফৈয়াজ খাঁ কিংবা তাঁদের পরেও।

আগ্রার এই পরিবার আগে ছিলেন হিন্দু। তাঁদের মধ্যে অলক-দাস, মলকদাস প্রমুখ নাম পাওয়া যায়। তবে কোন্ সময় থেকে যে এ বংশে ইসলাম আসে, জানা যায়নি সেকথা। কিন্তু মুসলমান হওয়ার জন্য তাঁদের সঙ্গীত-জীবনে কোন পরিবর্তন দেখা দেয়নি। ধর্মান্তরিত হবার আগেও যেমন, পরবর্তী পর্বেও তেমনি তাঁরা থাকেন সঙ্গীতের সেবক। খুদা বখ্‌সের বাবার নাম শ্যামরঙ্গ। এটি তাঁর লেখনী-নাম হওয়াও সম্ভব।

তিনিও ছিলেন ধ্রুপদ ধামারের গুণী গায়ক। তাঁর কাছে ধ্রুপদের শিক্ষা পেলেও খুদা বখ্‌স্ পরে খেয়াল গানের জন্যেই প্রতিষ্ঠা পান। খেয়াল-গায়ক হয়ে আগ্রায় কিছুদিন বাসের পর, খুদা বখ্‌স্ গেলেন রাজপুতানার আলোয়ার রাজ্যে। রাজার প্রশংসা, পুরস্কার ইত্যাদি লাভ করলেন।

তারপর এলেন জয়পুর মহারাজা রামসিংহের দরবারে। সেখানে তখন বহরম খাঁ, রজব আলী, ইমরৎ সেন, মুবারক আলী প্রমুখ গুণীরা রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে খুদা বখ্‌স্‌কেও মহারাজা দরবারী করে নিলেন, তাঁর গানে প্রীত হয়ে।

তারপর আরো নানা দরবার থেকে খুদা বখ্‌স্ আমন্ত্রণ পান। যেমন ঢোলপুর, ঝালোয়ার, টঙ্ক, রামপুর, কাশী, রেবা, ভরতপুর। তার মধ্যে রামপুর দরবারে খুদা বখ্‌স্ সেবার থাকেন দু সপ্তা।

রামপুরের নবাব তখন কাল্‌বে আলী খাঁ। খুদা বখ্‌সের গান তিনি অনেক তারিফ করে শোনেন। মুজরো দেন ভালই। কিন্তু সে দরবারে তাঁর প্রথম আসরই মাটি হতে বসেছিল। তখন তাঁর সঙ্গে থাকতেন গোলাম আব্বাস। তিনি তৈয়ারি গায়ক হয়েছেন সে সময়। সে আসরের ঘটনাটি বলা হবে শেষে, গোলাম আব্বাসের কথার সঙ্গে।

খুদা বখ্‌সের তালিম পান চারজন। বড় ছেলে গোলাম আব্বাস। ভাতিজা শের খাঁ। ভরতপুরের আলী বখ্‌স্। আর জয়পুরের শিউ দীন, প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত বিশ্বনাথের পুত্র। চার শিষ্যই ওস্তাদের নাম রেখেছিলেন।

১৮৫০ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে মৃত্যু হয় খুদা বখ্‌সের।

বেশির ভাগই তিনি আগ্রার বাইরে বাইরে থেকেছেন। তাই বিশেষ তালিম দিতে পারেননি নিজের ছেলেকে। জ্যেঠতুত বড় ভাই শের খাঁর কাছেই গোলাম আসল শিক্ষা পেয়েছেন। খুবই ভালভাবে

তাঁকে শিখিয়েছেন শের খাঁ। খুদা বখ্‌স্‌ যেমনভাবে শের খাঁকে তালিম দিয়েছিলেন।

শের খাঁ ছাড়া, মামাতো ভাই ঘাসিট্‌ খাঁর কাছেও শিখেছিলেন গোলাম আব্বাস। তবে ঘসিটের কাছে তিনি কেবল হোরি ধামার শেখেন।

এমনি একাধিক জনের শিক্ষার ধারায়, একনিষ্ঠ সাধনায় গড়ে ওঠে গোলাম আব্বাসের গায়ক জীবন।

তারপর ঘগ্‌গে খুদা বখ্‌সের যখন মৃত্যু হয়, তখন গোলাম আব্বাসের প্রতিভা মধ্যগগনে। দস্তুরমত তৈয়ারী হয়ে তিনি আসরে দরবারে মুজরো করছেন। আগ্রা ঘরানার উদীয়মান গায়ক রূপে স্বীকৃত।

তখনকার নানা দরবার থেকে ডাক পেতেন তিনি। সঙ্গীতপ্রেমী সমঝদাররা তাঁকে কাছে রাখতে চাইতেন। বিশেষ আলোয়ার, জয়পুর আর টঙ্ক দরবার মাঝে মাঝেই আমন্ত্রণ করতেন তাঁকে। গোলাম আব্বাস কিন্তু কোথাও চাকরি নেননি। মুজরো করে চলে আসতেন আগ্রায়। মহীশূর মহারাজার দশেরা জলসাতেও যোগ দেন। অনেক মুজরো পান আর সোনার পদকও। কয়েকবারই তিনি মুজরো করেছেন দাক্ষিণাত্যের এই সেরা দরবারে।

গোলাম আব্বাস আগ্রায় থাকতেই ভালবাসতেন। সেখানকার সেই আসর গলি বেগ পাড়ায়। এ অঞ্চলের ইমামবাড়ার সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের যোগ। মহরমের সময় ইমামবাড়ার তাজিয়ার সঙ্গে তিনি থাকতেন। তাঁর বহু বছর পরেও এই ধারা বজায় রাখেন ফৈয়াজ খাঁ। তাঁরা শিয়া সম্প্রদায়ের।

আগ্রার সেই পুরনো মহল্লায় থেকে গোলাম আব্বাস ঘরের ছেলে-দের তালিম দিতেন। ছোট ভাই কাল্লানকে (আসল নাম গোলাম হায়দর) তৈয়ারি করেন প্রথমে। দশ বছরেরও বেশি তাঁকে খুব ভালভাবে শেখান। তারপর ছেলে নত্থনকে। শেষে ফৈয়াজকে

তালিম দিতে শুরু করেন। নিজের সঙ্গীতজীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত চলে সেই তালিম। যাবতীয় সঞ্চয় তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন আদরের নাতিকে।

গোলাম আব্বাসের ছোট জামাই কালে খাঁ, মথুরার গায়ক। কিন্তু কালে খাঁর ছেলে গোলাম হোসেন হারমোনিয়ামের কলাবৎ হয়েছিলেন। ফৈয়াজ যেমন আগ্রা ঘরানায় যুক্ত থাকেন, গোলাম আব্বাসের এই দৌহিত্র (গোলাম হোসেন) তেমন নন। মথুরার সঙ্গীতক্ষেত্রে হারমোনিয়াম বাদনের যে বিশিষ্ট ধারা আছে, তারই অন্তর্ভুক্ত থাকেন গোলাম হোসেন। হারমোনিয়ম-শিল্পী রূপেই প্রতিষ্ঠা পান।

আগ্রা ঘরানার নানা গুণীকে অর্থাৎ গোলাম আব্বাস বংশীয়দের গীত রচনাকার দেখা যায়। খেয়ালের বন্দিশ রচয়িতা তাঁরা।

তেমনি গান রচনা করেছেন স্বয়ং গোলাম আব্বাসও। খেয়ালের চীজ। তাঁর রচিত একটি বন্দিশ দেওয়া হল এখানে—

আশাবরী (কোমল রে)—
আলি রি শুন্ পিয়া কি বাৎ,
হম্ সো কঁরু হুয় ঘাট॥
পঁতিয়া লিখত মোরি ছাঁতিয়া জরে,
সতন কো লিয়ো হে সাথ॥··

সমকালীন সঙ্গীতজগতের এক দিকপাল কলাকার গোলাম আব্বাস। যত বড় শিক্ষক তিনি, তার চেয়েও বড় শিল্পী। যেমন রাগ রূপায়নে তেমনি কণ্ঠসম্পদে আর গায়নবৈপুণ্যে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। সুরের তরঙ্গের পর তরঙ্গে উন্মাদনা জাগাতেন সকলের চিত্তে। আবার সুরের ওপর কি সুন্দরভাবে তিনি স্থিত হতেন। তাও কি আনন্দের আস্বাদ দিত শোতৃমণ্ডলীকে।

এই ঘরেরই এক খেয়াল-গুণী বিলায়েৎ হোসেন। ছেলেবেলা থেকে তিনি গোলাম আব্বাসের গান শুনেছেন। তিনি তাঁর গানের কথায় বলেন, '(গোলাম আব্বাস) যখনই কোন সুরের ওপর

দাঁড়াতেন, বার বার একই আন্দাজে স্বর লাগাতেন, মনে গভীর প্রভাব পড়ত। অনেক বছর পরেও তা মনে পড়ে।' (সঙ্গীতজ্ঞকে সংস্মরণ, পৃঃ ১০৪)

বহু আসরে দরবারেই শ্রোতাদের মাতিয়ে দিয়ে গেছেন গোলাম আব্বাস। আর তাঁর কম বয়স থেকেই সে শক্তি প্রকাশ পায়। তার মধ্যে রামপুর দরবারের আসরটির কথা বলা যায় এখানে।

তখন তাঁর বাবা খগ্‌গে খুদা বখ্‌স্ তো গাইতেন। আর সে আসরও খুদা বখ্‌সেরই। তাঁর তখনো রীতিমত নামডাক। তিনি রামপুরে আসেন নবাবকে গান শোনাতে। সঙ্গে গোলাম আব্বাস রয়েছেন। অনেক আসরেই যেমন থাকতেন তাঁর সঙ্গে।

খুদা বখ্‌স্ সেসময় প্রবীণ বয়সী। আর গোলাম আব্বাস যুবক। রামপুরের নবাব হলেন কাল্‌বে আলি খাঁ।

সময়টি গ্রীষ্মকাল। উত্তর প্রদেশের রামপুরে প্রচণ্ড গরম পড়েছে। তারই মধ্যে খুদা বখ্‌স্ আসরে এসেছেন সঙ্গীদের নিয়ে, নবাব প্রাসাদে।

দরবারের পাশের কক্ষে তাঁদের বসানো হল। তাঁরা ঠিকঠাক করতে লাগলেন তানপুরা, তবলা, বাঁয়া ইত্যাদি সাজ।

খাস কামরায় নবাব বসে আছেন। বন্ধুবান্ধব আর দরবারী গুণীদের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন:খুদা বখ্‌সের আসরের জন্যে। দরজা জানলায় সিক্ত খস্‌খস্। মাঝে মাঝে সেখানে ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে শীতল গোলাপ জল। তারই সুগন্ধে, স্নিগ্ধতায় মনোরম দরবারী পরিবেশ। কালবে আলীর সুসজ্জিত জলসাঘর।

খানিক পরে নবাব ফরমায়েস করলেন, এবার গায়ক হাজির হোন।

খুদা বখ্‌স্ সদলে নবাবের সামনে এসে আসন নিলেন। চমৎকার ঠাণ্ডা এখানে। গোলাপ পাশ থেকে খস্‌বু জলের

ঝারিতে জুড়িয়ে গেল তাঁদের দেহমন। বাইরেকার তাপ থেকে এসে ভারি আরাম হল।

আদব-কায়দা ইত্যাদির পর খুদা বখ্স্ গান শুরু করলেন। কিন্তু তারপরই বুঝতে পারলেন মুস্কিলের ব্যাপার। বিপর্যস্ত হয়েছে কণ্ঠ। প্রখর উত্তাপ থেকে শীতলতার মধ্যে এসে যে তৃপ্তি পেয়েছেন, বিপদ ঘটেছে তখনই। স্বর প্রায় রুদ্ধ।

শ্রোতাদের সামনে গান আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গে খুদা বখ্স্ দেখলেন--গলা বসে গেছে। প্রমাদ গণলেন তিনি। প্রাণপণে গলা ছাড়বার, খেলাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আওয়াজ বেরুবার রাস্তা মিলছে না মনের মতন। অনেক 'কণ'-ই তিনি দেখাতে পারছিলেন না। অথচ গান বন্ধ করাও চলে না এত শীঘ্র। তাই কোনোরকমে গান করতে লাগলেন বটে। সামাল দিতে লাগলেন যথাসাধ্য। কিন্তু তা সাধারণ শ্রোতাদের শোনাবার মতন। বিশেষজ্ঞ কিংবা রামপুর দরবারের উপযুক্ত গান নয়।

নবাব কালবে আলী লক্ষ্য করলেন গায়কের অক্ষমতা। দস্তুরমত সমঝদার তিনি। কলাবতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। কিন্তু গানের এমন ত্রুটির জন্যে গায়ক যে দায়ী নন, একথা তিনি বুঝবেন কেমন করে? খুদা বখ্সের এই গানের মান নয়, ঠাণ্ডায় জখম হয়েছে তাঁর কণ্ঠ—এত কথা গায়কের জানাবার উপায় নেই। নবাবেরও ধারণার বাইরে।

নবাবের কাছেই বসে বাহাদুর হোসেন। সুরশৃঙ্গারের প্রসিদ্ধ বাদক, স্বনামধন্য সেনীয়া। এখানে শিষ্যগঠনের ফলে রামপুর ঘরানার এক প্রবর্তক তিনি।

তাকে কালবে আলি জনান্তিকে বললেন, 'এই খুদা বখ্স্? এঁরই এত নাম আপনারা করেন?'

এই মন্তব্য খুদা বখ্সের কানে গেল কিনা কে জানে। তবু তিনি একটি তান ওঠালেন মরিয়া হয়ে।

কিন্তু এবারেও সুর ঠিক লাগল না।

হঠাৎ এক চমক সৃষ্টি হল আসরে।

খুদা বখ্‌সের পিছনেই গোলাম আব্বাস বসেছিলেন। তিনি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন পিতার অবস্থা। আর তার কারণও। এখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তানটি কেটে নিয়ে গানের সঙ্গে জুড়ে দিলেন নিজের একটি জমাটি তান। সেটি এমন লাগসই হল যে, সাবাস পাবার মতন কাজ।

এই তান দিয়ে গোলাম আব্বাস গান রক্ষা করলেন বটে। কিন্তু মানরক্ষা হল না খুদা বখ্‌সের। পুত্রের কৃতিত্বে নিজের অপটুত্ব যেন আরো ফুটে উঠল। সেই সব জন্যেও গলদঘর্ম হয়ে উঠলেন খুদা বখ্‌স্। নিজের বেইজ্জৎ নিজেই হৃদয়ঙ্গম করলেন।

তবে প্রবীণ কলাকার, হাল ছাড়লেন না। চাঙ্গা হয়ে বসলেন আবার। এবার যেন করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে অবস্থা। ইজ্জৎ বাঁচাতেই হবে।

প্রাণপণ করে আরেকটি তান ধরলেন খুদা বখ্‌স্। মহা দাপটে গলা চড়িয়ে দিলেন। আঃ! এবার ঠিক পৌঁছে গেলেন স্বরে। আর সুরে দাঁড়াতেই সাফ্ সুৎরি হয়ে গেল তাঁর কণ্ঠ। যেন মেঘের জাল ছিন্ন করে চাঁদের উদয় হল।

তারপর তাঁর গান এগিয়ে চলল অবাধ স্বচ্ছ গতিতে। তিন গ্রামে গলা ইচ্ছামতন বিহার করতে লাগল। আপন স্বরূপে প্রকাশ পেলেন কলাবৎ। নিজের মর্যাদা আদায় করে নিলেন।

নবাব এখন খুদা বখ্‌সের তারিফ করতে লাগলেন। বাহাদুর শাহেরও মুখ রক্ষা হল এতক্ষণে।

সে যাত্রায় দু'সপ্তা খুদা খ্‌বস্ রয়ে গেলেন রামপুরে। নবাব দরবারে অনেকগুলি আসর করলেন। মুজরো পেলেন আশাতীত।

কিন্তু সেই প্রথম আসরে গোলাম আব্বাস যদি তানটা কামাল না করতেন? তাহলে খুদা বখ্‌সের কি হাল যে হত রামপুর দরবারে!

সেই প্রথম বয়স থেকেই এমনি সাফল্য গোলাম আব্বাসের। আর তেমনি উচ্চমান তিনি সুদীর্ঘ কলাবৎ জীবনে সসম্মানে বজায় রেখেছিলেন। আগ্রা ঘরানার সুনামও সেই সঙ্গে।

খেয়াল গানের চর্চায় স্মরণীয় হয়ে আছে গোলাম আব্বাসের নাম।

জুড়ির তানপুরা

॥ পশুপতিসেবক মিশ্র ॥

॥ শিবসেবক মিশ্র ॥

গানের আসরে যেমন দেখা যায়। যিনি গাইছেন, তাঁর দু পাশে কিংবা পিছনে বাজছে তানপুরা। দুজন সেই দুটি তানপুরায় একটানা সুর ছাড়ছেন। নিখুঁত একই সুরে বাঁধা তানপুরা।

একই সঙ্গে তারা সুরের গুঞ্জন তোলে। আর গানের শেষে নীরবও হয়ে যায় একসঙ্গে। গানের সঙ্গতে শুধু নয়, নিজেরাও দুটিতে অঙ্গাঙ্গী। পৃথক অস্তিত্ব তাদের নেই। সে তানপুরা দুটিতে কখনো আলাদা সুরের গুঞ্জরণ ওঠে না। আলাদা বাজে না তারা। আলাদা থামেও না। তাই তাদের নাম—জুড়ির তানপুরা।

ঠিক তেমনি তাঁরাও। শিব ও পশুপতি। দুই সহোদর তাঁরা। কিন্তু এক কথায় সবাই বলে—শিব পশুপতি। কেউ আবার অসাবধানে উচ্চারণ করে—শিবা পশুপতি। যেন একজনেরই নাম। যেন জুড়ির তানপুরা। কিন্তু তাঁদের আসল নাম—শিবসেবক মিশ্র ও পশুপতিসেবক মিশ্র।

দুজনের সঙ্গীতজীবন এক হয়ে মিলে মিশে আছে। ছেলেবেলা থেকে সঙ্গীতচর্চা করেছেন একসঙ্গে। বড় হয়েও তাই। আসরেও সচরাচর লোকে তাঁদের একই সঙ্গে দেখে। দু ভাই জুটিতে গান গাইছেন আসরে।

সুন্দর স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ চেহারা। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ রূপ। শান্ত মুখের ভাব। কিন্তু দুর্ধর্ষ সংগ্রামী তাঁদের স্বভাব।

দরবারী পোশাকে দুই ভাই আসরে শোভমান থাকেন। অঙ্গে রেশমী নকশাদার লম্বা পিরান। মাথায় জরিদার টুপি। দুজনেরই

চোখে চশমা। একই বৃন্তে দুটি ফুল যেন। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তাঁদের নেই। সঙ্গীতের আসর থেকে ঘর সংসারে পর্যন্ত।

আসরে দু ভাই নানা রীতির গান শোনান। ধ্রুপদ কিংবা হোরি ধামার। খেয়াল কিংবা টপ্পা। বেশি সময় পেলে একই আসরে গান সব রকম। না হলে কোথাও ধ্রুপদ, হোরি ধামার। কোন আসরে খেয়াল আর টপ্পা। তবে সব গানই তাঁদের হয় যুগলবন্দী। একই ধরনের কণ্ঠ। এক প্রকারই গায়নরীতি। শিক্ষাও পেয়েছেন একই চালে। শিব পশুপতির আসরকে সবাই এমনিভাবে জানে। সেসবই হল কণ্ঠসঙ্গীতের আসর।

শুধু যন্ত্রসঙ্গীতের আসরে পশুপতি একা। তখন বীণা, সুরবাহার কিংবা সেতারবাদক তিনি। বিশেষ সেতার বাজান অতি তৈরি হাতে। আসরে পশুপতি একক সেতারী। সেখানে আর জুটিতে শিব থাকেন না। আসরে যন্ত্রী নন শিব ; যদিও কোন কোন যন্ত্রে হাত আছে তাঁর। কিন্তু তা ঘরোয়াভাবে বাজন। সেতারও তিনি পিতার কাছেই শেখেন বাল্যবয়সে। তবে আসরে পশুপতির সঙ্গে বাজাতেন না।

তাঁদের গানের আসরই বেশি হত আর বেশি বিখ্যাত ছিল। শিব পশুপতির আসর বলতে সবাই জানত তাঁদের যুগলবন্দী গান।

বারাণসীর শিবসেবক মিশ্র ও পশুপতিসেবক মিশ্র। শিবসেবক কিন্তু প্রায় তিন বছরের কনিষ্ঠ। উচ্চারণের সুবিধার জন্যেই তাঁর নামটি লোকের মুখে আগে এসে যেত।

পশুপতিসেবক ও শিবসেবক হলেন লছমী ওস্তাদেরই বংশ। তাঁর জ্ঞাতিভাই তাঁরা। সেই বিখ্যাত দু ভাই প্রসদ্দু, মনোহর ঘরানার দুই ধারা। মনোহরের পৌত্র লছমীজী। আর প্রসদ্দু বা হরিপ্রসাদের পৌত্র পশুপতিসেবক ও শিবসেবক।

প্রসদ্দু মনোহর ঘরানার দুটি বৈশিষ্ট্য। তালাধ্যায়ে অর্থাৎ তাল

লয়ে বা ছন্দলীলায় মুন্সিয়ানা এবং একযোগে নানা রীতির গান, যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চা।

যেমন লছমী ওস্তাদের, তেমনি শিব পশুপতিরও বহুমুখী প্রতিভা। তবে লছমীজীর তুল্য বড় গুণী তাঁরা দু ভাই নন। শিল্পের মানে, ললিতকলার তুলনায় তাঁদের দু'জনের স্থান নীচে। লছমী ওস্তাদের মতন সঙ্গীতরস শিবপ শুপতির গানে ছিল না। মাধুর্য কিংবা রসসৃষ্টির দিকে তাঁদের ঘাটতি।

তবে তালাধ্যায়ে অতি দুরন্ত তাঁরা। তাঁদের বিশেষ করে তাল লয়েরই সাধন। লয়কারীর কূট কৌশল নিয়েই শিব পশুপতি মত্ত থাকতেন। আসর মাৎ করবারও চেষ্টা করতেন মাত্রায় নানা সূক্ষ্ম আঙ্কিক খেলায়। অনেক সময় সেই তাল লয়ের লড়াই চালাতেন সঙ্গতকারের সঙ্গে। অনেক পাখোয়াজী তবলচীকেই তাঁরা বিপাকে ফেলতেন। অনেক সঙ্গতীয়ার ত্রাসের পাত্র ছিলেন তাঁরা।

পশুপতির সেতার বাজনাতেও গুণপনা ওইদিকে বেশি দেখা যেত। সুরের চেয়ে ছন্দ, লয়কারীই বেশি। তাঁর হাত ছিল অত্যন্ত তৈরী। তানের বৈচিত্র্যও অসাধারণ। আর বাজনায় কলাবতী নৈপুণ্যে বহু অলংকারও দেখাতেন। কিন্তু সুরের যন্ত্রের রসসৃষ্টি হত না। তাল লয়ের কায়দার দিকেই তাঁর আসল ঝোঁক। এ বিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাতেন আসরে। আর দস্তুরমত চমক সৃষ্টি করতেন।

শ্রোতাদের আহ্বান করে বলতেন 'ফরমাইয়ে, কৌন্ মাত্রাসে কৌন ছন্দ্ কি তান উঠায় গা।'

বাস্তবিক, ফরমায়েস মতন ওঠাতেনও তা। যে কোন মাত্রা থেকে যে কোন ছন্দের তান তোড়া তুলতেন। অবাক করে দিতেন সকলকে। কারণ এ তানকারি বড়ই কঠিন আর দুর্লভ শ্রবণ।

শুধু পশুপতির সেতারেই নয়। খেয়াল গানেও শিব পশুপতি দুজনই ওরকম কাজ করতেন। অতি সূক্ষ্ম হিসাব ছিল তাঁদের

মাত্রাজ্ঞানের। আধ মাত্রা, পৌনে এক মাত্রারও চুলচেরা দখল তাঁদের গানে ছিল। রাগ-রূপ যথাযথ বজায় রেখে, মাত্রার ভাঙচুর করতেন তাঁরা অবলীলায়।

লয়কারির এইসব তালিম ছেলেবেলা থেকেই দুজনে পেয়েছিলেন। আর দুরস্ত করেছিলেন তেমনি। তাল লয়ের অতি জটিল প্রক্রিয়া তাঁদের কাছে জলবৎ ছিল। সঙ্গতকারদের তটস্থ করে রাখতেন তাল লয়ে সিদ্ধ শিব পশুপতি।

শিবসেবকের যদি কখনো একা আসরে গান হত তখনো দেখা যেত তাঁর ধ্রুপদ ও খেয়ালে অতি কঠিন বাঁট ও তানের কাজ। অল্প সঙ্গতকাররাই হাত খুলে তাঁদের সঙ্গে বাজাতে পারতেন।

তাল লয়ের নানা কূটকার্যের জন্যেই তাঁদের নামডাক ছিল বেশি। আর দুজনেরই প্রতিভা বহুমুখী। অর্থাৎ নানা রীতির গানে আর যন্ত্রে দক্ষতায় এই ঘরানার যা বৈশিষ্ট্য আর লছমী ওস্তাদ যার চূড়ান্ত দেখিয়েছিলেন।

কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রে লছমী ওস্তাদের সমকালেই ছিলেন শিব পশুপতি। লছমীজী এখানে আগে থেকেই বর্তমান ছিলেন। তার বেশ কিছু বছর পরে আসেন এঁরা দু ভাই। লছমী ওস্তাদের পরিণত বয়সেই এঁরাও কলকাতায় নিজেদের আসন করে নিয়েছিলেন।

লছমীজীর অনেক বয়োকনিষ্ঠ শিব পশুপতি। পশুপতিসেবক তাঁর চেয়ে ২১ বছরের এবং শিবসেবক ২৪ বছরের ছোট।

কিন্তু লছমী ওস্তাদের তুলনায় তাঁরা দুজনেই অল্পায়ু বলা যায়। লছমীজী গত হন ৬৯-৭০ বয়সে। আর পশুপতি ৫০ ও শিব ৪৯ বছর বয়সে। লছমীজীর মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যে তাঁদেরও জীবনাবসান ঘটে। লছমীজীর সঙ্গেই তাঁদের সঙ্গীতজীবনের উদযাপন হয় কলকাতায়, যদিও তাঁরা কাশীর সন্তান। আর তাঁর সমমানের না হলেও শিব, পশুপতি দুজনেই বড় ওস্তাদ বলে মান্য হতেন।

লছমীজীর মতনই তাঁরা একাধারে কণ্ঠে ও যন্ত্রে কলাবৎ। নানা পদ্ধতির সঙ্গীতে সিদ্ধ গায়ক।

লছমী ওস্তাদ এবং শিব পশুপতি তো একই ঘরানাদার। আর সেই প্রসদ্দু মনোহর ঘরানার একটি বৈশিষ্ট্য—বহু বৈচিত্র্য। নানা মাধ্যমে রাগসঙ্গীতের সাধন। একাধারে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চা। শিব পশুপতির বিভিন্নমুখী প্রতিভাও লছমী ওস্তাদের সঙ্গে তাঁদের যুক্ত-ঘরানার দান। আপন বংশের উত্তরাধিকার কয়েক পুরুষের সেই বিদ্যার ভিত্তি সম ঐতিহ্য-ঐশ্বর্যের ওপরেই তাঁরা গড়ে ওঠেন।

লছমীজীর সঙ্গীতজীবনের কথায় তাঁর পিতামহ মনোহরের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে, এই গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডে। মনোহরের পিতৃ পিতামহ ঠাকুরদয়াল. জগমন মিশ্র প্রভৃতির উল্লেখও আছে সেখানে। তাঁদের কথা নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই। এখানে মনোহরের মধ্যম অনুজ হরিপ্রসাদ বা প্রসদ্দুর পরিচয় দিয়ে আরম্ভ করা হল শিব পশুপতির ধারা। কারণ প্রসদ্দু হলেন শিব পশুপতির পিতামহ।

প্রসদ্দু মনোহর নাম দুটিও একত্র উচ্চারিত হত। তাঁদের দুজনকে নিয়েই ঘরানার নামকরণ হয়ে যায়। তবে হরিপ্রসাদের প্রতিভা ছিল বৃহত্তর। সেজন্যে কনিষ্ঠ হলেও প্রসদ্দুর নামই আসে সামনে।

মনোহর ও প্রসদ্দু দুজনেই পিতার শিক্ষায় সঙ্গীতজীবন আরম্ভ করেন। একই সঙ্গে তাঁদের পেশাদারী জীবনেরও সূত্রপাত। কিন্তু তখন থেকেই প্রসদ্দু প্রতিভার দীপ্তিতে সামনে এসে পড়েন। আসরে আসরে বরণীয় কলাকার। প্রসদ্দুর নামও মনোহরের আগে উচ্চারিত হতে থাকে ভারতীয় সঙ্গীত জগতে।

প্রসদ্দুর জন্ম হয় বারাণসীতে ১৮০২ সালে। বাল্য থেকেই পিতার কাছে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ হয়ে যায়। জ্যেষ্ঠ মনোহরের

সঙ্গে শিখতেন তিনি। তারপর প্রথম যৌবনেই দুজনে গায়ক হয়ে দেখা দিলেন।

এমন সময় সেই বিরাট জলসা হল পাতিয়ালা রাজ্যে। পাঞ্জাবের এই রাজদরবারে। কিন্তু তা শুধু সঙ্গীত সম্মেলন নয়। এক মহা-প্রতিযোগিতাও।

পাতিয়ালা দরবারে চল্লিশদিন ব্যাপী সেই প্রতিযোগিতা চলে। তখনকার সব ঘরানায় নিমন্ত্রণ পাঠানো হয় তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাবার জন্যে। বহু কলাবত পাতিয়ালায় উপস্থিত হন। আর দিনের পর দিন চলতে থাকে প্রতিযোগিতা।

বিচারকমণ্ডলী প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে কলাকারদের বিচার করেন। চল্লিশ দিনের শেষে সাব্যস্ত হয়—শ্রেষ্ঠ গায়ক বারাণসীর হরিপ্রসাদ মিশ্র। তিনি প্রথম স্থান অধিকার করলেন। পাতিয়ালার মহারাজার নানা মূল্যবান পুরস্কার পেলেন প্রসদ্দু।

সেই পাতিয়ালার দরবার থেকেই প্রসদ্দুর নামডাক আরম্ভ। পাতিয়ালা মহারাজার অনেক পুরস্কারই শুধু পেলেন না। তিনি নাভা, কপূর্রথালা, শিয়ালকোট ইত্যাদি দরবারেও আমন্ত্রিত হলেন, আর লাভ করলেন সঙ্গীতগুরুর সম্মান।

পাতিয়ালা দরবারেই তাঁর রীতিমত শিষ্যকরণ হল। তাও সেই প্রতিযোগিতারই পরে। কালু মিঞা ও লালু মিঞা নামে দুই কলাবিদ প্রসদ্দুর শিষ্য হয়েছিলেন। তাঁরা দুই ভাই নাকি ছিলেন বিখ্যাত গায়ক আলিয়া ও ফত্তুদের আত্মীয়।

পাতিয়ালা দরবার থেকে প্রসদ্দু ও মনোহর কাশীতে ফিরে এলেন। বিশ্রাম করলেন কিছুদিন।

তারপর প্রসদ্দু আরো কটি বিখ্যাত দরবারে গেলেন। যোগ দিলেন পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের দরবারে। সেখানে কিছুকাল থাকবার পর নাগপুরে গেলেন। রইলেন ভোঁসলের সঙ্গীত দরবারে। প্রত্যেক দরবার থেকেই প্রভূত যশ এবং অর্থ লাভও করলেন।

তারপর উনিশ শতকের মাঝামাঝি প্রসদ্দু আমন্ত্রিত হলেন নেপালে। এই বংশের সঙ্গে নেপাল দরবারের সেই প্রথম যোগা-যোগ। আর সেই থেকে পুরুষানুক্রমে তাঁদের নেপালে বাস আরম্ভ।

হরিপ্রসাদের পুত্র রামসেবক, পৌত্র পশুপতি সকলেই এক এক সময়ে নেপালের দরবারি শিল্পী থাকেন। তার সূচনা করেন প্রসদ্দু।

নেপালে মহারাজার দরবার এবং প্রধানমন্ত্রী রাণার দরবার—এই দুই সঙ্গীত-সভার সঙ্গেই প্রসদ্দু যুক্ত ছিলেন। তিনিই কাশী থেকে নেপালের দরবারে যোগ দিলেন। আর মনোহর এলেন কলকাতায়। মনোহরবংশের সঙ্গে কলকাতারও সেই প্রথম সম্পর্ক। তাঁর পরে তাঁর পুত্র রামকুমার ও শেষে লছমীপ্রসাদ সেই সম্বন্ধ আরো নিবিড় করেছিলেন।

প্রসদ্দু অনেক বছর থাকেন নেপাল রাজ্যে। তাঁর সঙ্গীতজীবনের অধিকাংশই সেখানে কেটে যায়। মহারাজা মাতবর সিং থাপা এবং প্রধানমন্ত্রী স্যার জঙ্গ বাহাদুর রাণা দুজনেই ছিলেন প্রসদ্দুর পৃষ্ঠপোষক।

প্রসদ্দু থেকেই এই ধারায় নানা রীতির গানের চর্চা আরম্ভ। তিনি ছিলেন একাধারে ধ্রুপদ খেয়াল ও হোরি গানের সুদক্ষ কলাবত। টপ্পাও তিনি এ বংশে শুরু করেন বলে জানা যায়। বিখ্যাত টপ্পাগুণী হামদুনের ঘর ছিল এই বংশের টপ্পা গানের উৎস। এমনভাবে প্রসদ্দু শুধু কণ্ঠসঙ্গীতের সাধনা করেছিলেন। কোন যন্ত্রবাদনের চর্চা করেননি তিনি। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র রামসেবক বংশে যন্ত্রসঙ্গীতের ধারা পত্তন করেছিলেন। শুধু সুরের যন্ত্র নয়। একই সঙ্গে তালের যন্ত্র সাধনাও করেন রামসেবক মিশ্র।

১৮৬৮ সালে প্রসদ্দুর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর দুই পুত্র। শিবসহায় ও রামসেবক। জ্যেষ্ঠ শিবসহায় ছিলেন কৃতী গায়ক। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ইত্যাদি রীতির গান বংশের ধারায় চর্চা করতেন। তাব মধ্যে খেয়াল বিশেষ টপ্পায় বেশি গুণী হন তিনি। কলকাতায় অনেক

বছর শিবসহায় বাস করেছিলেন। তাঁর যোগ্য শিষ্যও হয় এই শহরে। বাংলার দুই প্রসিদ্ধ টপ্পা-গায়ক মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন শিবসহায়ের দুজন শ্রেষ্ঠ শিষ্য। অবশ্য মহেশ ওস্তাদ এবং মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই লছমীজীর পিতা রামকুমারের কাছেও কিছুদিন শিখেছিলেন।

শিবসহায়ের পুত্র নারায়ণদাস কিন্তু হন সেতারবাদক। তিনিও কলকাতায় ছিলেন। তিনি সেতার শেখেন বোধহয় রামসেবকের কাছে. শিবসহায়ের ধারার কথা অল্প জানা যায়।

প্রসদ্দুর নাম রেখেছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রামসেবক। তাঁর জন্ম ১৮৪৫ সালে। বাল্যকাল থেকেই তাঁর নেপালে বাস। আর পিতার কাছে সঙ্গীতশিক্ষাও সেখানেই পেয়েছিলেন।

প্রসদ্দুর প্রায় যাবতীয় বিদ্যা লাভ করেন রামসেবক। ধ্রুপদ ধামার খেয়াল টপ্পা সব রীতির গানই তিনি পিতার কাছে শিখে-ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রামসেবকও হন নেপাল মহারাজার দরবারী গায়ক। তার পর থেকে আরম্ভ হয় তাঁর যন্ত্রসঙ্গীতের পর্ব। বিশেষ সুরের যন্ত্র।

তিনি যখন নেপাল দরবারে, তখন কজন দিকপাল কলাবৎও সেখানে ছিলেন দরবারী শিল্পী হয়ে। তাঁদের একজন হলেন স্বনামধন্য বড়কু মিঞা। তানসেনের পুত্রবংশের সুরশৃঙ্গারযন্ত্রী। নেপাল বড়কু মিঞার কাছেই রামসেবক যন্ত্রসঙ্গীতের শিক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি যে পরে সেতার সুরবাহার-বাদকও হয়েছিলেন তা বড়কু মিঞার কাছে সেই তন্ত্রবিদ্যা লাভের ফল।

তাছাড়া রামসেবক তবলাচর্চাও ভালভাবে করেছিলেন। তবলা-বাদনের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর তবলাসিদ্ধ মাতুল প্রতাপ মিশ্রের কাছে। তবলা বিষয়ে হিন্দীতে একটি গ্রন্থও লেখেন রাম-সেবক। 'তবলা প্রকাশ ঔর তবলা বিজ্ঞান' সে বইখানির নাম।

নেপালের রাজদরবারে তাঁর বিশেষ মর্যাদার স্থান ছিল। দরবারে

তিনি ছিলেন সঙ্গীত বিভাগের প্রধান সচিব এবং অবৈতনিক দোভাষী। নেপালে বীর হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠায়ও তিনি প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন।

এমনি নানা গুণে সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন রামসেবক মিশ্র। নেপাল মহারাজা পৃথ্বী বীর বিক্রম সিং অতি সম্মান করতেন তাঁকে। কাঠমাণ্ডুর হিট্টি প্রাসাদে মহারাণী একটি সঙ্গীতবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তার কার্যাধ্যক্ষ করেন রামসেবককে।

সেকালের কলাবতদের মধ্যে তিনি বিদ্যার চর্চাও বেশ করেছিলেন। এফ. এ. পরীক্ষায় রামসেবক উত্তীর্ণ হন কাশীর কুইন্‌স্ কলেজ থেকে। তাছাড়া একদিকে সংস্কৃত হিন্দী অন্যদিকে ফারসি আরবী উর্দু, আবার বাংলা ভাষারও চর্চা তিনি করতেন।

স্বরলিপির সাহায্যে শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টাও একসময়ে করেছিলেন রামসেবক।

শেষজীবনে তিনি আর নেপালে থাকেননি। সেখানকার প্রচণ্ড শীত সহ্য হত না তাঁর বৃদ্ধ বয়সে। রামসেবক তখন স্বদেশে ফিরে আসেন। তারপর থেকে বেশির ভাগ ছিলেন তাঁদের পূর্ব নিবাস বারাণসীতে। তার মধ্যে কয়েক বছর তিনি বাস করেন কলকাতায়। এখানে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতবিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেছিলেন। সে-সময়েই তাঁর তবলাবিষয়ক বইখানি প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। একেবারে অন্তিম পর্বে রামসেবক ছিলেন কাশীতে।

তাঁর দুই পুত্র। পশুপতিসেবক ও শিবসেবক। দুজনেরই জন্ম নেপালে। রামসেবক তখন দরবারী শিল্পী হয়ে সেখানে বাস করছেন। দুজনেরই সঙ্গীতশিক্ষা প্রধানত হয় পিতার কাছে আর নিতান্ত বাল্যকাল থেকে। তাঁদের মধ্যে রামসেবকের কাছে পশুপতি শেখেন বেশি।

পশুপতিসেবকের জন্ম ১৮৮১ সালে। অল্প বয়সেই পিতার

শিক্ষা তিনি পেতে থাকেন কণ্ঠসঙ্গীতে। পদ্ধতিগত কণ্ঠসাধনার সঙ্গে নানা রীতির গান। ধ্রুপদ হোরি খেয়াল টপ্পা—সবই পশুপতিকে শেখাতে লাগলেন রামসেবক। একাদিক্রমে কয়েক বছর। দিন-রাতের অধিকাংশ সময়ে সাধন।

তার ফলে প্রথম যৌবনেই সুদক্ষ গায়ক হন পশুপতি। তারপর পিতার কাছেই তাঁর যন্ত্রসঙ্গীতের শিক্ষা আরম্ভ হয়। সেতার ও সুরবাহারও তেমনি অক্লান্ত পরিশ্রমে শিখতে থাকেন। পেশাদার বংশসুলভ ঐকান্তিক সেসব শিক্ষাক্রম। পশুপতি পিতার মৃত্যুর পর বংশের অতিরিক্ত শিক্ষাও পান মহম্মদ হুসেনের কাছে। বাঁস-বেরিলির বীণকার মহম্মদ হুসেন। তাঁর কাছে পশুপতি বীণাবাদন শেখেন। বীণা তিনি বিশেষ বাজাতেন না পরে। কিন্তু বীণার এই তালিম তাঁর সুরবাহার ও সেতার বাদনে প্রয়োগ করেছিলেন। বিশেষ আলাপচারি অংশে।

প্রথম জীবনে পশুপতি সঙ্গীতশিক্ষার সঙ্গে বিদ্যাচর্চাও করতেন। নেপাল বীর হাই স্কুল থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন প্রবেশিকা পরীক্ষা। তারপর অবশ্য কলেজে আর পাঠ করতেন না। সঙ্গীতেই আত্মনিমগ্ন হন একান্তভাবে। পেশাদার সঙ্গীতজীবনের জন্যে পিতার শিক্ষায় নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন। বহুমুখী সঙ্গীতসাধনাই হয় তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

পিতার মতন পশুপতি নেপাল দরবারে দীর্ঘকাল নিযুক্ত থাকেননি। রামসেবকের মৃত্যুর কিছুকাল পরে তিনি বিদায় নেন নেপাল থেকে।

তারপর উত্তর ভারতের নানা দরবারে তিনি যোগ দিতেন। একাধারে গায়ক ও বাদক বলেই সুনাম হয় তাঁর। বিশেষ করে তিনি সেতার ও সুরবাহার বাদক হিসেবে অতি প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। যেমন তৈরি হাত তেমনি সেতারে তাঁর তানের বৈচিত্র্য। বাজনায় অতি দক্ষতায় নানা অলঙ্কার দেখাতেন। আর সেই লয়কারির

মুন্সিয়ানা। ছন্দের জটিল ও চমকপ্রদ কাজ সব। যে-কোন মাত্রা থেকে যে-কোন ছন্দের তান তোড়া ওঠানো।

প্রথম জীবন থেকেই তাল লয়ের এমনি কারুকর্মে পশুপতি আসর মাৎ করতেন। আর নানা দরবারে বিখ্যাত হতে থাকেন লয়কারির গুণে। এসব নৈপুণ্য যেমন সেতারে দেখাতেন তেমনি গানেও। কয়েকটি দরবার থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন গুণপনার জন্যে। প্রথম জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি দরবারী শিল্পী হয়ে সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন। তারপর আসেন কলকাতায়।

কলকাতার সঙ্গে সংস্রব তাঁর পিতার সময় থেকে। রামসেবক এখানে শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীতবিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তখন থেকেই কলকাতায় তাঁদের বংশের কথা সঙ্গীতসমাজের জানা। রামসেবকের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবসহায়ও অনেক দিন কলকাতায় সঙ্গীত সমাজে বাস করেছিলেন। শিবসহায়ের প্রধান শিষ্যারাও বাঙালী।

তাছাড়া তাঁদের জ্ঞাতিদের ধারা তো এ-শহরে আরো অনেক পরিচিত। রামসেবকেরও অনেক আগে আসেন তার জ্যেষ্ঠতাত মনোহর মিশ্র। তারপর মনোহরের পুত্র রামকুমার। কলকাতায় রামকুমারের অনেক বাঙালী শিষ্য হয়েছিলেন। রামকুমারের বিখ্যাত পুত্র লছমী ওস্তাদ পশুপতির আগে থেকেই এখানে রয়েছেন আচার্যের সম্মানে।

এমনিভাবে অনেকদিন আগে থেকে অনেক সূত্রে মিশ্র বংশের সঙ্গে কলকাতায় যোগ। তাই পেশাদার জীবনের পরিণতিতে পশুপতি কলকাতায় এলেন। আর স্থায়ী ভাবেই রয়ে গেলেন বাংলার সঙ্গীতজগতে। কনিষ্ঠ শিবসেবকও তাঁর সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন।

এখানে প্রথম থেকেই অঙ্গাঙ্গী তাঁদের সঙ্গীতজীবন। তখন থেকেই একসঙ্গে শোনা যায়—শিব পশুপতি—এই দুটি নাম। আর আসরে আসরে দু সহোদর একত্র দেখা দেন—যুগলবন্দী গায়ক।

শিবসেবক পশুপতির চেয়ে তিন বছরের ছোট। তাঁরও জন্ম নেপালে, ১৮৮৪ সালে। প্রায় শিশুকাল থেকেই শিব পিতার কাছে শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। বংশের ধারায় বিধিবদ্ধ তালিম।

কিন্তু পশুপতির মত করে শিবকে শেখাননি রামসেবক। পশুপতি প্রথমে বছরের পর বছর কণ্ঠসঙ্গীতে শিক্ষা পেয়েছিলেন। তারপর শেখেন যন্ত্রসঙ্গীত। শিবসেবককে কিন্তু একই সঙ্গে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত শেখানো আরম্ভ হয়। একযোগে নাদ তন্ত্র ও বাদ্য। রামসেবক দেখতেন শিবের স্বভাবে আছে চিন্তা আর অভিনিবেশ। অল্প বয়স থেকেই অসাধারণ মেধা। তাই ভালভাবে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। ধ্রুপদ খেয়াল হোরি টপ্পা সব রীতির গান শেখাতে লাগলেন। আর সেই সঙ্গে সেতারও।

শিবসেবকের প্রথম জীবন নেপালেই কেটে যায়। তিনি ছিলেন সঙ্গীত শিক্ষায় অক্লান্ত পরিশ্রমী। দৈনিক ১৪ ঘণ্টা তাঁর সাধনা চলত। আর তাও সেই বালক বয়স থেকেই।

তখন তাঁকে দেখে মহা প্রশংসা করতেন প্রধানমন্ত্রী বীর সমশের জঙ্গ। বলতেন, 'এ বালক দিগ্বিজয়ী হবে সঙ্গীতে।'

শিবসেবকের কঠোর শ্রম দেখে নেপাল দরবার থেকে আলাদা এক ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কটি দুগ্ধবতী গাভী দেওয়া হয় রামসেবককে। বালক বয়স থেকেই শিবের গান শুনে রাজাও সুখ্যাতি করতেন। অবসরকালে প্রায়ই শুনতে চাইতেন সুকণ্ঠ কিশোরের গান।

এমনি সমাদরের পরিবেশে শিবসেবক নেপালে বড় হতে থাকেন। সঙ্গীত দ্বিতীয় সত্তা হয়ে ওঠে তাঁর জীবনে। দেখা যায় সঙ্গীতের অতি কঠিন শিক্ষাও তিনি সঠিক ধারণ করতে পারেন। তাল লয়ের কুট কৌশলও আয়ত্ত করতে থাকেন দুর্লভ ক্ষমতায়।

রামসেবক তাঁর উত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। পাঁচ বছর বয়সে শিবসেবক পেতে আরম্ভ করেন পিতার তালিম। আর ছাব্বিশ

বছর বয়স পর্যন্ত তা পেয়েছিলেন। তারপরই কিন্তু পিতাকে হারান শিব।

তাঁর শিক্ষাপর্বের শেষ দিক থেকেই রামসেবকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি সযত্নে শেষ পর্যন্ত তালিম দেন শিবকে। নানাপ্রকার গানের সঙ্গে তবলা ও সেতারের শিক্ষাও দিয়েছিলেন। তবে শিবসেবকের যন্ত্রসঙ্গীতের চেয়ে গানেই প্রবণতা ও চর্চা ছিল বেশি। রামসেবক তাঁকে বহু অপ্রচলিত রাগও দেন, যা দুর্লভ ছিল অন্যত্র। এই সঞ্চয় তাঁকে (এবং পশুপতিকেও) পরের গায়ক-জীবনে রীতিমত মর্যাদা দিয়েছিল।

আর শুধু এই একুশ বছরের শিক্ষা নয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পশুপতির কাছেও শিখেছিলেন। পশুপতি একাধারে তাঁর শিক্ষক এবং সঙ্গীতচর্চার সহযোগী। ঘরে এবং আসরে শিবসেবকের বাল্যকালে কতদিন পশুপতির সঙ্গেই চর্চা করতেন। পিতার নির্দেশে দুই সহোদরের হত একত্র সাধনা।

সেই শিক্ষার সময় থেকেই পশুপতির সঙ্গে আরম্ভ হল ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। এক বিচিত্র সঙ্গীতজীবন তাঁদের গড়ে উঠল। পরস্পরনির্ভর। ভাবের আদান-প্রদানে, সহ অনুভব ও সম শিল্পভাবনায় গড়া তাঁদের মিলিত সঙ্গীতজীবন। সেই যুগ্ম পরিচয়েই তাঁরা সঙ্গীতসমাজে পরিচিত, প্রসিদ্ধ হন। আর মৃত্যু পর্যন্ত তা ছিল অটুট, অমলিন।

কলকাতাতেও সেই সম্মিলিত সঙ্গীতজীবন নিয়েই শিব পশুপতি এসেছিলেন। এখানকার শ্রোতারা প্রথম থেকেই দেখেছিল জুড়ির তানপুরা।

কলকাতার আগে শিবসেবকের আর একটি কথা আছে। তাঁর শিক্ষাজীবনের আর একটি প্রসঙ্গ। পশুপতির কাছে শিক্ষা ছাড়াও তাঁর আর একটি তালিম। শিবেরও বংশের অতিরিক্ত শিক্ষার কথা জানা যায় পশুপতির মতন।

বেরেলির বিখ্যাত গায়ক ছিলেন এনায়েৎ হোসেন খাঁ। তিনি একদিকে গোয়ালিয়রের খেয়াল-গুণী হদ্দু খাঁর জামাতা। অন্যদিকে শা শোয়ান ঘরানাদার। তা ছাড়া এনায়েৎ হোসেন বিশেষ টপ্-খেয়াল রীতির গানের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সে টপ্-খেয়ালের চাল তাঁর নিজস্ব। এমন কি টপ্-খেয়াল গানের এক আদি প্রচারকও বলা হয় তাঁকে।

নেপাল দরবারেও বহুকাল নিযুক্ত থাকেন এনায়েৎ হোসেন। তখন থেকেই রামসেবক পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তারপর ৭৫ বছর বয়সে এনায়েৎ হোসেন নেপাল দরবার থেকে অবসর নিয়ে কাশীতে আসেন। দেড় বছর পরে তাঁর মৃত্যুও হয় কাশীতে।

তিনি যখন নেপালে ছিলেন, সে সময়েই তাঁর কাছে শিবসেবক শিখেছিলেন। তা হল রামসেবকের মৃত্যুর পরের কথা। এনায়েৎ হোসেনের কাছে নেপালে বেশ কিছুদিন শেখেন শিবসেবক। পশুপতিও বংশের অতিরিক্ত শিক্ষা পান যে বীণ্‌কার মহম্মদ হোসেনের কাছে, তিনিও শা শোয়ান ঘরানাদার। এনায়েৎ হোসেনরই ভাই তিনি। এইভাবে একই শা শোয়ান ঘরানার দুজনের কাছে পশুপতি ও শিব বংশের বাইরে তালিম পেয়েছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর [illegible]পতি কিছুদিন থাকেন নেপাল দরবারে। কিন্তু শিবসেবক এ দরবারের নিযুক্ত শিল্পী হননি। পেশাদার জীবনের প্রথম থেকেই তিনি ভ্রমণ করেন নানা সঙ্গীত-কেন্দ্রে ও বিভিন্ন দরবারে আসরে গুণপনার পরিচয় দেন। সে-সবই তাঁর সাময়িক অবস্থান। অবশেষে কলকাতায় এসেই তিনি স্থায়ী হন। তখন তাঁর পরিণত যৌবনকাল।

পশুপতিরও তখন থেকেই এই শহরে বাস আরম্ভ।

যতদূর জানা যায়, তাঁরা দুজনে কলকাতার সঙ্গীতসমাজে যোগ দেন ১৯১৮-১৯ সালে।

শিব পশুপতি। এই সঙ্গীত নগরীতে তখন থেকে তাঁদের

সঙ্গীতজীবন আরম্ভ হল। আর আসরে আসরে তাঁদের যুগলবন্দী রূপ দেখা গেল। দুই সহোদরের অঙ্গাঙ্গী সঙ্গীতজীবন। আবাস থেকে আসরে। সর্বত্র তাঁদের একই সঙ্গে দেখা যেত। তবে তান-পুরার গুঞ্জরণের চেয়ে বহুগুণে সমৃদ্ধ। কারণ তানপুরায় মাত্র চারটি বাঁধা স্বরের নিরন্তর পুনরাবৃত্তি। কিন্তু শিবপশুপতি সপ্ত স্বরে অনন্ত বিন্যাসের সাধক। বহু বিচিত্র সুরে ঐশ্বর্যময় তাঁদের সঙ্গীতকৃতি। ছন্দ-চাতুর্যের নিত্য রূপকার।

তাঁরা দুজনে যখন এলেন, কলকাতা তথা বাংলার সঙ্গীতজগতে তখনো ধ্রুপদের যথেষ্ট সমাদর। খেয়াল টপ্‌খেয়াল টপ্পার চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে বটে। কিন্তু সঙ্গীতাসরে ধ্রুপদের মর্যাদা অনেক বেশি। ধ্রুপদ ভিন্ন কোন আসরের উদ্বোধন হয় না। ধ্রুপদের পরে পরিবেশন করা হয় খেয়াল টপ্‌-খেয়াল ইত্যাদি গান।

উনিশ শতকের জের হিসেবে তখনো কলকাতার নানা ধনী-গৃহে সঙ্গীতসভা মুখর। সেখানেও ধ্রুপদের বেশি কদর। কোন নবাগত কলাবতের গুণ-পরীক্ষা ধ্রুপদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

এখানে তখন ধ্রুপদাচার্য রয়েছেন লছমী ওস্তাদ (খেয়াল টপ্পা টপ্‌-খেয়াল ইত্যাদির গায়ক হলেও), বিশ্বনাথ রাও, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী (খেয়াল অঙ্গের গায়কও) প্রমুখ। সদ্য বিগত হয়েছেন মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরনাথ ভট্টাচার্য, রামপ্রসন্ন ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ধ্রুপদীরা আত্মপ্রকাশ করেছেন।

এমন সময়ে প্রধানত ধ্রুপদ গায়করূপেই এলেন শিব পশুপতি। নানা রীতির গানে গুণী তাঁরা। একাধিক যন্ত্রসঙ্গীতেও অভিজ্ঞ। বিশেষ পশুপতি। তবু বাংলার সঙ্গীতসমাজে শিব পশুপতি ধ্রুপদীরূপেই দেখা দিলেন। প্রসদ্দু মনোহর ঘরানার ধ্রুপদের যুগল-বন্দী গায়ক ভ্রাতৃদ্বয় বলেই তাঁদের জানলেন বাংলার শ্রোতারা।

এই ঘরানারই লছমী ওস্তাদ তখন রয়েছেন কলকাতায়। বাংলার সঙ্গীতসমাজে একাত্ম হয়ে আচার্যের সম্মানে বিরাজ করছেন। বাঙালী গুণীদের সঙ্গে আত্মজন হয়েই মিলে গেছেন লছমীজী।

কিন্তু তাঁরই এই দুই আত্মীয়ের বিষয় সে কথা বলা যায় না। শিব পশুপতির কলকাতায় সঙ্গীতজীবন আরম্ভ হল বিরোধের মধ্য দিয়ে। কারণ তাঁদের দুজনের মধ্যেই এক সংগ্রামী মনোভাব ছিল। আর সঙ্গীত বিষয়ে এক প্রকট আত্মাভিমান। তাঁদের ঘরানা যে তালাধ্যায়ে অদ্বিতীয়, তাঁরা যে লয়কারিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কে এমন বাঙালী পাখোয়াজী, যিনি তাঁদের গানে সঙ্গত করবেন সমযোগ্য হয়ে? ইত্যাদি মনোভাব শিব-পশুপতির ছিল তখন।

এখানে তাই তাঁদের প্রথম আসরেই সংঘর্ষ বেধে গেল।

সেকালের কলকাতায় সঙ্গীত সমাজের একটি নিজস্ব আন্তরিক পরিবেশ ছিল অর্থাৎ সঙ্গীত বিষয়ে একটি সামাজিক বোধ। সঙ্গীত-সেবীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ও ভাবের আদানপ্রদানে নিবিড়। নবাগতদের নিজেদের মধ্যে বরণ করে নেওয়া ও গুণ বিচার করবার আগ্রহ। শিব পশুপতি তখন প্রথম কলকাতায় এসেছেন। তাঁরা এক বিখ্যাত ঘরানাদার এবং অবস্থান করবেন এখানকার সঙ্গীত-ক্ষেত্রে। অতএব সেই সঙ্গীতসমাজ তাদের বিষয়ে কৌতূহলী হল। আর সেই সঙ্গে জাগল দায়িত্ববোধ। নবাগত এই কলাবত ভ্রাতাদের গুণপনা ও বিদ্যাবত্তা কেমন? তার পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন।

অতএব শিব পশুপতির গুণ বিচারের জন্যে একটি আসরের ব্যবস্থা হল। তাঁরা বিদ্যার পরিচয় দিলেন কলকাতার গুণীজনের সমক্ষে। তার জন্যে ঠিকমত বিচারকমণ্ডলী হল ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাও, সঙ্গীতমনীষী ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতিদের নিয়ে। মিশ্র ভ্রাতারা এ-ব্যবস্থায় সম্মত হলেন।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ভারত সঙ্গীত সমাজে আয়োজিত হয়েছে সেই জলসা সেদিন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আসরে প্রস্তুত হয়ে

বসেছেন পশুপতিসেবক ও শিবসেবক। জুড়িতে তাঁরা ধ্রুপদ গাইবেন। তাঁদের পাশে আসন নিয়েছেন পাখোয়াজী সতীশচন্দ্র বাগচী। বিখ্যাত সুরকার দেবকণ্ঠ বাগচীর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনিই সঙ্গত করবেন।

বিশ্বনাথ রাও, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ বিচারকরাও উপস্থিত। বহু সঙ্গীতজ্ঞ, সুধী রয়েছেন শ্রোতাদের মধ্যে। সামনেই পাখোয়াজ-গুণী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ বসেছেন।

সঙ্গীতসমাজের বৃহৎ বৈঠকখানা, সামনেকার বারান্দা সবই উৎসুক শ্রোতায় পরিপূর্ণ।

এবার গান আরম্ভ করলেন শিব পশুপতি। জুড়িতে তাঁদের আলাপচারি যথারীতি হল এবং নির্বিঘ্নেই।

কিন্তু চৌতালে গান আরম্ভ হতেই গোলযোগ বাধল।

প্রথম আবর্তের শেষে পাখোয়াজে ধা মারলেন সতীশচন্দ্র। অমনি শিব পশুপতি প্রতিবাদ করে উঠলেন।

শ্রোতাদের দিকে চেয়ে, সতীশচন্দ্রের উদ্দেশে তাঁরা বললেন, 'বাবুজীকা ধা মোকামসে পৌঁছতা নেহি।'

সতীশচন্দ্র শান্ত, নিরীহ স্বভাবের মানুষ। কিন্তু তবু এ অপমান তিনি সহ্য করলেন না।

মাত্রার হিসেব দেখিয়ে যুক্তি দিয়ে বললেন, 'আমার ধা ঠিকই পৌঁছেছে।'

গায়করা কিন্তু মানলেন না তাঁর কথা।

তখন 'ধা'-র পর 'ধা' নিয়ে মতান্তর হতে লাগল পাখোয়াজী ও গায়কদের মধ্যে।

সতীশচন্দ্র অসহায়ভাবে বিচারকদের দিকে চাইলেন। কিন্তু তাঁরা কোন মতামত দিলেন না তখনি।

ক্রমে শিল্পীদের মধ্যে তর্কাতর্কি থেকে বিবাদ আরম্ভ হয়ে গেল। গান তো বন্ধই হয়েছে। এবার অনেক শ্রোতাই এঁদের কলহ

দেখতে লাগলেন কৌতূহলী হয়ে। কার ভুল? কে সঠিক? কেন মতান্তর ঘটল?

সতীশচন্দ্র কেবলই বিচারকদের দিকে তাকালেন। কিন্তু তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন কোন মতামত না দিয়ে।

ওদিকে বচসার স্বর ও সুর ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। সুরের আসরে অসুরের উপদ্রব।

তখন নগেন্দ্রনাথ ও দুর্লভচন্দ্র এগিয়ে এসে বললেন, 'সতীশবাবুর সঙ্গত শাস্ত্র-অনুযায়ীই হয়েছে। বাংলায় এই রীতি প্রচলিত। এই প্রণালীর সঙ্গে কাশীর শিউসহায় মিশ্র, কান্তাপ্রসাদ প্রভৃতি বড় বড় ধ্রুপদীরা গেয়ে গেছেন। কখনো আপত্তি করেননি। এখানেও আপত্তির কোন কারণ নেই।'

শিব পশুপতি প্রবলভাবে জানালেন, 'আমরা নেপাল দরবার, কাশী প্রভৃতি পশ্চিমের প্রথা অনুসারে গাইছি। সম বিসম অতীত অনাঘাতের সব দস্তুরমত দেখাচ্ছি। ইয়ে ঠেকা মে গল্দ্ হ্যায়।'

সতীশচন্দ্র পুনরায় বিচারকদের দিকে চাইলেন রায়ের জন্যে। কিন্তু বিচারকমণ্ডলী তখনো নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে চলেছেন। কোন রায় দিচ্ছেন না এই অভিযোগের ব্যাপারে।

ওদিকে কলহ ও গোলমাল বিষম বাড়তে লাগল। বিবাদ এবার সংক্রামিত হল শিল্পীদের আসর থেকে শ্রোতাদের মধ্যে।

হঠাৎ একদল শ্রোতা পাখোয়াজীর প্রতি একটা অসম্মানকর কথা শুনিয়ে দিলেন। তখনি কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন গায়কদের পক্ষে। ঘোর বিসম্বাদ আরম্ভ হয়ে গেল।

আর একটা প্রতিপক্ষ খাড়া হল এদিকে।

সঙ্গীতের সভা ভাগ হয়ে পড়ল দুটি বিরুদ্ধ দলে। পরস্পরের ভাষার প্রচণ্ডতা এমন দাঁড়াল যে মৌখিক থেকে মুষ্টিযোগের পরিবেশ সৃষ্টি হল।

কিন্তু বিচারকমণ্ডলীর পরামর্শ তখনো শেষ হচ্ছে না। হয়ত

দুই বিবদমান দলকে সন্তুষ্ট করবার উপযুক্ত রায় দিতে তাঁরা অসমর্থ।

এমন সময় আরেকটি অভাবিত দৃশ্য। দুই প্রচণ্ড প্রতিপক্ষের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন এক বিরাট দেহী ব্যক্তি। মল্লবীর যতীন্দ্রচরণ গুহ। কিন্তু সে নামে কলকাতার অল্প লোকই তাঁকে জানে। তাঁর পরিচয়—গোবরবাবু। অনেকেই তাঁকে জানেন মহাশক্তিধর কুস্তিগীর বলে। এবিষয়ে দেশের গৌরব গোবরবাবু।

সেকালের বিশ্ববিখ্যাত বাঙালী পালোয়ান। সমাজের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি তিনি। সেই আমেরিকায় লাইট হেভিওয়েট বিশ্ব প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। উনিশ শতকের বিখ্যাত মল্লবীর অম্বু গুহের বংশধর। মসজিদবাড়ী স্ট্রীটের বনিয়াদী গুহ পরিবারের সন্তান গোবরবাবু পারিবারিক পরিবেশে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

বিখ্যাত শরদী কৌকব খাঁ, করামতুল্লা খাঁর শিক্ষায় সেতারচর্চাও করতেন তিনি। ৫১ বীডন স্ট্রীটের বাড়িতে গোবরবাবুর আসর নানা গুণীর অনুষ্ঠানে প্রায়ই মুখর হত। তখনকার কলকাতার সঙ্গীত সমাজে একজন গণনীয় ব্যক্তি তিনি। সেই হিসেবেই মল্লবীর সেদিন ভারত সঙ্গীত সমাজে এসেছিলেন।

এখন আসরের বিসদৃশ অবস্থা দেখে এগিয়ে এলেন দুটি বিরোধী দলের মাঝখানে। শরীরের তুল্য বলিষ্ঠ তাঁর ব্যক্তিত্বও।

স্বল্পভাষী গোবরবাবু। সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলেন—নৈর্ব্যক্তিক-ভাবেই—'এটা গানের আসর না লড়াইয়ের আখড়া?'

সভার কলরোল তখন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু গোবরবাবুকে উত্তর দিতে শোনা গেল না কাউকে। সকলেরই দৃষ্টি তাঁর পাহাড়বৎ অবয়বের দিকে।

অল্পক্ষণ গোবরবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন। আর তাঁর মুখ চোখ থেকে সর্বাঙ্গে ফুটে উঠল একটি অভাবিত প্রশ্ন: 'কে কে লড়াই করতে ইচ্ছুক, এগিয়ে আসুন।'

না, না। গোবরবাবুর আকারপ্রকার নিরীক্ষণ করে আর কারুর সে সাধ নেই। যাঁরা হৈ চৈ করে আসরের দিকে বিক্রম প্রকাশ করছিলেন, স্বস্থানে ফিরে এলেন শান্ত সুবোধ বালকদের মতন।

যেন যাদুদণ্ডে নিস্তব্ধ সভা।

গোবরবাবু মৌন ভঙ্গ করে শুধু বললেন, 'এবার আমরা গান শুনব।'

আর কোন মতান্তর নেই। চৌতালে আবার আরম্ভ হল শিব পশুপতির গান এবং সতীশ বাগচীর সঙ্গত।

এবার ধা ঠিক ঠিক মোকামে পৌঁছতে লাগল। আর কোন আপত্তি বা প্রতিবাদে আসর মাটি হল না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বিচারকমণ্ডলী। আর সেই সঙ্গে সঙ্গীতপ্রিয় শান্তিপ্রিয় শ্রোতারাও।

শিব পশুপতির আরো একটি আসরেও অশান্তি বেধেছিল। তবে অতদূর নয়। এবারে তাঁদের তাললয়ের কুটযুদ্ধের সামনে দাঁড়ান দুর্ধর্ষ পাখোয়াজী দুর্লভচন্দ্র। পাখোয়াজের বোলে আর 'ধা'-র প্রয়োগে তিনিই সে আসর বাঁচিয়েছিলেন। (তার বিবরণ 'সঙ্গীতের আসরে' ২০৫-২০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

এমনি অশান্তির মধ্যে শিব পশুপতির সঙ্গীতজীবন কলকাতায় আরম্ভ হয়েছিল। তবে তা শান্ত হয়ে আসে কালক্রমে।

কলকাতার সঙ্গীতসমাজে বাস করতে করতে বাঙালী গুণীদের সঙ্গে মেলামেশায় তাঁরা ঘনিষ্ঠ হতে থাকেন। আসরে আসরে যোগ দিয়ে এখানকার সঙ্গীতসমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যান স্বাভাবিকভাবেই। বাঙালী গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক লাভ করেন। বেশির ভাগ বাঙালীদের নিয়েই গড়ে ওঠে তাঁদের শিষ্যমণ্ডলী।

তারপর জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁরা কলকাতারই স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। দুই সহোদরের অটুট আত্মীয়তা ছিল বরাবর। একসঙ্গেই

বাস করতেন তাঁরা উত্তর কলকাতার দর্জিপাড়া অঞ্চলে। কেবল কিছুদিন শোভাবাজার রাজবাড়িতে পশুপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন।

অনেক সময় একই শিষ্যকে শিক্ষা দেন দুজনেই। যেমন—সুধীন্দ্রনাথ মজুমদার। আর পশুপতি সেতার সুরবাহার-বাদক বলে আলাদা সেতারে শিক্ষা দিতেন। তাঁর শিষ্য সেতারবাদক বিজয়দাস পাকড়ে। সুধীন্দ্রনাথ ও বিজয়দাস ভিন্ন তাঁদের অন্যান্য শিষ্যদের নাম এখানে একত্রে উল্লেখ করা হল— সতীশচন্দ্র দে, ললিতমোহন দাস, ডঃ সুধাময় বসু, অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়, অনিলকৃষ্ণ রায়, লক্ষ্মীকান্ত উপাধ্যায়, পশুপতি রায়চৌধুরী, গোপালচন্দ্র লাহিড়ী, দুর্গাচরণ বিশ্বাস, সীতাংশুকান্ত আচার্য চৌধুরী প্রভৃতি।

কলকাতায় শিব পশুপতির প্রতিষ্ঠালাভের জন্যে শোভাবাজার রাজবাড়ির রাধাকৃষ্ণ দেব, সৌম্যেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব অনেক আনুকূল্য করেছিলেন। তাঁরা দুজনেই কলকাতার সঙ্গীত সমাজভুক্ত হয়ে থাকেন জীবনের শেষ পর্যন্ত। এবং বংশানুক্রমে।

পশুপতি ছিলেন নিঃসন্তান। কিন্তু শিবসেবকের তিন পুত্র রামকিষণ, ভবানীসেবক ও বিষ্ণুসেবকও বাংলানিবাসী হয়ে যান। তাঁরা তিনজনেই বংশের যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। রামকিষণের শিক্ষা পিতার চেয়ে জ্যেষ্ঠতাত পশুপতির কাছেই হয় বেশি। তাছাড়া বাল্যকালে পিতামহ রামসেবকের তালিমও তিনি ক'বছর পেয়েছিলেন। রামকিষণ ও ভবানীসেবক কলকাতার সঙ্গীতসমাজে সুপরিচিত গায়ক ছিলেন আমৃত্যু। কনিষ্ঠ বিষ্ণুসেবক পরিণত বয়সে আজও বর্তমান আছেন।

পশুপতি ও শিবসেবক এগারো-বারো বছর কলকাতায় ছিলেন। নিয়মিত নানা আসরে যোগ দিয়ে, বহু বাঙালী শিষ্য গঠন করে, বাংলার রাগসঙ্গীত প্রচারে সহায়ক হয়েছিলেন তাঁরা। শিবসেবকের দ্বিতীয় পুত্র, প্রতিভাবান ভবানীসেবক কিন্তু অল্পায়ু ছিলেন। তাঁর অপর দুই পুত্র রামকিষণ ও বিষ্ণুসেবকের ছাত্ররাও বাঙালী।

এই ভাবে দেড়শ বছরের প্রাচীন সেই প্রসদ্দু মনোহর ঘরানার উত্তরাধিকার এসে যায় বাংলায়।

এই ঘরের লয়কারীর একটি দর্শন ছিল। এ ঘরানার একজন যে গুণী খেয়ালগায়করূপে প্রসিদ্ধ রামকিষণ মিশ্র সেই দর্শনের ব্যাখ্যা করতেন এইভাবে—লয়ের জন্যেই সুরের অস্তিত্ব থাকে।—সুরে প্রাণ সঞ্চার করে—লয়। রাগ শুদ্ধ রেখে তার ভাবরসকে ফুটিয়ে তোলে। লয়ের সব কঠিন কাজ রাগের রস বিকশিত করবার অলঙ্কার ভিন্ন আর কিছু নয়। লয়ের দুরূহ কারুকর্মে শ্রোতারা বিরক্ত হবেন কেন? যদি তাঁদের বিরক্তি আসে, তাহলে গায়কের অপটুত্বই দায়ী—লয়কারী নয়। একটি সুরে অনেকক্ষণ স্থিত হলে একঘেয়ে ভাব আসে। সুরকে প্রাণবন্ত করে তার গতি, তার বিক্ষেপ। মন্দ গতি, দ্রুত গতি। কখনো একটি সুর থেকে মাঝের শ্রুতি দ্রুত স্পর্শ করে চলা। অর্থাৎ মীড় দিয়ে গানের সৌন্দর্য ফোটানো। লয়কে বাদ দিয়ে কিছু করা যায় না।...

সেই লয়কারীর কলাবত ছিলেন শিব পশুপতি। কলকাতার সঙ্গীতসমাজে লয়ের এমন সূক্ষ্ম কারুকর্ম তাঁরা দেখিয়ে গেছেন যা তাঁদের দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। অবশ্য তা-ই তাঁদের একমাত্র সাঙ্গীতিক পরিচয় নয়। তাঁদের শুদ্ধ রাগরূপের সাধনায়, রাগ-সঙ্গীতের নানা রীতির চর্চায়, পদ্ধতিগত শিক্ষাদানে একনিষ্ঠ সঙ্গীতসেবায় সমৃদ্ধ করে যান বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্র। তাঁরা যতদিন জীবিত ছিলেন সঙ্গীতজগতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুতে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ ঠিক সমযোগ্য হননি তাঁদের কোন উত্তর-সাধক।

তাঁরা প্রথম যখন এসেছিলেন দুজনেই বেশ স্বাস্থ্যবান ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘায়ু লাভ করেননি কেউই। পঞ্চাশও অতিক্রম করতে পারেননি। প্রথমে বিগত হলেন পশুপতি।

সেই শোকে শিবসেবক বিহ্বল হয়ে পড়লেন। ক্রমেই হারিয়ে

ফেললেন আসরে আসরে যোগ দেবার স্পৃহা। প্রিয় ভ্রাতা, শিক্ষক, সঙ্গীতের আজীবন সহযোগী, বহু দিনের বহু অভিজ্ঞতার সুখদুঃখের একান্ত সঙ্গী চলে গেলেন। এই মনস্তাপ আর সহ্য করতে পারলেন না শিবসেবক। হতাশায় ক্রমে শয্যাশায়ী হলেন। আর দেড় বছরের মধ্যেই তাঁর সব দুঃখের অবসান ঘটে গেল। সেই ৭১।১ কালীপ্রসাদ দত্ত স্ট্রীটের বাড়িতে।

একটি তানপুরা ১৯৩১ সালের শেষ দিকে স্তব্ধ হয়েছিল। আর একটি নীরব হল ১৯৩৩ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি।

সেতারে তিনপুরুষ

বামাচরণ ভট্টাচার্য
জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য

'জিতেন, আজ শশী অধিকারীর দল এসেছে রাণাঘাটে।'

মামাতো ভাই কুমার ছুটে এসে খবরটা দিলে। যাত্রা শুনতে তার ভারি উৎসাহ। জিতেনকে সঙ্গী পেলে ভাল হয়। তাই বললে, 'খুব ভাল যাত্রা হবে রে, চল্ এই বেলা বেরিয়ে পড়ি।'

কিন্তু জিতেনের আগ্রহ নেই যাত্রায়—'না, আমি যাত্রা শুনব না। তুই যা।'

কুমার তখন বুঝিয়ে বলে, 'এ অন্য যাত্রার মতন নয় রে। শশী অধিকারী মস্ত বড় বেহালা বাজিয়ে। আজ আসরে শশী অধিকারী নিজে বাজাবে। শুনলে বুঝবি সে কি বাজনা।'

কুমারের এই কথায় কাজ হল।

'তাই নাকি? তাহলে যাব।'

তৎক্ষণাৎ জিতেন রাজি। ভাল বাজনা পেলে আর কিছু চায় না সে। বিশেষ বেহালা।

এ বাজনা তার বড় প্রিয়। এ যন্ত্র সে নিজে বাজায়। সবই শুনে শুনে বাজানো। যে সুর ভাল লাগে, যে গান পছন্দ হয়, সেটি বেহালায় তুলে নেয়।

আবার কারুর বেহালা বাজনা শুনলেও সে বাজাতে পারে তেমনি।

শুধু বেহালা কেন, বাঁশিও। অমনি নিজে নিজেই বাঁশি বাজাতে শিখেছে। বাঁশিতেও বাজায় গানের সুর। তাঁর বাঁশির মিষ্টি সুর

শুনে ভাল লাগে সকলের। ছেলেমানুষ হলে কি হয়, সুরবোধ তার জন্মগত।

বেহালা আর বাঁশি। এই দুই যন্ত্র বাজিয়েই তার সারাদিন কেটে যায়। রাণাঘাটের সবাই সেজন্যে চেনে জিতেনকে। পুরো নাম জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

বয়স তখন কত হবে? বারো তেরো বছরের বেশি নয়। তার বাবার জন্যেও সকলে জানে তাকে।

বামাচরণ ভট্‌চায্যির ছেলে জিতেন। সমস্ত রাণাঘাট অঞ্চল জুড়ে কি সুনাম বামাচরণের। কত বড় সেতারবাজিয়ে তিনি। শুধু রাণাঘাট কি নদীয়াতেও নয়। বাঙালীদের মধ্যেই তখন এমন গুণী সেতারী বেশী নেই, যদিও পেশাদার সেতার বাজিয়ে নন বামাচরণ। কিন্তু শিখেছেন দস্তুর মতন। আসরে পেশাদার কলাবতের তুল্যই বাজান।

অথচ পৈতৃক বৃত্তিতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তিনি। বলা যায় পাণ্ডিত্য ব্যবসায়ীও। সেই সূত্রে ময়ূরভঞ্জ রাজদরবারের সভাপণ্ডিত। ময়ূর-ভঞ্জ রাজবংশ পুরুষানুক্রমে সঙ্গীতানুরাগী, সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষক। বামাচরণেরও সঙ্গীতগুণের আদর আছে সেখানে। ময়ূরভঞ্জ দরবারে তাঁর সেতারের আসর হয়।

বাংলার আরো কটি গুণী-পোষক দরবারে বাজান বামাচরণ। নাড়াজোল রাজার সভাতেও তাঁর অনেক আসর হয়েছে। এখানেই তো একদিন তাঁর সেতার শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান মুরাদ আলী খাঁ। সেকালের মহাগুণী শরদী তিনি। একালের বিখ্যাত শরদ-বাদক হাফিজ আলীর সম্পর্কে জ্যেঠা মুরাদ আলী। সেদিন তিনি তো বামা-চরণকে কোন মুসলমান ওস্তাদ ভেবেছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছদ্মবেশী যেন। ('আসরের গল্প' বইয়ের 'শিল্পী বড়' অধ্যায়ে পৃঃ ১২৮-১৩৮—সে কাহিনী বর্ণনা করা আছে)।

মেদিনীপুরের তেমনি আরেক জমিদারী পঞ্চেৎগড়। সে বংশের

যাদবেন্দ্রনন্দন মহাপাত্রও বামাচরণের এক ছাত্র। সেতারযন্ত্রে পঞ্চেৎ-গড়েও আসর করেছেন বামাচরণ। যাদবেন্দ্রনন্দন সেনীয়া বীণ্‌কার, রামপুর দরবারের উজীর খাঁর কাছে সুরবাহারও শিখেছিলেন।

ময়ূরভঞ্জ, নাড়াজোল, পঞ্চেৎগড়—এইসব দরবারে অনেক সময় থাকতে হয় বামাচরণকে।

আর রাণাঘাটে এলেই তাঁর আসর বসে পালচৌধুরীদের জলসা-ঘরে। তেমনি গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় ভবনে।

সেতারী বামাচরণ নেশায়। আর পেশায় পণ্ডিত বংশের ধারায় শাস্ত্র চর্চা। কিংবা তেমন তেমন বাড়িতে যজমানিও।

রাণাঘাটে যখন মাঝে মাঝে আসেন, তাঁর সেই মাটির ঘরের দাওয়ায় ছোটখাটো টোল বসে যায়। সংস্কৃত পড়ুয়ারা। ন্যায়-শাস্ত্রের পাঠ নিতে আসে তাঁর কাছে। শুধু রাণাঘাট বা কাছাকাছি অঞ্চলের নয়। বাংলার বাইরে থেকেও উপস্থিত হয় বিদ্যার্থীরা। পণ্ডিত বলে এত নামডাক তাঁর এবং পিতৃপিতামহেরও ছিল।

বামাচরণের পূর্বপুরুষদের আমল থেকে এ বংশে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি রীতিমত। তাঁর পিতা হলেন রামকমল শিরোমণি। বিশেষ করে দর্শনের শাস্ত্রজ্ঞ তিনি। তাঁর কাছেই বামাচরণ দর্শন ও ব্যাকরণের শিক্ষা প্রথমে পান। তারপর কাশী যান বেদ পাঠ করতে। সেখানে উপরন্তু সঙ্গীতের শিক্ষাও পেয়েছিলেন, কারণ বহু হিন্দু অপেশাদার গুণীর তখন অধিষ্ঠান ছিল কাশীতে।

বারাণসী থেকে বামাচরণ ফিরে আসেন রাণাঘাটে। কিন্তু ক্রমে শাস্ত্রচর্চার চেয়ে সঙ্গীতই তাঁর বেশী প্রিয় হয়ে ওঠে। আর প্রধানও। তবে বজায় রেখেছিলেন পণ্ডিত বংশের ধারা। সঙ্গীতের সঙ্গে বিদ্যা-চর্চারও অনাদর তিনি করেননি। তাই রাণাঘাটে এলেই তাঁর কাছে আনাগোনা আরম্ভ হত শিক্ষার্থীদেরও।

সকালে বিকালে বামাচরণ সংস্কৃত পড়ুয়াদের নিয়ে বসতেন। আর সন্ধ্যের পর যোগ দিতেন সঙ্গীতের আসরে। পালচৌধুরীদের

জলসাঘরে। গোবরডাঙ্গা মুখোপাধ্যায় পরিবারের সভায়। আরো নানা সঙ্গীতাসরে।

তবে রাণাঘাটে আর কদিন দেখা যায় বামাচরণকে। ময়ূরভঞ্জ, নাড়াজোল, পঞ্চেৎগড়, গোবরডাঙ্গা, এমন কি ময়মনসিংহের মুক্তা-গাছাতেও তাঁকে যাতায়াত করতে হয়। মাঝে মাঝে কলকাতাতেও।

আর জিতেন্দ্রনাথের বাল্যজীবন কাটে রাণাঘাটে। পিতার দৃষ্টির আড়ালে। তাঁর শিক্ষা আর তত্ত্বাবধানের বাইরে। বামাচরণের একমাত্র সন্তান তিনি। পণ্ডিত বংশের উত্তরাধিকারী। তবু তার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা কিছু হল না।

ঘরে শুধু জননী। জিতেনকে দেখাশোনা করবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই সংসারে। সুতরাং লেখাপড়া তার বিশেষ এগোয় না। কারণ মনও নেই পুঁথি বিদ্যার দিকে। স্বাভাবিক, ঐকান্তিক প্রবণতা সঙ্গীতে। সেই টানেই তার দিন কাটতে থাকে। বেহালা বাজিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে। পণ্ডিত বংশের ছেলে হয়েও বিদ্যাচর্চার সঙ্গে সম্পর্ক-হীন। মন শুধু গান বাজনায় মত্ত।

এমনি একদিন শশী অধিকারীর যাত্রাদল রাণাঘাটে উপস্থিত। বামাচরণ তখন ময়ূরভঞ্জে। এখানে অধিকারী মশায়ের দল তিন দিনের বায়না পেয়েছে। সে খবর ছড়িয়ে পড়েছে লোকের মুখে মুখে।

সেদিন যাত্রার প্রথম আসর। মামাতো দাদা কুমারের সঙ্গে যাত্রা শুনতে গেল জিতেন। যাত্রার চেয়ে বেহালার টানেই বেশি।

তখন সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। যাত্রার আসরে লোক হয়েছে বেশ। শুধু আশপাশের গ্রাম থেকে নয়, অনেক দূর দূর অঞ্চলের মানুষও এসেছে। এখনো আসছে দলে দলে। শশী অধিকারীর যাত্রা শুনতে কি আগ্রহ সবাইকার। প্রকাণ্ড শামিয়ানার নীচে কেবল কালো কালো মাথার সারি। সকলে জায়গা দখল করে বসেছে।

জিতেন আর কুমার অতি কষ্টে বসল, আসরের মাঝখানটির কাছাকাছি। কারণ জিতেনের বড়ই ইচ্ছে শশী অধিকারীর খুব কাছ

থেকে তাঁর বেহালা শোনা। কেমন করে তিনি যন্ত্র নিয়ে বসেন। ছড় টানেন কিভাবে। কিরকম করে তাঁর আঙুল চলে। তাঁর বাজনা হবে যাত্রার আগে। তাই সে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু কোথায় শশী অধিকারী? আসর ভরা দর্শক। দেখতে দেখতে মহা হৈ চৈ আরম্ভ হয়ে গেল, অধিকারী মশায়কে এখনো না পেয়ে। যাত্রা শুরু করবার জন্যে অনেকেই চিৎকার করতে লাগল। অধৈর্য হয়ে উঠল তারা। এখনো অধিকারীর দেখা নেই। তিনি এসে আগে বাজাবেন বেহালা। তারপর তো যাত্রা—সে কখন হবে।

আরো খানিক পরে একজনকে আসতে দেখা গেল আসরের মাঝখানটিতে। অতি সাধারণ তাঁর চেহারা। পরনে খাটো কাপড়। গলায় উড়নি জড়ানো। খালি গা। সঙ্গে একটি ছোকরা, তার হাতে বেহালার বাক্স।

সেদিকে দেখিয়ে কুমার বললে, 'ওই শশী অধিকারী।'

আসরে তখনো হট্টগোল চলেছে। অধিকারী মশায় বসে বেহালাটি বার করলেন বাক্স থেকে। তাঁর এক পাশে বাঁয়া তবলা নিয়ে তবল্‌চী বসল। আরেক দিকে হারমোনিয়াম নিয়ে একজন।

বেহালার ছড়টিতে রজন ঘষে, শশী অধিকারী চারটি তারের সুর বেঁধে নিলেন। তারপর ছড়ের একটি লম্বা টান দিয়ে আরম্ভ করলেন বাজনা। রাগের আদল একটু দেখিয়েই ধরে নিলেন গৎ। তবলায় ঠেকার বোল্ উঠল।

আর সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল আসরের হৈ চৈ। যেন যাদু কাঠির স্পর্শ। কি সুরেলা সেই ছড়ের টান। কি মিষ্টি তাঁর আঙুলের টিপ। একটু আগেও যাঁরা সোরগোল তুলেছিল, এখন তারা যেন মন্ত্রমুগ্ধ। বাজনায় তন্ময় হয়ে গেছে জিতেন্দ্রনাথ। এমন বেহালা, এমন সুর আগে সে কোনদিন শোনেনি।

তার জানা ছিল না—জয়জয়ন্তী রাগে সিদ্ধ শশী অধিকারী

কিন্তু অনেকে জানত—আসরে যত হট্টগোল হোক, জয়জয়ন্তী শুনিয়ে তিনি তা নিস্তব্ধ করে দিতে পারেন। এখানেও হল তাই।

একমনে জিতেন বাজনা শুনতে লাগল। আর গতের বন্দিশটি আঁকা হয়ে গেল তার চিত্তপটে।

আসর মাৎ করে দিয়ে একসময় শশী অধিকারী বাজনা শেষ করলেন। আর গৎখানি মনের মধ্যে ভরে জিতেন চলে এল আসর থেকে। যাত্রা শোনবার জন্যে আর সে বসে রইল না।

পরের দিন সেই জয়জয়ন্তী মক্‌শ করতে লাগল নিজের বেহালায়। অধিকারী মশায়ের বাজনার সকরুণ রেশ জিতেনের সমস্ত মন ছেয়ে ছিল। এ সুর ঠিক ঠিক না বাজাতে পারলে স্বস্তি পাবে না নিজেই। কালকের মতন বাজনা হাতে তুলতেই হবে। সেই শোনা সুর আর গৎ যতক্ষণ না মনের মতন হল, অক্লান্ত হয়ে সে সাধতে লাগল যত্নে। প্রায় সারাদিন এইভাবে তার কাটল।

তারপর সন্ধ্যের আগেই আবার গেল যাত্রার আসরে। কুমারকে আর যাবার কথা বলতে হল না। সেদিনও আসরে তেমনি হট্টগোল। তার মধ্যেই শশী অধিকারী পুনরায় বাজালেন সেই জয়জয়ন্তী। অত হৈ চৈ অমনি একেবারে থেমে গেল।

পর পর দুদিন শুনে বন্দিশটি গাঁথা হয়ে রইল জিতেনের মনে। তবে আজ সে শুধু সুরের দিকেই মন দিলে না। কাল সুরের দিকে লক্ষ্য রাখতে আর কিছু দেখেনি সে। আজ শশিভূষণের হাতের টিপ, বেহালা ধরা আর ছড় টানবার কায়দা একদৃষ্টে দেখতে লাগল।

তারপর বাজনা শেষ হতেই ফিরে এল আসর থেকে। অধিকারী মশায়ের বাজনা শোনবার জন্যেই তো এখানে আসা। কি বেহালাই বাজালেন তিনি! ভাগ্যে কুমারের কথায় সে এসেছিল! এ বাজনা না শুনলে তার ধারণাই হত না কত মিষ্টি হতে পারে বেহালার সুর।

পরের দিনও জিতেন আসরে হাজির হল। আজ সে এসেছে

আরো আগে। এখানে আজই শশীবাবুর শেষ বাজনা। তাই আসরের খুব ভাল জায়গায় বসেছে জিতেন। একেবারে সামনে থেকে সে বাজনার সব খুঁটিনাটি দেখবে শুনবে। আগেই এনে রাখা হয়েছে অধিকারী মশায়ের বেহালার বাক্স। তিনি পরে উপস্থিত হবেন।

রাণাঘাটে আজ তাঁর যাত্রার শেষ আসর। তাই ভিড় হয়েছে আগের দুদিনের চেয়েও বেশি। সবাই চেয়ে আছে প্রবেশপথের দিকে—কখন তিনি আসবেন।

কিন্তু খানিক পরেই যা খবর এল, বড় মুস্কিলের ব্যাপার। শশীবাবুর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসে গেছে। শয্যাশায়ী তিনি। এত জ্বর নিয়ে এসে বাজাবেন কি করে? তবে ম্যালেরিয়া জ্বর। খানিক পরে ছেড়ে যেতে পারে। তাই দেরি হলেও হয়ত আসা সম্ভব হবে একসময়। এখন সকলে যদি ধৈর্য ধরে থাকেন তাহলেই ভাল। উপায় কি?

সেকালের পল্লী অঞ্চলে এমন পরিস্থিতি মাঝে মাঝে হত। নট এবং দর্শককুল উভয়তই ছিল এ ধরনের অভিজ্ঞতা।

তবে তাঁর আসা পর্যন্ত আসর সামলে রাখতে হবে। সে এক মহা দায়। শ্রোতারা ফিরে চলে যাবে না বটে। কিন্তু হৈ হল্লা করতে ছাড়বে না। এখনই চিৎকার করছে কেউ কেউ—ব্যায়লা শুনব। ব্যায়লা শুনব। কোথায় শশী অধিকারী?

উদ্‌যোক্তারা অনেক চেষ্টাতেও তাদের শান্ত করতে পারছেন না। ক্রমেই বাড়ছে গোলমাল।

অধিকারী মশায়ের কাছে বার কয়েক লোক গেল। কিন্তু এখনো তাঁর উঠে দাঁড়াবার মতনই নয় অবস্থা। আসরে বাজাতে আসা তো দূরের কথা।

জিতেন আর কুমারও ব্যাপারটা শুনেছিল। আর জিতেনের হাত নিস্‌পিস্ করছিল বেহালার বাক্সটার দিকে চেয়ে। কিন্তু বেশিক্ষণ

আর ধৈর্য রইলো না। কুমারকে কানে কানে তার জানালে মনের ইচ্ছেটা—

'হ্যাঁ রে, বাজাব আমি? একবার জিজ্ঞেস করে দেখ্ না।'

কুমারেরও মহা উৎসাহ। সে তখনি আবেদনটা পেশ করলে কর্তা-ব্যক্তিদের কাছে।

তাঁরা প্রথমে রাজি হলেন না। এতটুকু ছেলে আবার বাজাবে কি, এত বড় আসরে?

কিন্তু কুমার বললে, 'আচ্ছা দেখুন না পারে কিনা। আর না হলে হট্টগোল তো থামাতেও পারবেন না। জিতেন বাজালে আর ক্ষতিবৃদ্ধি কি?'

উদ্‌যোক্তারা সম্মতি দিলেন অগত্যা।

তখন অধিকারী মশায়ের যন্ত্রটি বাক্স থেকে জিতেন বার করলে। সুর বেঁধে নিলে হারমোনিয়মের সঙ্গে। দু-চার বার ছড় টেনে টিপও ঠিকঠাক করলে।

তারপরই আরম্ভ হয়ে গেল তার বাজনা।

দর্শকদের মধ্যে রাণাঘাটের সবাই তো জিতেনকে চেনে। খানিকটা কৌতূহলে আর নতুনত্বের আশায় গোলমাল থেমে এল। আসরের অনেকেই মন দিলে এদিকে। আসরে বসে এইটুকু ছেলে বেহালা বাজাচ্ছে! বাঃ, এ তো বেশ!

কিছুক্ষণ শুনতেই বাজনা ভালও লেগে গেল অনেকের। সেই জয়জয়ন্তীর গৎটিই জিতেন ধরেছে। এই দুদিন বাজিয়ে বেশ দুরস্তও হয়েছে গৎখানি। তাছাড়া হাত তো ছিলই। সুরটাও বড় পছন্দ হয়েছিল তার নিজের। খুব মন দিয়েই সে বাজাচ্ছিল।

সুতরাং অনেকের বেশ ভালই লাগছিল বাজনা। আসরও বেশ জমে উঠল।

শুনতে শুনতে কতক্ষণ যে পার হয়ে গেছে, খেয়াল ছিল না কারুর।

হঠাৎ দেখা গেল, জিতেনের পিছনে দাঁড়িয়ে শশী অধিকারী। মাথায় গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে, একজনের কাঁধে হাত রেখে তিনি বাজনা শুনছেন।

আশ্চর্য হয়ে গেছেন অধিকারী মশায়। ছেলেটি তাঁরই যন্ত্র বাজাচ্ছে, সেজন্যে রাগ করতেও ভুলেছেন। তাঁর নিজেরই জয়-জয়ন্তী বাজিয়ে চলেছে—এ কে? একটু এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে বটে। তান-টানও অন্য রকমের হচ্ছে। কিন্তু হাত তো মিষ্টি। যা-ই বাজাক, সুরেলা টিপ্।

বাজনা শেষ হতেই জিতেনকে কোমল-কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে বাবা? কোথায় থাকো? কার ছেলে তুমি?'

তার হয়ে অন্যেরাই পরিচয় দিলে, 'সেতারী বামাচরণবাবুর ছেলে। ওর নাম জিতেন। ভট্‌চায্যি মশায়ের এই একটিই ছেলে।'

তারপর জিতেনকে বললে, 'এঁকে প্রণাম করো। ইনিই অধিকারী মশাই।'

'তুমি বামাচরণবাবুর ছেলে? শুনে বড়ই আনন্দ হল। বেশ বেশ।'

প্রণত জিতেনকে শুভাশীষ জানিয়ে শশিভূষণ বললেন, 'অত বড় গুণীর ছেলে তুমি। আর কি বলব। আশীর্বাদ করছি, তোমার হবে। তুমি এখন বাজাও, যেমন বাজাচ্ছিলে।'

তারপর আসরের শ্রোতাদের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনারা আজ আমায় ক্ষমা করুন। শরীর বড়ই দুর্বল। আজ বাজাতে পারছি না। তবে বামাচরণবাবুর এই ছেলে আসর ঠিক রেখে দেবে।'

এমনি করে সেই বালকের সঙ্গীত-জীবনের উদ্বোধন হল সেদিন। শশী অধিকারীর আশীর্বাদ শিরোধার্য করে। রাণাঘাটে এক যাত্রার আসরে। অন্য যন্ত্রে।

তবে সে জিতেন্দ্রনাথের অঙ্কুর মাত্র। তার সহজাত প্রতিভার একটি আভাস। তবু সেকালের এক গুণীজনের তা দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল। আর সে প্রতিশ্রুতিকে তিনি জানিয়েছিলেন অন্তরের স্বীকৃতি।

কিন্তু সে কিশোর প্রতিভার বিকাশ অন্য যন্ত্রের মাধ্যমে হয়েছিল। বেহালা নয়, বাঁশিতেও নয়। যদিও তখনো পর্যন্ত প্রাণের সুর অবলম্বন চাইত কখনো বেহালা, কখনো বাঁশিতে।

সে সময় অনেক দিন পরে পরে বাড়ি ফিরতেন বামাচরণ। ছেলের বাঁশি দেখে রাগ করতেন, বকতেন, 'কেবল বাঁশি বাজাবি তুই! আর আমার সেতারের কি হবে? কত কষ্ট করে শিখেছি। কত ওস্তাদের কাছে পেয়েছি। অন্য লোককে শেখাতে যাই সেতার। আর আমার ছেলে হয়ে তুই বাঁশি নিয়ে থাকবি?'

এবার তিরস্কার করতে গিয়েই বামাচরণের হয়ত মনে হল—দোষ তো জিতেনের নয়। আমিও তো ওকে শেখানো আরম্ভ করিনি। বাইরে বাইরেই থাকি। জমিদারদের আসরে দরবারে বাজিয়ে দিন কাটে। শেখাতে যাই পঞ্চেৎগড়ে। সম্বন্ধী অম্বিকাচরণকেও তো শেখাই। কিন্তু জিতেনকে শেখাবার কথা কোনদিন মনেও হয়নি। দোষ তো আমারই।

হয়ত তাঁর মনে হত, জিতেন এখনো বড় হয়নি।

কিন্তু, না, আর সময় নষ্ট নয়। হিসেব করে দেখলেন জিতেনের বয়স এখন বারো বছর। লেখাপড়াও তো কিছু হচ্ছে না। এবার আরম্ভ করুক সেতার। সংস্কৃত শেখা ওর দ্বারা হবে না। তার চেয়ে বরং বাজনাই শিখবে ভাল।

এবার বামাচরণ ছেলেকে রীতিমত শেখাতে আরম্ভ করলেন।

তখন পঞ্চাশ পার হয়েছেন তিনি। নিজের পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা আর সাধনলব্ধ বিদ্যা পুত্রকে দিতে লাগলেন বেহালায় নয়, বাঁশিতেও নয়। সেতার ধরালেন জিতেনকে।

বামাচরণ নিজে শিখেছিলেন অনেক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে। বহু শ্রমে উদ্‌যোগে সঙ্গীত-শিক্ষার সুযোগ করে নেন। নানা ওস্তাদের কাছে, বিভিন্ন সূত্রে। কাশীতে তো ভাগ্যক্রমেই শিখতে পেরেছিলেন। আর বাংলায় তাঁকে আনুকূল্য করেন ক'টি উদার ধনী পরিবার। পণ্ডিত হিসেবে নানা জমিদার বাড়িতে ক্রিয়াকর্মে যেতেন। নিযুক্ত সভাপণ্ডিত ছিলেন ময়ূরভঞ্জ রাজসভায়। গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় পরিবারেও শাস্ত্রীয় ক্রিয়াদি করতেন। রাণাঘাটে পালচৌধুরীদের সঙ্গীতাসরের সঙ্গেও ছিল তাঁর যোগাযোগ। এইসব সূত্রে তাঁদের নিযুক্ত গুণীদের নিকটে বামাচরণের রাগবিদ্যা সংগ্রহ।

সেকালের অনেক ধনীদের এই এক গুণগ্রাহীতা আর পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। শুধু শিল্পীদের প্রতিই দাক্ষিণ্য করতেন না তাঁরা। প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদেরও দিকপাল কলাবৎদের কাছে শিক্ষার সুযোগ করে দিতেন।

এমনিভাবেই কজন ভারত-প্রসিদ্ধ গুণীর কাছে শেখেন বামাচরণ। যথা—সুরবাহার ও সেতারের ওস্তাদ মহম্মদ খাঁ। সেই ঘরেরই সাজ্জাদ মহম্মদ। খেয়াল-গায়ক আহম্মদ খাঁ। খেয়াল-গায়ক বড়ে দুন্নি খাঁ। সেনীয়া রবাবী-ধ্রুপদী বাসৎ খাঁ প্রমুখ। পালচৌধুরীদের জলসাঘরের দুই তওয়ায়েফ হিঙ্গনজান ও দিল্‌জানের কাছেও বামাচরণ সংগ্রহ করেছিলেন।

তবে বিশেষভাবে তিনি শেখেন মহম্মদ খাঁর কাছে। সুরবাহারের একজন আদি গুণী মহম্মদ খাঁ। লক্ষ্ণৌ থেকে খাঁ সাহেব তাঁর ওস্তাদ সাজ্জাদ মহম্মদের সঙ্গে বাংলায় এসেছিলেন। তানসেনের কন্যা-বংশীয় বীণকার ওমরাও খাঁ সুরবাহার যন্ত্রের প্রচলনকর্তা বলে কীর্তিত। এই যন্ত্র নির্মাণ করিয়ে তালিম দেন তিনি তাঁর ছাত্র গোলাম মহম্মদকে। ওমরাহ খাঁ নিজে কখনো সুরবাহার বাজাতেন না। প্রথম সুরবাহার-বাদক তাঁর শিষ্য গোলাম মহম্মদ। সাজ্জাদ

মহম্মদ তাঁরই পুত্র তথা শিষ্য। বামাচরণের ওস্তাদ মহম্মদ খাঁ প্রথমে কিছু শিখেছিলেন গোলাম মহম্মদের কাছে। তবে সাজ্জাদ মহম্মদের নিকটেই তিনি আসল তালিম পেয়েছিলেন। আর একসঙ্গেই তাঁরা আসেন বাংলায়।

সাজ্জাদ মহম্মদ এখানে বেশির ভাগ যতীন্দ্রমোহন, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরদের দরবারে থাকেন। শৌরীন্দ্রমোহন সাজ্জাদ মহম্মদের অন্যতম শিষ্য হিসেবে গণ্য।

সাজ্জাদ মহম্মদের কাছে বামাচরণও কিছু পেয়েছিলেন। একথা ভট্টাচার্য মশায় নিজে বলেছেন জিতেন্দ্রনাথকে। সাজ্জাদ মহম্মদের সেতার সুরবাহার বাজনা অনেকবার শোনবার সুযোগও বামাচরণ পান। কারণ রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রিয়পাত্র বলে তাঁর গতিবিধি ছিল পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির জলসাঘরে।

কলকাতায় শৌরীন্দ্রমোহনের তুল্য তাঁর আরেক গুণগ্রাহী ছিলেন, ঝামাপুকুর রাজবাড়ির কুমার নরেন্দ্র মিত্র। ঝামাপুকুরের এই সঙ্গীত-সভায় বামাচরণ অনেকবার গুণপনা দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা যায় একথা।

বামাচরণের তালিম পাবার কথা হচ্ছিল। সে ব্যাপারে তাঁর আসল ওস্তাদ হলেন সুরবাহারী-সেতারী মহম্মদ খাঁ। তাঁকেই ভট্টাচার্য মশায় সঙ্গীতগুরু হিসেবে মানতেন। জানাতেনও সকলের কাছে। বামাচরণ নিজের হাতে একটি সেতার যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। তার মধ্যে খোদাই করে রাখেন মহম্মদ খাঁর প্রতিকৃতি, ওস্তাদ বলে। আসরে সেই যন্ত্রটিই বামাচরণ বাজাতেন। শ্রোতারা দেখতেন তাঁর সেতারে নিজের হাতে গড়া মহম্মদ খাঁর আকৃতি। সেই যে নাড়াজোল রাজার দরবারে মুরাদ আলী খাঁর সঙ্গে বামাচরণের একটা বিবাদ হয়ে যায়? সে তো মহম্মদ খাঁকে কেন্দ্র করেই। মুরাদ আলী খাঁ কি একটা মন্তব্য করেছিলেন মহম্মদ খাঁর বিরুদ্ধে। শুনে চুপ করে থাকেননি বামাচরণ। ওস্তাদের পক্ষে মুরাদ আলীকে দস্তুরমত

প্রতিবাদ করে ওঠেন। আর নিজের গুণপনা দেখিয়ে স্বীকৃতি আদায় করেন ওস্তাদের শিক্ষা আর বিদ্যারও।

মহম্মদ খাঁর অপর বিখ্যাত শিষ্য জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। গোবরডাঙ্গার এই শৌখীন গুণী বাংলার এক সুপরিচিত সুরবাহার-বাদক। মহম্মদ খাঁর কাছে জ্ঞানদাপ্রসন্ন বিশেষভাবে সুরবাহারেরই তালিম নেন। কিন্তু বামাচরণ শেখেন সেতার ও সুরবাহার, বিশেষ সেতার।

মহম্মদ খাঁর আরেক শিষ্য ছিলেন ঢাকার উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী। গৌরীপুরের স্বনামধন্য সঙ্গীতপ্রেমী ও সঙ্গীততাত্ত্বিক ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর মাতুল উমেশচন্দ্র। ঢাকা থেকে যখন তিনি কলকাতায় আসতেন তখনই শিখতেন মহম্মদ খাঁর কাছে। গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় পরিবারের কলকাতা ভবনে।

বামাচরণই মহম্মদ খাঁর একমাত্র দরিদ্র শিষ্য। কিন্তু সেতারী হিসেবে তিনিই সবচেয়ে ঐশ্বর্যবান। কলাকার-রূপে ওস্তাদের কেতন উড্ডীন রাখেন সঙ্গীত-সমাজে। মহম্মদ খাঁর সেতারের তালিম তিনি ভিন্ন আর কেউই পাননি।

আসরে বামাচরণ সেতার বেশি বাজাতেন বটে, কিন্তু সুরবাহারের চর্চাও করতেন। গানও গাইতেন তিনি। কজন নামী খেয়ালীয়াদের কাছে তো অনেক চীজ বন্দিশ নিয়েছিলেন। বাড়িতে গাইতেন সেসব। সঙ্গীত-কণ্ঠও ছিল তাঁর আবাল্য। তবে আসরে গাইতেন না।

তাঁর সাধনা ছিল সেতার সুরবাহারের মাধ্যমে। আর বড় বড় ধ্রুপদী খেয়ালীয়াদের কাছে গানের চর্চা সংগ্রহ করার ফলে তাঁর যন্ত্রসঙ্গীতও সমৃদ্ধ হয়েছিল, সন্দেহ নেই। বামাচরণের সেতারে হাত ছিল সুমিষ্ট, সুরেলা। রাগ-বিস্তার সঙ্গে তিনি লয়কারীতেও দক্ষতা দেখাতেন।

বামাচরণের সেতার বাজনার এই এক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, (সুরবাহারের মতন) পাখোয়াজের সঙ্গতে তিনি বাজাতেন তাঁর

পরণ। ভারি চালের বাজ ছিল তাঁর। সাজ্জাদ মহম্মদ খাঁর ধারায় সেই দীর্ঘ মীড়ের সঙ্গে সূক্ষ্ম অলঙ্করণ বামাচরণও প্রয়োগ করতেন।

বিশেষ সেতারে বামাচরণের তুল্য গুণী অল্পই ছিলেন তাঁর সমকালে বাংলায়।

সর্বসমেত চৌকশ গুণী বামাচরণ। একদিকে পৈতৃক বৃত্তিতে ন্যায়দর্শনে পণ্ডিত। আবার নিজের সাধনায় অধ্যবসায়ে আর ওস্তাদদের শিক্ষায় সেতার সুরবাহারে প্রথম শ্রেণীর কলাকার। সেই সঙ্গে কারুশিল্পীরূপে আপন হাতে সেতার যন্ত্রও প্রস্তুত করতেন। সে যন্ত্র দস্তুরমত বাজাতেন বড়বড় আসরে, ভারত-বিখ্যাত ওস্তাদদের সামনে।

তম্বুরার বদলে তাঁর সেই আদ্যোপান্ত কাঠের তৈরি সেতার— জিতেন্দ্রনাথও পরে বাজিয়েছেন। বাঁশির তুল্য সুরেলা তার ধ্বনি। কন্‌কনে, নিটোল আওয়াজ।

আরেক রকম শিল্পগুণ ছিল বামাচরণের। রেশমী বস্ত্রে সুনিপুণ পরিপাটি সূচীকর্ম। একবার একটি মুর্শিদাবাদী রেশমী শাড়িতে এত চমৎকার পুষ্প লতাপাতার সীবন-কার্য করেছিলেন যে তা একটি দ্রষ্টব্য শিল্প-নিদর্শন হয়েছিল। সেজন্যে ময়ূরভঞ্জ-রাজ হাজার টাকা পুরস্কার দেন তাঁকে।

এমনি নানাভাবে বামাচরণের নান্দনিক বোধ, সৌন্দর্যচেতনা আত্মপ্রকাশ করত। আর তাঁর এত গুণ সত্ত্বেও একপ্রকার দারিদ্র্য-ব্রত নিয়েই তিনি জীবন যাপন করে যান সেকালের সরল নির্লোভ ব্রাহ্মণদের জীবনাদর্শে।

জিতেন্দ্রনাথ শুধু তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভার উত্তরাধিকারী হলেন। অপর বিদ্যাচর্চার সঙ্গে সম্পর্ক রইল না তাঁর। পরে শুধু কিছু ব্যাকরণ ও কাব্য শিক্ষা পান পিতার কাছে। আর ওই সেতার সুরবাহার যন্ত্রেই পিতার ধারায় বিকশিত হতে লাগলেন।

এ বিষয়ে তবু তাঁর ভাগ্য ভাল যে সেই কিশোর বয়সেই তাঁকে

শেখাতে আরম্ভ করেন বামাচরণ। আর একাদিক্রমে বছরের পর বছর তা চলতে থাকে। রীতিমত, বিধিবদ্ধ সে শিক্ষাক্রম।

ভারতীয় রাগবিদ্যার চর্চা গুরুমুখী, অধ্যাত্ম-জীবনেরই তুল্য। এ বিদ্যা একান্তভাবে গুরুনির্ভর। পথপ্রদর্শক আচার্য তিনি। তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশে, সঙ্গলাভে গঠিত হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীর সঙ্গীত-জীবন। অবশ্য যোগ্যতা ও সাধনা ভিন্ন গ্রহীতার পক্ষে বিদ্যালাভও অসম্ভব। বিদ্যার্থীর নন্দন-গুণ ও অধ্যবসায় আবশ্যিক। তবেই সার্থক হতে পারে গুরুর শিক্ষা। এ ক্ষেত্রে গুরু পিতা হওয়ায় জিতেন্দ্রের আদর্শ বিদ্যালাভ হতে লাগল। লেখাপড়া না থাকায়, স্বাভাবিক প্রবণতা, শক্তি আর আসক্তিতে দ্রুত এগিয়ে চলল তাঁর যন্ত্রসঙ্গীতের সাধন।

বামাচরণ প্রণালী-সম্মত পাঠ দিতে লাগলেন—ক্রিয়া ও বিদ্যায় অঙ্গাঙ্গী। একযোগে পুত্রের সঙ্গে বাজাতে লাগলেন। জিতেন্দ্রের হস্তসাধন চলল সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তে।

বামাচরণ যখন রাণাঘাটের বাইরে যেতেন, বাজাবার জন্যে নির্দিষ্ট পাঠ দিতেন জিতেনকে। ফিরে এসে পরীক্ষা করতেন রিয়াজ ঠিক ঠিক হয়েছে কিনা। তাঁর উপস্থিতিতে যেমন, তেমনি এই সব অবকাশের সময়েও যেন বাজনা যথারীতি অভ্যাস হতে থাকে। সেদিকেও বামাচরণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

পিতার কাছে শিক্ষাই হয় না কেবল। কোন কোন আসরেও বামাচরণ পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যান। তাঁর পরিণত বয়সের সেই সব অনুষ্ঠান। সমঝদারদের সামনে, যোগ্য সঙ্গতকারদের সহযোগে কেমন সাজিয়ে বাজান বামাচরণ, মাৎ করে দেন আসর, সবেরই চাক্ষুষ হয় জিতেনের। শিক্ষার দিক থেকেও কম লাভ নয় যেমন আসরের বাজনা শোনা।

পিতার তেমনি কোন কোন অনুষ্ঠানের স্মৃতি তাঁর মনে গাঁথা রয়ে যায়। বহু বছর পরেও তার গল্প শোনাতেন নিজের প্রৌঢ় বয়সে।

যেমন ভৈরবসহায়ের সঙ্গে সেই আসরটি। কাশীর দুর্ধর্ষ তবলিয়া ভৈরবসহায়। 'বেনারসরাজ' প্রবর্তক রামসহায়ের ঘরানাদার তিনি। সেই বংশেরই দিকপাল. ভারতপ্রসিদ্ধ সঙ্গতকার। রামসহায়ের এক প্রধান শিষ্য ছিলেন তাঁর পিতৃব্যপুত্র ঈশ্বরীসহায়। ভৈরবসহায় হলেন সেই ঈশ্বরীসহায়ের পুত্র তথা শিষ্য।

রাণাঘাটে পালচৌধুরীদের জলসাঘরে সেবার মুজরো করতে এসেছেন ভৈরবসহায়। একক আসর তাঁর। বিশিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে আমন্ত্রিত বামাচরণও উপস্থিত।

ভৈরবসহায় লহরা বাজাতে লাগলেন। যেমন আশ্চর্য সাধা হাত, তেমনি অফুরন্ত বোলের ঐশ্বর্য। অকাট্য তাল-বোধ আর ছন্দ-লীলা—লয়কারী। বিন্যাসে কি অভিনব বৈচিত্র্য এই তালযন্ত্রে। তার সুগম্ভীর ধ্বনিসম্ভার যেন মেঘমন্দ্র নাদ। তবলা বাঁয়ায় বোল্ পরম্পরা পাখোয়াজের গাম্ভীর্যে মুখরিত হতে লাগল। আসর-মত্ত-করা অজস্র ছন্দের লহরী।

ভৈরবসহায়ের সে লহরা একসময় শেষ হল। 'সাবাস' 'সাবাস' রবে উচ্ছ্বসিত আসর কক্ষ।

সেই পরিবেশেই কথা উঠল—কোন যন্ত্রী আছেন এখানে, ভৈরব-সহায়ের সঙ্গে বাজাতে যাঁর হিম্মৎ হবে?

ভট্টাচার্য মশায় সামনেই বসে। অনেকেরই চোখ পড়ল তাঁর দিকে। অবশ্য শ্রোতা হিসেবে তাঁর এখানে আসা। এ আহ্বানে তিনি সাড়া দেবেন কি?

তাঁর নিজের মনেও শিল্পীর মর্যাদা জেগে উঠল। কিন্তু তিনি তো বাদক-রূপে আসেননি এ আসরে। সঙ্গে যন্ত্র নেই। এখন কি কর্তব্য, ভৈরবসহায়ের এই আহ্বানের সামনে?

জলসাঘরের কর্তাদের সঙ্গে কথা বললেন বামাচরণ। তাঁর বাজানোই সকলের ইচ্ছা। সুতরাং বামাচরণের নিজের সেতার আনবার ব্যবস্থা হল।

তিনি বাজনা আরম্ভ করলেন ভৈরবসহায়ের সঙ্গতে।

সে এক শোনবার মতন বাজনা বটে। এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেকালের আসরে মাঝেমাঝেই ঘটে যেত। সেদিন রাণাঘাটের সঙ্গে বাংলারও মান রাখলেন বামাচরণ। এমন ভারি চালের সেতার বাজনা। রীতিমত ধ্রুপদাঙ্গের বাজ। বারাণসীর তবলাগুণী এমনটি আশা করতে পারেননি বাংলা দেশে। তাও কলকাতায় নয়। এত দূরের এক আসরে।

ভৈরবসহায় বামাচরণের দস্তুরমত তারিফ করলেন। আর বাদকের নামটি স্মরণে রেখে ফিরে গেলেন কাশীতে। বামাচরণের বাজনার কথা ভৈরবসহায় কিরকম মনে রাখেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় অনেক বছর পরে। জিতেন্দ্রনাথের জীবনীতে সে বিবরণ দেওয়া হবে।

বামাচরণের রাগবিদ্যা-সংগ্রহ ছিল প্রচুর। বহুদিন ধরে বহু ওস্তাদের কাছ থেকে তিনি সঞ্চয় করেছিলেন। নানা অপ্রচলিত রাগেরও ভাণ্ডারী তিনি। এখন সেসবের উত্তরসাধক করতে লাগলেন পুত্রকে। প্রতিভাবান উত্তম আধার জিতেন্দ্রনাথ।

বামাচরণ বুঝেছিলেন অন্য কোন অর্থকরী বিদ্যালাভ জিতেনের হবে না। সঙ্গীতই হয়ে উঠবে তার জীবনের অবলম্বন। পুরুষানুক্রমে যেমন তাঁদের ছিল শাস্ত্রচর্চা, তেমনি জিতেনের হবে সেতারচর্চার বৃত্তি। সুতরাং সেই যন্ত্রসঙ্গীতের শিক্ষাই তার বিশেষ দরকার। আর নিজের আয়ুও শেষ হয়ে আসছে। তাই আরো তৎপর হলেন পুত্রকে প্রস্তুত করে দিতে।

তার বিষয়ে লক্ষ্য করে হয়ত তিনি আশ্বস্ত বোধ করতেন। সৃজনীশক্তি আছে জিতেনের। যথার্থ শিল্পীপ্রাণ। পাখির মতন কণ্ঠস্থ করে না কেবল। রাগের রূপ তার ধারণায় আসে। ডৌলটি দিলে, কাঠামোটি দেখালে, তার বিস্তারও খানিকটা করতে পারে সে। আর তার মনও সুরের সূক্ষ্মতায় সংবেদনশীল। সুরবোধ সহজাত।

হাত মিষ্টি। সাজিয়ে বাজাবার মতন সৌন্দর্যজ্ঞান, পরিমিতি-বোধও গড়ে উঠছে। রিয়াজ করে তন্ময় চিত্তে, নিজেরই মনের তাগিদে। যথেষ্ট পরিশ্রমীও।

সবই সুলক্ষণ। আশা-ভরসার কথা। কিন্তু এক চিন্তায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন বামাচরণ। বুঝতে পারেন, নিজের শরীর জীর্ণ হচ্ছে। আর কদিন টিঁকে থাকবেন, কে জানে। বয়স তো পঞ্চাশের কোঠার শেষদিকে। এদিকে বিস্তর রাগ এখনো আছে যা জিতেনকে শেখানো হয়নি। সেই সব দুর্লভ রাগ কত যত্নে কত কাল ধরে লালন সাধন রক্ষা করা। একমাত্র, সুযোগ্য বংশধরকে দিয়ে যাবার বড় ইচ্ছা। কিন্তু এত শেখাবার অবকাশ কি হবে এই শেষজীবনে?

এমনি ভাবনা থেকে এক উপায় স্থির করলেন। যেসব রাগ এখনো দিতে পারেননি জিতেনকে, স্বরলিপি করতে লাগলেন তাদের। রাগরূপ লিপিবদ্ধ করা। সেকালে এ রীতির তেমন চলন ছিল না। স্বর লেখায় যতখানি সম্ভব, একেকটি রাগের বিষয়ে নির্দেশ। তার আরোহণ অবরোহণের সঙ্গে পকড় এবং আওচারও।

জিতেনের হাত তৈরি হয়েছে বেশ। পথ ধরে নিতে পেরেছে। এইসব স্বরলিপি থেকে উদ্ধার করে নিতে পারবে আরো নানা রাগ, যা হাতে হাতে শেখাবার সুযোগ হবে না হয়ত।

পণ্ডিতেরা সেকালে পুঁথি লিখে রাখতেন। বামাচরণ তেমনি সঙ্গীত-লিপি লিখতেন পুত্রের জন্যে। তাঁর হস্তাক্ষর যেন 'মুকুতার পাঁতি'। জিতেন্দ্রনাথ পরম যত্নে বামাচরণের লিখিত সেই খাতাগুলি রক্ষা করেছিলেন।

যত লেখবার ইচ্ছা বামাচরণের ছিল, শেষ হল না সব। তার আগেই তাঁর ইহজীবনে ছেদ পড়ল। সেবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন ময়ূরভঞ্জ থেকে ফিরেই। আর দিন কয়েকের রোগভোগে পরলোক যাত্রা করলেন। বয়স হয়েছিল প্রায় ষাট। আনুমানিক ১৮৯৬ সালের কথা।

জিতেন্দ্রনাথ তখন উনিশ বছর বয়সী।

নদীয়া জেলার এই রাণাঘাট শহরে তাঁদের পূর্বপুরুষদের আমল থেকে বাস। সেখানেই জিতেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৭৭ সালে।

তাঁদের বংশানুক্রমিক সংস্কৃত চর্চার জন্যে ভট্টাচার্য উপাধি। কিন্তু পদবী ছিল চট্টোপাধ্যায়। কাশ্যপ গোত্র।

বামাচরণের সঙ্গেই শাস্ত্রচর্চা তাঁদের পরিবারে লোপ পেয়ে গেল। কিন্তু চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে স্থায়ী হল ভট্টাচার্য। আর জিতেন্দ্রনাথের সময় থেকেই রাণাঘাটে তাঁদের পুরুষানুক্রমিক বসবাসেরও পরিসমাপ্তি ঘটল।

বামাচরণের সঙ্গী হয়ে বিদায় নিয়ে গেল—সেকাল। জিতেন্দ্র-নাথের জীবনে একটি বড় অধ্যায় শেষ হল।

বামাচরণের যজমানী সম্পর্ক বা বাদক হিসেবে যোগাযোগ বেশ কটি জমিদারবাড়ির সঙ্গে ছিল বটে। কিন্তু তবু দরিদ্রই ছিলেন তিনি। সচ্ছল ভাবে সংসারী হবার ইচ্ছা বা লক্ষ্য তাঁর ছিল না। বিদ্যাচর্চায় নিযুক্ত থাকবার যে জীবনাদর্শ সেকাল পর্যন্ত পণ্ডিত বংশে ছিল, বামাচরণেরও তদ্রূপ। তাঁদের উপাধিরই তুল্য।

জিতেন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারের তালিকা তাই বাহ্যত অনাড়ম্বর, সংক্ষিপ্ত। মাটির কটি ঘর আর দালান। সামান্য সম্বল।

আর বামাচরণেরই নিজ হাতে প্রস্তুত, অপূর্ব আওয়াজী কাঠের সেতারটি। সেই সঙ্গে তাঁরই সুদর্শন হস্তাক্ষরে লেখা রাগপরিচয়ের খাতাপত্র। শাস্ত্রচর্চার পুঁথিপাঠটাও, অবশ্য রেখে যান বামাচরণ, কিন্তু পুত্র তার সদ্ব্যবহার করতে পারেননি।

জিতেন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় পৈতৃক সম্পদ লাভ হয় তাঁর শিল্পীচিত্তে। নন্দন-জীবনে। সেতার সুরবাহারের কুশলী বাদকরূপে। সুরজগতের বিচিত্র রসলোকের চাবিকাঠি বামাচরণ পুত্রকে পরম যত্নে দিয়ে যান। আপনার সারা জীবনের আহৃত সঙ্গীত-ঐশ্বর্য।

সুষমা-মণ্ডিত সঙ্গীত-জীবনে যাত্রাপথের পাথেয়। সুর-সাধনায় প্রতিষ্ঠালাভের মূলধন।

অবশ্য পিতার মৃত্যুতে তাঁর সঙ্গীতচর্চায় কিছু বাধা পড়ল। নানা সাংসারিক দায়-দায়িত্ব তাঁকে নিতে হল একমাত্র বংশধর হিসেবে। আরো কিছু কিছু অনিবার্য অসুবিধা। জিতেন্দ্রনাথ এবার কোন অর্থকরী কাজের জন্যেও তৎপর হলেন।

বলবার মতন লেখাপড়া তাঁর কিছু হয়নি বটে। তবে বিদ্যালয়ের ইংরেজী শিক্ষা সামান্য পেয়েছিলেন। সেই সূত্রে সচেষ্ট হলেন। অবশ্য তা সম্ভব হত না মাতুলালয়ের সহায়তা ভিন্ন। এ দুর্দিনে মাতুলরা নানাভাবে সাহায্য করলেন।

অবস্থাচক্রে জিতেন্দ্রনাথ একরকম উঠিয়ে দিলেন রাণাঘাটের বাস। একটি কাজের আশ্বাস পেয়ে মাতুলালয়ে চলে এলেন।

দক্ষিণে, চব্বিশ পরগণা জেলায় সে গ্রামখানি। মহকুমা বারাসত। তবে বামনগাছি রেল স্টেশনে নেমে পূব দিকে খানিক যেতে হয়। বড় জাগুলিয়া যাবার পথে সেই মুরুলি মণ্ডলগাঁতি গ্রাম। সংক্ষেপে বলে মণ্ডলগাঁতি।

সে গ্রামের এক সচ্ছল বর্ধিষ্ণু মুখোপাধ্যায় পরিবার জিতেন্দ্রনাথের মামার বাড়ি। মাতুলদের নাম আশুতোষ, প্রভাতকুমার, অম্বিকাচরণ, কেদারনাথ। তাঁরা সে অঞ্চলে সকলেরই পরিচিত। তাঁদের মধ্যে অম্বিকাচরণ ভগ্নীপতি বামাচরণের কাছে কিছু কিছু সেতার বাজনা শিখেছেন। অম্বিকাচরণেরই ছেলে কুমার। শশী অধিকারীর বেহালা শোনাতে যে নিয়ে গিয়েছিল জিতেনকে, রাণাঘাটে।

তাঁর মাতুলদের মধ্যে কেদারনাথ হলেন বারাসত আদালতের উকিল।

এই পিতৃহীন ভাগিনেয়কে তিনি নিজের মুহুরি করে নিলেন।

জিতেন্দ্রনাথ মণ্ডলগাঁতিতে সংসারযাত্রা আরম্ভ করলেন, মামার মুহুরিগিরি করে। বারাসত আদালতে যাতায়াত করতে লাগলেন।

অবশ্য তাই তাঁর একমাত্র করণীয় থাকেনি, এমন কি প্রধানও নয়। সেতারের চর্চা ও সাধনা এবার চলতে লাগল অব্যাহত ভাবে। অন্তরের প্রেরণাতেই পিতৃদত্ত সম্পদের সাধনা। তবে তার এক নব পর্যায়—নিঃসঙ্গ এখনকার সঙ্গীত-জীবন। কারণ মাথার ওপরে আর বামাচরণ নেই। তাঁর সেই সঙ্গীতিক ব্যক্তিত্ব আর নির্দেশাদির অবর্তমানে জিতেনের মনে ছেয়ে আসে এক অদ্ভুত শূন্যতা।

কিন্তু সে নৈরাশ্য কাটিয়ে ওঠেন পিতার হাতে প্রস্তুত যন্ত্রটি নিয়ে। তাঁর দেওয়া রাগের সাধন করতে থাকেন। প্রেরণা পান বামাচরণেরই খোদাই-করা ওস্তাদ মহম্মদ খাঁর প্রতিকৃতি দেখে। সুরেলা আঙুলের টিপে সেতারটি বাঁশির মতন কন্‌কনে আওয়াজে বেজে ওঠে।

কখনো বসেন সেই স্বরলিপিগুলি নিয়ে। বিভিন্ন রাগের চর্চায় নিবিষ্ট হয়ে যান। রাগ বিস্তারের নব নব পথে কত বিচিত্র পুলকের অনুভব। এই বহুমূল্য উত্তরাধিকারের গুরুত্ব ক্রমেই তাঁর উপলব্ধি হতে থাকে। তার নন্দন-গুণ সম্পর্কে সচেতনতা।

আর এ সেতার নিয়ে বাজাতে বসলেই জিতেন্দ্রনাথ যেন সঞ্জীবিত হয়ে ওঠেন পিতার স্নেহের, সুরের, শিল্পী প্রাণের পরশে। অন্তরে নব উদ্দীপন জাগে। সাধন ঠিক রেখে চলেন সংসারের নানা দায়-দায়িত্বের মধ্যে। আদালতে মুহুরির বিসদৃশ কাজে।

নিজের সঙ্গীত-জীবনকে এই পরিবেশেও বাঁচিয়ে রাখেন, বাড়িয়ে চলেন। দারিদ্র্যের মধ্যেও অনির্বাণ যন্ত্র-সঙ্গীতের শিখা।

এই ভাবে দিন যায় তাঁর, মুরুলি মণ্ডলগাঁতিতে। মাসের পর মাস। কটি বছরও। তাঁর সেতার বাজনার কথা ক্রমে অনেকেরই কানে যায়।

পাড়া-প্রতিবেশী থেকে কাছাকাছি অঞ্চলে। তিনি পরিচিত হয়ে যান সুন্দর সেতার বাদক বলে।

তবে তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান পরিচয় তাঁর নিজের কাছে। ঘরোয়া সঙ্গীতচর্চায়। কারণ সেখানেই তাঁর শিল্পী-জীবনের

প্রস্তুতি চলে। অনলস অধ্যবসায়ে সে সাধন, লোকচক্ষুর অন্তরালে। উত্তরাধিকারের সঙ্গে বিকশিত হতে থাকে আপন সঙ্গীতজ্ঞান, মনন, অন্তর্দৃষ্টি। প্রস্ফুটিত নান্দনিক সত্তা।

ছোটখাটো ঘরোয়া আসর থেকে প্রকাশ্য জলসাতেও জিতেন্দ্রনাথের গুণপনা প্রকাশ পায়। কিন্তু সে সবই মফস্বল-অঞ্চলে, আর সৌখীন বাজিয়ে বলে। অর্থাৎ অ-পেশাদার। অর্থকরী মূল্য বিবর্জিত।

তবে ওই সব লোকালয়ের সঙ্গীতপ্রিয় সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা হয় যথেষ্ট। গায়করা সমীহ করেন। তবল্‌চীরা যোগাযোগ রাখেন, খাতির জানান। সঙ্গত করতে আসেন নিজেদের রিয়াজের জন্যে।

বাহ্যত বারাসত আদালতের এক সামান্য মুহুরি বটে। কিন্তু গুণীজন স্বরূপে সম্মানিত।

এমনি ভাবে মুহুরি-জীবনের ভস্মে কতকাল সে প্রতিভার পাবক ঢাকা থাকত, কে জানে। অবশ্য কথাও আছে যে, প্রতিভা কখনো অপ্রকাশিত থাকে না।

সে যা হোক, এবার পট পরিবর্তনের সূচনা দেখা গেল তাঁর জীবন-নাট্যে।

অখ্যাত, অপরিচয়ের পর্যায় থেকে প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। মফস্বলের ছায়ালোক থেকে রাজধানীর প্রদীপ্ত আসরে। সেতারী-রূপে গুণীসমাজের স্বীকৃত জিতেন্দ্রনাথকে পাওয়া গেল এবার।

কোন সূত্রে আরম্ভ হল, সঠিক জানা যায়নি। তাঁর কোন গুণ-গ্রাহী একদিন তাঁকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। এখানে একটি ভাল আসরে তাঁর বাজাবার ব্যবস্থা করলেন।

চমৎকার সেতার বাজালেন জিতেন্দ্রনাথ। উদ্‌যোক্তা আর শ্রোতারা বড় আনন্দ পেলেন। সকলেই প্রশংসা করলেন। সম্মান জানালেন তাঁকে শিল্পী বলে।

উপরন্তু সেদিন এমন বস্তু লাভ করলেন যা তখন তাঁর কল্পনারও অতীত ছিল।

'অনুগ্রহ করে কিছু দক্ষিণা নিন।'

এই বলে, সে অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা ত্রিশটি টাকা দিলেন তাঁর হাতে।

আদর-আপ্যায়নের চেয়ে তিনি এই প্রাপ্তিতেই বেশি অভিভূত হয়ে পড়লেন।

সে রাত্রেই ফিরে এলেন মণ্ডলগাঁতিতে। কিন্তু সারা রাত প্রায় বিনিদ্র রইলেন। এমন অভাবিত স্বীকৃতিতে যুগপৎ আশ্চর্য, পুলকিত। আবার আশার রঙীন স্বপ্নে উচাটন মন।

চিত্ত আলোড়িত করে কেবলই এক ভাবনা তাঁকে উতরোল করতে লাগল। গোটা মাস বারাসত কোর্টে ছুটোছুটি করি। যত রকমের সব উঞ্ছ কাজ করেও ত্রিশ টাকার মুখ দেখতে পাই না। আর, একটি আসরে এক ঘণ্টাতেই সেই রোজগার! আবার এত সম্মান, সুখ্যাতি, আদর-যত্ন! আরেক বড় কথা—সকলের সামনে বাজিয়ে এত আনন্দ!

এমনি চিন্তায় সে রাতটি কোথা দিয়ে কেটে গেল।

এই হল সূচনা।

কিছুদিন পরে আবার এল একটি আসরের আহ্বান। সেই আগের দিনের সূত্রে। কলকাতাতেই আরেকটি মুজরো পেলেন। বাজালেন আসর মাৎ করে। শ্রোতারা উচ্ছ্বসিত হলেন।

এবারেও যথেষ্ট খাতির-যত্নের সঙ্গে মিলল তেমনি সম্মান-মূল্য। আর, একটি মনোরম স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলেন জিতেন্দ্রনাথ। ভবিষ্যতের জন্যে একটি নতুন পরিকল্পনা মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল।

তৃতীয় মুজরো পেলেন খুব শীঘ্রই। প্রথম দুটি আসরের সূত্র ধরেই এবারেরও আমন্ত্রণ এল।

উদ্‌যোক্তাদের আশা পূরণ করে বাজালেন তিনি। তাঁর নিজের আশাও যথোচিত পূর্ণ হল।

এমনিভাবে মাঝেমাঝেই আহ্বান আসতে লাগল কলকাতার আসর থেকে।

এমন একেক দিন হত যে, কলকাতায় আসা যেত না। হাঁটা রাস্তা, ট্রেনের পথ সব সমেত অনেকখানি সময় যায় মুরুলি মণ্ডল-গাঁতি থেকে কলকাতায় আসতে। তাই মুজরো ছেড়ে দিতে হত।

এতদিনে শিল্পী হিসেবে আত্মসচেতন হয়েছেন তিনি। বারাসত আদালতে মুহুরিগিরি করবার জন্যে যে তাঁর জন্ম হয়নি, এ প্রত্যয় এখন হয়েছে। এখন বিলক্ষণ সাধ জেগেছে যন্ত্রীরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠার, কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে। তার তোরণ-দ্বার তো মুক্ত হতে দেখা যাচ্ছে।

এখন এই দূর মফস্বলে দিনাতিপাত করলে, পথ অবরুদ্ধ থাকবে শিল্পী-জীবনে।

এত সাধের এত সাধনার সেতার সুরবাহার বাদন—কি হবে তার ভবিষ্যৎ? কলকাতার বৃহত্তর সঙ্গীত-জগৎ থেকে কি বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবেন, প্রকৃত জীবনকে খণ্ডিত করে? না, এই প্রতিষ্ঠার সুযোগকে গ্রহণ করবেন সর্বতোভাবে?

এর সঙ্গে সাংসারিক দিকও চিন্তা করবার আছে। পিতার মৃত্যুর পর প্রায় দশ বছর অতিক্রান্ত। নিজের সংসারযাত্রা এগিয়েছে অনেকখানি। পারিবারিক আকার, দায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

কয়েক বছর যাবৎ বিবাহিত। একাধিক সন্তানের পিতা। জননীও জীবিতা রয়েছেন। আদালতের আয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হলে, হীন অবস্থায় সংসার চলবে, একথাও নিশ্চিত।

জীবনপথের একটি সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছেন জিতেন্দ্রনাথ। এখন একটি নতুন পথ নিতে হবে।

সব দিক বিবেচনা করলেন তিনি। তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন।

সঙ্গীত-জীবন এবং ইহ-জীবনেরও ভাগ্য পরীক্ষা করতে হবে কলকাতায়।

বারাসত আদালতের মুহুরিগিরিতে ইস্তফা দিলেন। মামার বাড়ির বাস উঠিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। অবশ্যই সপরিবারে।

রাণাঘাটের জিতেন্দ্রনাথ মুরুলি মণ্ডলগাঁতি থেকে কলকাতা নিবাসী হলেন।

তাঁর বয়স তখন প্রায় ত্রিশ বছর। আর শেষ হয়ে আসছে বিশ শতকের প্রথম দশক।

কজন অনুরাগীর ভরসায় জিতেন্দ্রনাথ কলকাতায় স্থায়ী হলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বিশিষ্টের নাম সত্যেন্দ্রকুমার দত্ত। হাটখোলার বিখ্যাত দত্ত-বংশজ তিনি। তবে সে সময় কালীঘাটের নেপাল ভাট্টচার্য স্ট্রীট নিবাসী।

সত্যেন্দ্রকুমার গান-বাজনায় বড় শখদার। নিজেও কিছু কিছু চর্চা করেন। বিশেষ সেতারী হবার ইচ্ছা। বিভিন্ন আসরের নিত্য শ্রোতা তিনি। ভবানীপুর সঙ্গীত-সম্মিলনী আর নানা গান-বাজনার অনুষ্ঠানে এ অঞ্চলে হাজির হন।

তাঁকে জিতেন্দ্রনাথের সেতার বাজনার কথা জানান ভেলুবাবু। তিনি প্রতিবেশী এবং পাখোয়াজী বলে এদিকে সকলের পরিচিত। পোশাকী নামটি হারিয়ে ভেলুবাবু নামেই সকলের চেনা।

জিতেন্দ্রনাথের বাজনা তিনি আগেই একবার শুনেছিলেন। তার সুখ্যাতি করেন দত্তজার কাছে। তারপর দুজনের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন সত্যেন্দ্রকুমারের আগ্রহে।

জিতেন্দ্রনাথের কলকাতায় আসার ব্যাপারে তিনিও উদ্‌যোগী হলেন। ভালভাবে শেখবার আশায় জিতেন্দ্রনাথকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়ির কাছে। মুখুজ্যেপাড়া লেনে জিতেন্দ্রনাথের বাসার ব্যবস্থা করলেন। নিজে হলেন তাঁর প্রথম শিষ্য।

তখন অনেক চেষ্টাচরিত্র তিনি করেছিলেন গুরুর জন্য। তাঁর

জানা সঙ্গীত-সমাজে জিতেন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। শিক্ষার্থী সংগ্রহ করা। সম্ভব মতন মুজরোর ব্যবস্থা, যা সেকালের কলকাতাতে সুলভ ছিল না। আর নিজেও যেমন দেখাশোনা তেমনি শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন গুরুরই তুল্য।

এমনিভাবে ভট্টাচার্য মশায়ের বসবাসের সুবিধা হল দক্ষিণ কলকাতায়।

তখনো তাঁর কি নিরলস সাধনা! কি অশ্রান্ত রিয়াজ! রাণাঘাট, মণ্ডলগাঁতিতে সেই শেষরাত থেকে রিয়াজের অভ্যাস। কলকাতায় এসেও তার ব্যতিক্রম হল না। কালীঘাটে যে বাড়িতে তখন আছেন, সেখানে ঘরের টানাটানি। শেষরাতে বাজাবার অসুবিধা। কিন্তু তিনি অদম্য। বাড়ির কাছেই একটি খোলা জায়গা। সেখানে একটি গ্যাসপোস্টের নীচে বেঞ্চিও আছে। তখন শীতকাল। সেটিই হয় তাঁর সাধনস্থল। গ্যাসপোস্টের নীচে বসেন যন্ত্র হাতে। মাথায় গায়ে আলোয়ান জড়ানো। স্তব্ধ গভীর রাতে তিনি আপন মনে বাজান একান্তে। এমনই আত্মনিমগ্ন যে, জানতে পারেন না আশপাশের বাড়ির জানলায় কত জাগ্রত উৎকর্ণ শ্রোতার দল, তাঁর বাজনা শোনার অপেক্ষায়।···

কালীঘাটে আসার কিছুদিনের মধ্যেই আবার মধ্য কলকাতাতেও সংযোগ ঘটল। বারাসাত থেকে সেই যে কবার বাজাতে আসেন কলকাতায়। বড়বাজার বৌবাজার অঞ্চলে যোগাযোগের সেই সূচনা। এখন তা আরো বৃদ্ধি পেতে লাগল। পেশাদার জীবনে, বিশেষ তাঁর মতন অপরিচিতের পক্ষে, তার মূল্য যথেষ্ট। বড়বাজার অঞ্চলের আনুকূল্য তিনি প্রায় প্রথম থেকেই পেয়েছিলেন।

বাঙালী সঙ্গীত-ব্যবসায়ী অর্থাৎ পেশাদার ওস্তাদ তেমন দেখা যেত না সে যুগে। অন্তত বাঙালী সেতারী দুর্লভ। পেশাদার গুণী বলতে তখনও প্রায় গাওয়াইয়া বোঝা যেত। আর তাঁদের মধ্যেও বাঙালী নিতান্ত সংখ্যাল্প। সেজন্যে জিতেন্দ্রনাথের কিছু সুবিধা

হয়ে গেল সেতার-বাজিয়ে বলে। মিষ্টি হাতের বাজনার জন্যে বড়-বাজার, বৌবাজার এলাকায় কয়েকজন বিত্তবান গুণগ্রাহীও মিলল। তাঁর পৃষ্ঠপোষক হলেন তাঁরা।

তাঁদের অন্যতম হলেন বড় একটি শিবমন্দিরের ব্যবস্থাপক। তিনি ভট্টাচার্য মহাশয়কে সেখানে নিযুক্ত করলেন। সপ্তায় একদিন তিনি বাজাবেন শিবমন্দিরে। সেজন্যে দক্ষিণা আশী টাকা।

কোন কোন ধনী পোষকের গৃহে শিক্ষক হিসেবেও কাজ পেলেন। শখ করে কেউ শিখবেন বাজনা। ঘরোয়াভাবে এসব একেকটি বৃত্তিলাভ যেন। শিল্পী-জীবন নির্বাহের বাস্তব সহায়ক অবশ্যই।

বৌবাজারের বিখ্যাত নাহার পরিবারেও গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষকদের পেলেন জিতেন্দ্রনাথ। জৈন সম্প্রদায়ের এই নাহার পদবীক বংশে শুধ্ লক্ষ্মীর উপাসনা নয়, বিদ্যা-সংস্কৃতির সেবক-রূপেও কেউ কেউ খ্যাতিমান। যেমন, পূরণচাঁদ নাহার প্রমুখ। তিনি এবং রায় বাহাদুর মণিলাল নাহার জিতেন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ হন। এই গৃহে সেতারের শিক্ষকরূপেও দেখা যায় তাঁকে। এঁদের কুমার সিং হলের সঙ্গে তাঁর নানা আসরের স্মৃতিও জড়িত।

কয়েকটি বাঙালী ভূম্যধিকারী পরিবারের দাক্ষিণ্যও জিতেন্দ্রনাথ পান। অকৃপণ সঙ্গীতপ্রেমী তাঁরা, কিছু কিছু সঙ্গীতসেবীও। যেমন, মুক্তাগাছার আচার্য চৌধুরী, রামগোপালপুরের রায়চৌধুরীরা। তাঁরা পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ নিবাসী হলেও কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত। বাংলার ও পশ্চিমের নানা গুণীকে তাঁরা আহ্বান করে নিয়ে গেছেন জমিদারীর সঙ্গীত-সভায়। নিযুক্ত রেখেছেন বছরের পর বছর। কেউ বা তাঁদের কাছে নিয়মিত শিক্ষাও করেছেন। যেমন, গানে জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী। তবলায়, মৌলবী-রাম মিশ্রের শিষ্য হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। আবার তাঁদের দক্ষিণ কলকাতার আবাসেও গুণীদের আসর বসিয়েছেন। ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাজনাও হয়েছে তাঁদের আসরে। আবার এমনি কোন

কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদেরও সেতার-শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। কারণ, সেকালের পেশাদার ওস্তাদরা যেসব কারণে কুখ্যাত, জিতেন্দ্রনাথ সুনামের অধিকারী ছিলেন সে সম্পর্কে।

মুক্তাগাছার আচার্য চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে সাঙ্গীতিক সংযোগ তাঁর পিতার সময় থেকে। বামাচরণের প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর অন্যতম গুণগ্রাহী ছিলেন রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী। সেই সূত্রেই জিতেন্দ্রনাথ এইসব আসরে প্রবেশের সুযোগ পান। তারপর আনুকূল্য লাভ করেন আপন প্রতিভা প্রদর্শনে।

তাঁদের মধ্যে জিতেন্দ্রনাথের বিশেষ গুণমুগ্ধ হরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী। সমকালীন ভারতের কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক-বাদকদের পরিচায়ক একটি গ্রন্থের তিনি লেখকও। সচিত্র সে বইখানির নাম—Musicians of India. তার প্রথম অধ্যায়টিই জিতেন্দ্রনাথ সম্পর্কে। হরেন্দ্রকিশোর কর্তৃক আলোচিত অন্যান্য গুণীদের মধ্যে আছেন—দিল্লীর গাওয়াইয়া মুজঃফর হোসেন (গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর ওস্তাদ), বারাণসীর দুই তবলাগুণী মৌলবীরাম মিশ্র ও দুর্গাসহায়, গয়ার এস্রাজী চন্দ্রিকাপ্রসাদ ও সোহনীজী, রামপুরের সারঙ্গী মেহদী হোসেন, শরদী আলাউদ্দিন এবং হাফিজ আলী, পাখোয়াজী অযোধ্যাপ্রসাদ, লক্ষ্ণৌর তবলাগুণী আবিদ হোসেন, কলকাতার ঠুংরি-শিল্পী জমিরুদ্দিন খাঁ প্রভৃতি। তাঁদের সকলের আগে জিতেন্দ্রনাথের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন হরেন্দ্রকিশোর। বোঝা যায়, ভট্টাচার্য মহাশয়কে তিনি বাদকরূপে কতখানি সমাদর করতেন।

তাঁর ভবানীপুরের বাড়িতে অনেকবার বাজিয়েছেন জিতেন্দ্রনাথ। সেতার সুরবাহার দুই-ই। তার মধ্যে একটি সেতারের আসর বলবার মতন। সেদিনের বাজনা থেকে অতীতের এক অন্তরঙ্গ স্মৃতি জেগে উঠেছিল। দুই প্রজন্মের অবিচ্ছিন্ন ধারায় যোগাযোগ ঘটেছিল একই রীতির সূত্রে। সেকালের সঙ্গে একালের এক অপ্রত্যাশিত মেল-বন্ধন।

পদ্মপুকুর রোডের সে আসরে সেদিন অতিথি-শিল্পী দুর্গাসহায় মিশ্র। বারাণসীর তবলাঘরানার এক সুদক্ষ বাদক। এই ঘরানাপ্রবর্তক রামসহায়েরই অন্যতম বংশধর তিনি। কণ্ঠে মহারাজের গুরু বলদেওসহায়ের পুত্র তথা শিষ্য দুর্গাসহায়। নান্নুসহায় এই ডাকনামে সঙ্গীতসমাজে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। পারিবারিক ধারায় শিশুবয়স থেকেই নান্নুর তবলা শিক্ষা শুরু হয়ে যায়। তারপর দশ বছর বয়সে চক্ষু হারাবার পর থেকে তবলাই হয় জীবনের একমাত্র অবলম্বন। পিতার তালিমে যৌবনেই কৃতী পেশাদার তবলিয়া-রূপে সঙ্গীতক্ষেত্রে দেখা দেন। যেমন তৈয়ারি, তেমনি তাঁর সংগৃহীত বোলের প্রাচুর্য।

দুর্গাসহায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে বাংলার সঙ্গে। কয়েক বছর তিনি নিযুক্ত থাকেন শশীকান্ত আচার্য চৌধুরীর সঙ্গীতসভায়। ভবানীপুর সঙ্গীত-সম্মিলনী তাঁর গুণের সমাদরে স্বর্ণপদক উপহার দেন। তেমনি পুরস্কারে শশীকান্তও সম্মানিত করেন তাঁকে। গুণগ্রাহী হরেন্দ্রকিশোর স্বরচিত গ্রন্থে তাঁর সচিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন। দুর্গাসহায়ের শেষ কথাটিও বলে রাখা যায় এখানে। তিনি মাত্র ৩৪ বছর বয়সে গতায়ু হন ১৯২৫ সালে এমন অকাল-মৃত্যু না ঘটলে তাঁর নাম বহু-প্রসিদ্ধ হয়ে থাকত, সন্দেহ নেই। ভবানীপুরের সেই আসরের সময় তাঁর বয়স প্রায় ত্রিশ বছর।

মৌলবীরামের শিষ্য হরেন্দ্রকিশোর সেদিন আসর করেছেন দুর্গাসহায়ের বাজনার জন্যে। এত বড় তবলিয়ার সঙ্গে কাকে বসানো যায়? তাই জিতেন্দ্রনাথকে খবর দিয়ে আনা হয়েছে। এসব বাড়িতে আগেও তিনি বাজিয়েছেন অনেকবার। তবে নান্নু বিশেষ আসেননি এখানে। জিতেন্দ্রনাথের কথাও জানতেন না। তাঁদের দুজনের একসঙ্গে বাজনা এই প্রথম।

বারাণসীর তবলিয়া আর বাংলার সেতারীয়ার জমাটি বাজনা। খুবই উপভোগ করলেন শ্রোতারা। আসরে সানন্দ পরিবেশ।

অজানা সেতারীর সঙ্গে সঙ্গত করে শুধু খুশী নন, মুগ্ধ তবলিয়া। কলকাতায় এমন চালের বাজনা তাঁর আশার অতিরিক্ত। অতি সন্তুষ্টচিত্তে দুর্গাসহায় তা স্বীকার করলেন। দৃষ্টিহীন গুণী আলাপ করতে চাইলেন তাঁর সঙ্গে।

পরিচয়ের প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন জিতেন্দ্রনাথকে, 'এ বাজনা আপনি কোথায় পেলেন? এমন ধ্রুপদাঙ্গের বাজ? কার তালিম আপনার?'

'বাবার।'

'তাঁর নাম কি?'

'বামাচরণ ভট্টাচার্য।'

'ওঃ সেইজন্যে!' দুর্গাসহায়ের মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। 'বাবার কাছে শুনেছি বামাচরণবাবুর নাম। বাংলায় ধ্রুপদাঙ্গে বাজাবার এমন সেতারী আর ছিলেন না। আমার দাদা ভৈরোঁসহাযের সঙ্গে একবার বাজনা হয়েছিল বামাচরণবাবুর। সেই থেকেই আমাদের ঘরে আপনার বাবার নাম জানা। আজ আপনার সঙ্গে আমার মহফিল্ হয়ে গেল।'

জিতেন্দ্রনাথ ধন্যবাদ দিলেন নান্নুজীকে। পুরনো সাঙ্গীতিক স্মৃতিতে নতুন দিনের আসর সঞ্জীবিত হল।

ভট্টাচার্য মহাশয় সেই সুন্দর আবহের মধ্যে একটি অনুরোধ করলেন দুর্গাসহায়কে।

পাশে ছিলেন তবলচী পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। তরুণ বয়সী পঞ্চানন তখন জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঠেকা দিতেন। তবে ভাল ঘরানা তালিম পাননি।

জিতেন্দ্রনাথ তাঁর দিকে দেখিয়ে বললেন নান্নুকে, 'এই ছেলেটিকে আপনার তালিম দিতে হবে।'

এককথায় রাজি হলেন দুর্গাসহায়। তারপর কলকাতায় যতদিন থেকেছেন, ঠিক শিখিয়েছেন পঞ্চাননকে। বারাণসী তবলা ঘরানার

শিক্ষা এইভাবে তিনি পেয়ে যান, যে সুযোগ বাংলার কম তবলচীই পেয়েছেন। পরবর্তীকালে পঞ্চাননই বেশি সঙ্গত করেছেন জিতেন্দ্র-নাথের আসরে। (দ্বিতীয় খণ্ড 'সঙ্গীতগুণী'তে তাঁদের যুক্ত প্রসঙ্গ আছে, মানদাসুন্দরীর জীবনীতে)।

ধ্রুপদাঙ্গে সেতার বাজনাই জিতেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ছিল। আর সেজন্যেই সঙ্গীত-সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা। ধীর গম্ভীর কারুকৃতিতে রাগের অবয়ব গড়ে তোলা। সুচারু ছন্দের কাজ। তোড়ার বহু বৈচিত্র্য। জোড ছেড়ের নানা মুন্সিয়ানা। বড় বড় মীড়। ছন্দ কর্মের প্রাধান্য। এমনি সব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর সাজ্জাদ মহম্মদ-মহম্মদ খাঁর ঘরানা বাজ। বামাচরণের কাছে রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত আর আপন প্রতিভায় বিকশিত জিতেন্দ্রনাথের সেতার বাদন। আবার যখন সুরবাহার বাজান, সেই ধ্রুপদ অঙ্গে সম্পূর্ণ, পদ্ধতিগত আলাপ-চারী। চার কলি বা বিভাগের যথাবিধি সমাহারে রাগালাপ।

গুণের কদর হয়ই। সহায়-সম্বলহীন মফঃস্বল জীবন থেকে তিনি কলকাতায় আসেন, অপরিচিত। কিন্তু যথার্থ গুণী বলে সম্মানের আসন ক'রে নেন সঙ্গীত-সমাজে।

তাঁর আরো কজন অনুরাগী পৃষ্ঠপোষকের নাম এখানে করা যায়। যেমন—বাঁসওয়াড়ার (রাজস্থান) পৃথ্বী সিং মহারাওয়াল। মুঙ্গেরের রাজা দেওকীনন্দন প্রসাদ সিং। তাঁরা জিতেন্দ্রনাথের বাজনা শোনেন কলকাতাতেই। পদক দিয়েও পুরস্কৃত করেন তাঁকে।

নাহার পরিবারের রায় বাহাদুর মণিলাল এবং পূরণচাঁদও তাঁকে পদক উপহার দেন।

জিতেন্দ্রনাথের আরেকজন অনুরাগী—অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সমকালীন বিদ্বৎ সমাজের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি। বহুবিষয়ে অধিগত বিদ্যা ধূর্জটিপ্রসাদের। সেই সঙ্গে সঙ্গীতজ্ঞও তিনি। ওজস্বীকণ্ঠ ধ্রুপদী ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কিছুদিন ধ্রুপদ শিক্ষাও করেন যৌবনকালে, অন্তরের আকর্ষণে। পরবর্তী

জীবনে একাধিক সঙ্গীতগ্রন্থের লেখকরূপে ধূর্জটিপ্রসাদকে দেখা যায় আর নানা কলাকারদের আসরে আসরে সংবেদনশীল শ্রোতারূপে। সুরবাহারী জিতেন্দ্রনাথেরও গুণমুগ্ধ ছিলেন অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ। সুরবাহারে সেই সম্পূর্ণ ধ্রুপদাঙ্গের আলাপচারী তাঁর উপভোগের বস্তু ছিল।

জিতেন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী বলা যায় স্যর আশুতোষ চৌধুরী এবং প্রতিভা দেবীকেও। কারণ, সঙ্গীতপ্রেমী আশুতোষ এবং তাঁর সঙ্গীতজ্ঞা বিদুষী পত্নী প্রতিভা দেবী (রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা) পরিচালিত 'সঙ্গীত সঙ্ঘ'র প্রধান যন্ত্রসঙ্গীতশিক্ষক হন জিতেন্দ্রনাথ। 'সঙ্গীত সঙ্ঘ' সেকালের সুপরিচিত এক সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান। এখানে শিক্ষকরূপে বিভিন্ন সময়ে যুক্ত থাকেন—কৌকব খাঁ, লছমী ওস্তাদ, করামতুল্লা খাঁ, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কলাবৎ। এই সঙ্গীত-সংস্থায় জিতেন্দ্রনাথের নিয়োগ তাঁর সঙ্গীত-গুণের বিশেষ স্বীকৃতির পরিচায়ক।

আর একটি বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁর পরিচিতির মাধ্যম হল মুরারি সম্মেলন। এই বিরাট সঙ্গীতাসরটি পরবর্তীকালের সর্বভারতীয় ও নিখিলবঙ্গ সম্মেলনের পূর্বসূরী। শুধু বাংলার নয়, ভারতেরও নানা প্রথম শ্রেণীর গুণী সমাগমে সার্থক হত মুরারি সম্মেলন। পাখোয়াজী দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য তার প্রধান উদ্‌যোক্তা। তাঁর গুরু, মৃদঙ্গাচার্য মুরারিমোহন গুপ্তের স্মৃতিতে এই বার্ষিক সম্মেলন দীর্ঘকাল যাবৎ পরিচালনা করেছেন। এ আসরে পরিবেশিত হয়েছে উচ্চ মানের সঙ্গীত, কণ্ঠে এবং যন্ত্রে। সুপ্রতিষ্ঠিত কলাবৎবৃন্দ যেমন সর্বসাধারণের সামনে গুণপনা দেখান, তেমনি উদীয়মানরাও সেখানে প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ পান।

সেই মুরারি সম্মেলনে আমন্ত্রিত হলেন জিতেন্দ্রনাথ। আর বৃহত্তর সঙ্গীতজগতে স্বীকৃতি পেলেন, নানা গুণীজনের সমক্ষে।

এই সম্মেলনে বাজাবার আগে থেকেই অনাথনাথ বসু তাঁর

পরিচয় পেয়েছিলেন। একাধারে খেয়াল ঠুংরি গায়ক এবং তবলাবাদক রূপে অনাথনাথ তখন সুপরিচিত। তরুণ বয়সেই সঙ্গীতক্ষেত্রে আপন স্থান করে নিয়েছেন, যোগ্যতায় এবং অধ্যবসায়ে। গুণীর সমাদর করতেও অনাথনাথ তৎপর।

জিতেন্দ্রনাথের বাজনার সময় তিনিও শিল্পী হিসেবে সম্মেলনে উপস্থিত। দেখলেন, জিতেন্দ্রনাথ সেতার আরম্ভ করবার আগেই হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল উঠে পড়লেন। অপরিচিত বাদকের শোনবার আগ্রহ নেই তাঁর।

স্বয়ং সেতার-সুরবাহার-গুণী হরেন্দ্রকৃষ্ণ। কৌকব খাঁ করামতুল্লা খাঁর প্রিয় শিষ্য। বাংলার সঙ্গীত-সমাজে সে সময় মান্যগণ্য ব্যক্তি শীল মহাশয়।

অনাথনাথ বাধা দিলেন হরেন্দ্রকৃষ্ণকে। বললেন, 'চলে যাচ্ছেন কেন? একটু শুনুন, কেমন বাজান দেখুন।'

নিরহঙ্কার, নির্বিরোধী হরেন্দ্রকৃষ্ণ। তিনি অনাথনাথের কথায় পুনরায় আসন নিলেন এবং শুনলেন শেষ পর্যন্ত। বাজনার খুবই তারিফ করলেন। আর জিতেন্দ্রনাথের অনুরাগী রয়ে গেলেন সেদিন থেকে।

বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভট্টাচার্য মহাশয়ের আর একটি স্বীকৃতি-স্থল—'কলিকাতা প্রদর্শনী'। সরকারী পোষকতায় ১৯২৩ সালের অনুষ্ঠিত সেই বিশাল বর্ণাঢ্য সমারোহ। 'ক্যালক্যাটা এক্‌জিবিশন' নামে ইডেন গার্ডেনে কয়েকদিন ব্যাপী মহা-মেলা। বিভিন্ন চারু ও কারু-শিল্প, কুটিরশিল্প, পুঁথিশালা, কৃষিশিল্প, পুষ্প বিভাগ, ক্রীড়া, সঙ্গীত, নাট্যাভিনয় প্রভৃতির সমাহারে তা জাতীয় সম্মেলনের রূপ নিয়েছিল। তার ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক বিভাগীয় সমিতিতে ছিলেন রমাপ্রসাদ চন্দ, ডি. আর. ভাণ্ডারকার, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ বিদ্বৎ-মণ্ডলী। সেই প্রদর্শনীতেই শিশিরকুমার ভাদুড়ি সম্প্রদায়ের 'সীতা' অভিনয়ে চমৎকৃত হন নাট্যানুরাগীরা। প্রদর্শনীর 'Indian

Music' বিভাগের পরিচয়ে স্মারক পুস্তকে আছে—'The following among other professionals have been engaged'. সেই নিযুক্ত পেশাদারদের মধ্যে উল্লিখিত হয়েছেন ধ্রুপদী রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, বীণ্‌কার লছমীপ্রসাদ মিশ্র, ধ্রুপদী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সেতারী জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শরদী আমীর খাঁ, সারঙ্গী ছোটে খাঁ, এস্রাজী শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, খেয়াল-টপ্পাগায়ক বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়, তবলিয়া পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

কলিকাতা প্রদর্শনীর বিভিন্ন দিনের আসর বৃহৎ সঙ্গীত সম্মেলনের রূপ ধারণ করেছিল। আর তার এক প্রধান উদ্‌যোক্তার ভূমিকা নেন জিতেন্দ্রনাথ।

কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রে এমন সম্মানের আসন তিনি পেয়েছিলেন।

সেতার কিংবা সুরবাহারে তাঁর কয়েকজন শিষ্যও হন বিভিন্ন সময়ে। যেমন সত্যেন্দ্রকুমার দত্ত, পতাকী হালদার, হরিহর দত্ত, হেমেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল (মুক্তাগাছা আচার্য চৌধুরী বংশীয়, সঙ্গীতসেবী যোগেন্দ্রনারায়ণের জামাতা) প্রভৃতি। নাহার পরিবারেও তাঁর কাছে কোন কোন সেতার শিক্ষার্থী ছিলেন। তবে জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-সম্পদের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ।

তিনি যেমন পিতা বামাচরণের একান্ত হাতে-গড়া, লক্ষ্মণও তাঁর তেমনি। দুই পুরুষের বাদ্যবিদ্যা ধারণ বহনের সুযোগ্য আধার। সেতারের রীতিনীতি, হস্তসাধন, রাগের গঠন, আলাপচারি, গৎকারী, তানতোড়া ঝালার কাজ, লয়কারী সবই জিতেন্দ্রনাথ হাতে হাতে পুত্রকে শেখান। আর নিজে যেমন পিতার কাছে লাভ করেছিলেন প্রচলিত অচলিত বিপুল রাগ-সংগ্রহ, নিজেও তেমনি দিয়েছিলেন লক্ষ্মণকে। তাকে শিক্ষা দিতে জিতেন্দ্রনাথের গভীর

তৃপ্তি। যেমন গুণবান দাতা তেমনি গ্রহীতা। তেমনি ত্বড়িৎ হাতে তুলে নেবার, মস্তিষ্কে ধারণ করবার ক্ষমতা।

শিক্ষা দেওয়া শুধু নয়। আরেকটি বিষয়েও তৎপর হন জিতেন্দ্রনাথ, পরিণত বয়সে। বামাচরণেরই পদাঙ্ক অনুসরণে হয়ত। এই বিরাট রাগ ভাণ্ডার। স্মৃতি কি সর্বথা নির্ভরযোগ্য? সুতরাং লিপিবদ্ধ করে রাখা ভাল।

শেষ জীবনে, এইভাবে তিনিও সংরক্ষণে ব্রতী হলেন। খাতার পর খাতায় লিখতে লাগলেন বিভিন্ন রাগের অতি সংক্ষিপ্ত রূপ। আরোহণ, অবরোহণ, আওচার। জিতেন্দ্রনাথেরও সুন্দর ছাঁদের হস্তলিপিতে বিধৃত থাকে বহু রাগের গঠন।

কলকাতা বাসের প্রথম দিকে তিনি থাকতেন কালীঘাটে। পরবর্তী জীবনে বৌবাজার নিবাসী হন। হিদারাম ব্যানার্জী লেনের একটি বাসা-বাড়িতে ছিলেন শেষের ক'বছর।

বামাচরণের তুল্য তিনিও আসরে সেতার সুরবাহার দুই-ই বাজাতেন। যেমন ধরনের আসর, সেই অনুসারে বাজনা হত তাঁর। তবে শেষ জীবনে সুরবাহারেই তাঁকে বেশি দেখা যায়। অপ্রচলিত বা অল্প-জ্ঞাত নানা রাগ তিনি শুনিয়েছেন আসরে আসরে। বামাচরণের উত্তরাধিকার তাঁকে সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে যথেষ্ট সম্মানের স্থান দিয়েছিল। তবু বলা যায়, প্রতিভার উপযুক্ত যশস্বী হননি জিতেন্দ্রনাথ। তার একটি কারণ তিনি ছিলেন লাজুক-স্বভাব, মুখচোরা, আত্মপ্রচারবিমুখ। তাঁর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মতামত জানা যায়। জিতেন্দ্রনাথের সমকালীন সেতার সুরবাহারের স্বনামপ্রসিদ্ধ বাদক ছিলেন এনায়েত খাঁ। জিতেন্দ্রনাথের গুণগ্রাম খাঁ সাহেবের তুলনায় অল্প ছিল না। না রাগবিদ্যায়, না বাদননৈপুণ্যে। ঘরোয়া আসরেও তিনি শ্রেষ্ঠতার বাদক রূপে দেখা দিতেন। এনায়েৎ খাঁর নিরিখে কিন্তু বৃহত্তর আসর জিতেন্দ্র-

নাথ সচরাচর এড়িয়ে চলতেন। তা সত্ত্বেও বলা যায়, পেশাদার জীবনে ব্যর্থ হননি।

সংসার প্রতিপালন করে যান একপ্রকার। চার ছেলে। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে বাস। কত রকমের সাংসারিক দায়দায়িত্ব। সবই [illegible] করেছেন সঙ্গীত জীবনের আয় থেকে।

সুতরাং গৃহস্থের সঞ্চয় সম্ভব হয়নি। সেই খেদ থেকে যায় তাঁর শেষ জীবনে।

বড় ছেলে গান গাইতেন। কিন্তু তেমন কিছু নয় তা। আশা ভরসা করবার মতন একমাত্র লক্ষ্মণ। চোদ্দ-পনের বছর বয়সেই রীতিমত তৈরি তার হাত। আসরে বাজাবার উপযুক্ত।

তাই লক্ষ্মণকেই বলেছিলেন, 'আমি টাকাকড়ি কিছু রেখে যেতে পারলুম না। এই খাতাগুলি কেবল রইল। তোমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছি। এসব খাতা থেকেও আরো পাবে।'

জিতেন্দ্রনাথের মৃত্যু হল ১৯৩৬ সালে। এনায়েৎ খাঁর সঙ্গে একই বছরে। বয়স হয়েছিল উনষাট বছর।

রাণাঘাট থেকে একটি মূল্যবান যন্ত্রসঙ্গীত-ধারাকে তিনি যুক্ত করে দিয়ে গেলেন কলকাতায়। সাজ্জাদ মহম্মদ-মহম্মদ খাঁ-বামাচরণের ঐতিহ্যকে লক্ষ্মণের সেতারে প্রবাহিত করলেন। সেকালের ধারক বাহক হল একাল। তিন পুরুষের মধ্যে দ্বিতীয় পুরুষের ভূমিকাও উদ্‌যাপিত হয়ে গেল সুষ্ঠুভাবে।

এবার লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের পালা। পিতার সুবাদে এবং আপন উচ্চমান প্রতিভার পরিচয়ে কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রে তিনি আর নবাগত নন। তখন বয়স যদিও একুশ বছর মাত্র।

পিতার সঞ্চয় সেই খাতার সবগুলি কিন্তু লক্ষ্মণ পাননি। তার কিছু রয়ে যায় জিতেন্দ্রনাথের এক পৃষ্ঠপোষকের কাছে।

লক্ষ্মণ সেখানে চাইতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা বললেন, 'এসব

জিনিস এখন আমাদের। আমরা তোমার বাবাকে অনেক টাকা দিয়েছি। তোমার কোন দাবি এই খাতায় নেই।'

সে খাতার সদ্ব্যবহারের সামর্থ্য তাঁদের ছিল না। কেবল তাঁরা অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করলেন লক্ষ্মণকে।

অবশ্য তার অনেকাংশই তাঁর স্মৃতিতে সঞ্জীবিত ছিল। তবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কিছু অপ্রচলিত রাগের নিদর্শন।

তবু সেই বয়সেই লক্ষ্মণের বিপুল সংগ্রহ। সঙ্গীত-ব্যবসায়ী বংশের উত্তরাধিকার। বাংলার সঙ্গীতজগতে এমন তিনপুরুষের যন্ত্রসঙ্গীতধারার দৃষ্টান্ত আর কোথায়?

প্রথম যৌবনেই লক্ষ্মণ পেশাদার সেতারী। বৃত্তির উপযুক্ত প্রস্তুতি আর যোগ্যতা নিয়ে সঙ্গীত ক্ষেত্রে উপস্থিত। উন্নত মানের বাজনায় মুগ্ধ করা আসরশিল্পী। বিকশিত প্রতিভা।

১৯১৫ সালে কলকাতায় জন্ম। প্রায় শিশু-বয়স থেকে আরম্ভ করেছেন সেতার। পিতার সাক্ষাৎ উদাহরণে, পরিবেশে আর বিধিবদ্ধ শিক্ষায়। লেখাপড়া একপ্রকার নাস্তি। বিদ্যার যা কিছু, সবই সঙ্গীতে, সেতারে। সমস্ত মন প্রাণ দিয়েই এই বাজনা শেখা। অন্তরের এক আশ্চর্য টান সেতারে। কি ভাল লাগে বাজাতে। কি আগ্রহ শিখতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রিয়াজেও শ্রান্তিক্লান্তিহীন।

জিতেন্দ্রনাথ থাকতেই লক্ষ্মণ বাজিয়েছেন বড় বড় আসরে। শুধু কলকাতায় নয়। বাংলার বাইরে, কাশীতে পর্যন্ত। পিতার মৃত্যুর চার বছর আগেকার সে কথা। বারাণসীতে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন। সেখানে বাজাবার আহ্বান এল। লক্ষ্মণের বয়স তখন সতের বছর। কিন্তু তিনি মাৎ করে দেন সম্মেলনের আসর। গুণীজনের সুখ্যাতিতে ধন্য।

তবে সেখানে বাজনার চেয়ে বলবার মতন তার আগেকার কথা। সম্মেলনে যাবার প্রস্তুতি। কিংবা সেই উপলক্ষ্যে শেখার ব্যাপারটি।

কোন কোন অন্তরঙ্গের কাছে জিতেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমি লক্ষ্য করেছি, লক্ষ্মণের বাজনার সংস্কার পূর্বজন্মের।'

নিজের সন্তান বলে যে অন্ধ স্নেহের উক্তি, তা নয়। স্বর্গত পিতার সঙ্গে কোন অদৃশ্য যোগসূত্র কিনা, কে জানে। তবে অনেক-বারই তার পরিচয় পেয়েছেন, বিশেষ শেখাবার সময়। কোন নতুন রাগ হয়ত দিচ্ছেন লক্ষ্মণকে। আওচার পুরো দেখাবারও তর সয় না লক্ষ্মণের। বিস্তার স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তার হাত দিয়ে বেরিয়ে আসে।

কাশী যাবার আগের কথাটিও তেমনি।

জিতেন্দ্রনাথ সেদিন শেখাতে বসেছেন। লক্ষ্মণও যন্ত্র হাতে নিয়ে সামনে।

তিনি বললেন, 'কন্‌ফারেন্সে বাজাতে যাবি। একটা নতুন রাগ শেখ। সচরাচর শোনা যায় না। এর নাম জুঁই।'

বলে, যন্ত্রে দেখাতে আরম্ভ করলেন—মা পা ধা নি সা, রে নি (ব) ধা পা—

ওই পর্যন্ত শুনেই লক্ষ্মণ বলে উঠলেন, 'ও আমি জানি বাবা।'

'জানিস কিরকম? আমি তো তোকে জুঁই আগে শেখাইনি?'

'আচ্ছা দেখো, ঠিক হয় কিনা আমি বাজাচ্ছি—

'মা পা ধা নি সা, রে নি (ব) ধা পা'-র পরে, বাজাতে লাগলেন—পা সা নি সা নি ধা নি ধা পা, ধা পা মা গা রে, গা পা ধা নি সা, সা নি রে নি (ব) ধা পা, মা পা ধা নি (ব) ধা পা মা গা মা রে সা॥'

'কোন ভুল নেই,' সবিস্ময়ে স্বীকার করলেন জিতেন্দ্রনাথ। সানন্দে খানিক স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

তারপর 'আচ্ছা এবার অন্তরা দেখাই' বলে—'পা পা নি ধা সা' বাজাতেই—

লক্ষ্মণের সেতারে ঝঙ্কার দিয়ে চলল—'সা রে গা মা গা রে সা,
নি সা নি রে সা নি ধা পা, মা পা ধা নি ধ প, মা গা রে···'

এমনি সব দেখেই জিতেন্দ্রনাথের মনে হত—লক্ষ্মণের সেতার বাজনা পূর্বজন্মের সংস্কার।

বামাচরণ সেতার সুরবাহার দুই-ই বাজাতেন বটে। কিন্তু তাঁর বেশি প্রিয় ছিল, বেশি বাজাতেনও—সেতার। তাই নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন এই যন্ত্র। আর তাতে খোদাই করে রাখেন নিজের ওস্তাদ মহম্মদ খাঁর প্রতিকৃতি। জিতেন্দ্রনাথও সেতার সুরবাহার দুই যন্ত্রেরই বাদক। কিন্তু তিনি সুরবাহার ধরেছিলেন পরিণত বয়সে।

কিন্তু লক্ষ্মণ পুরোপুরি সেতারী। সুরবাহার আর ধরলেন না। সেতারেই বাজাতে লাগলেন সুরবাহারের সম্পূর্ণাঙ্গ আলাপচারি, গৎ বাজাবার আগে। রাগালাপ তাঁর অতি প্রিয়। আর তেমনি মুন্সিয়ানায় তাঁর ধ্রুপদাঙ্গে আলাপ। ধ্রুপদ অঙ্গেই রাগের বিশুদ্ধ রূপ প্রকাশমান। রাগ রূপায়ণে লক্ষ্মণের তরুণ বয়সেই কি দক্ষতা। আবার গৎকারীতেও সুনিপুণ। তান তোড়া ঝালায় অতি তৈরি হাত। বিস্তারে দস্তুরমত পারদর্শী। তালে লয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অটল। দুর্ধর্ষ তবলিয়ার আক্রমণাত্মক সঙ্গতেও আত্মসমাহিত, অটুট। লয়কারীতে অকাট্য। বিচিত্র ছন্দ-লীলায় প্রাণবন্ত তাঁর বাদ্যধারায় দোলায়িত শ্রোতাদের হৃদয়। কত সুন্দর সুন্দর ছন্দের ছক তাঁর বাজনায় সুরের আলপনা এঁকে যায়।

সেইসঙ্গে, পিতৃ-পিতামহের রাগ ভাণ্ডারের ধারক বাহকও লক্ষ্মণ। অপরিণত বয়সেই রাগবিদ্যার অর্ণব যেন। তাদের স্বচ্ছন্দ সাবলীল বাদক। আসরে আসরে এত অচলিত, ক্বচিৎ-শ্রুত রাগ আর কে পরিবেশন করেছেন তাঁর সমকালে, কলকাতায়?

সেতারে সেযুগে আর কে শুনিয়েছেন রাজবিজয়? কিংবা

সূর্যকোশ বা জুঁই? শ্রী-শঙ্করা মিশ্র? শ্রী অনেকের জানা। শঙ্করা আরো সুপরিচিত। কিন্তু শ্রী আর শঙ্করার এমন সুষম মিশ্রণ আর কারুর হাতে শোনা গেছে কি?

আসলে, রাগের ওপর অধিকার লক্ষ্মণের অন্তরঙ্গ। আর সৃজনশীল শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি। তাই সচেতনভাবে তিনি রসসৃষ্টিকারী। আপাত বিপথের পথিক হয়েও পুনরায় স্বমার্গে ফিরে আসেন, অবলীলায়। কখনো ঈষৎ অভিনবত্ব যোগে চমৎকার সৌন্দর্য সৃজন ঘটে যায়।

যেমন, একদিন বাজাচ্ছেন একটি আসরে। রাগের নামটি অপ্রকাশিত আছে। কিন্তু ভারি শ্রুতিমধুর। বোঝবার চেষ্টা করলেন সমঝদার শ্রোতারা। শিবরঞ্জনীর মতন শোনাচ্ছে বটে। কিন্তু ঠিক শিবরঞ্জনী নয় তা। কোমল ধৈবত লাগিয়ে দিচ্ছেন বড় কায়দায়। আবার শুদ্ধ গান্ধার মোলায়েমভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে। আর শোনাচ্ছে অপরূপ।

একজন প্রশ্ন করলেন, 'এটা কি?' অর্থাৎ কোন্ রাগ?

উত্তর দিলেন না শিল্পী। মৃদু হাসিমুখে বাজিয়েই চললেন। ভাবখানি এই—কি হবে রাগের নাম নিয়ে? এখনকার মেজাজে হাতে এসে যাচ্ছে এমনি ধরনের স্বরবিন্যাস। এতে শিবরঞ্জনী মাটি হচ্ছে না তো? আর নতুন, সুন্দর কোন অনুভব জাগছে কি? তাহলেই আমি এখন তৃপ্ত, সার্থক।

এমনি কত প্রতিশ্রুতিতে ভরা লক্ষ্মণের যন্ত্রী-জীবন। নবীন বয়সেই সঙ্গীত-প্রবীণ। বাংলার নানা বয়োজ্যেষ্ঠ গুণী স্বীকৃতি জানিয়েছেন সেজন্যে। স্বেচ্ছায়, সানন্দে। ভবিষ্যৎ সঙ্গীতক্ষেত্রে এক আশা-ভরসার পাত্র ধারণা করেন সে তরুণকে। মহা-ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বহুমুখী প্রতিভাধর মোহিনীমোহন মিশ্র, গায়ক-তবলিয়া অনাথনাথ বসু, বীণ্‌কার বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রমুখ অনেকেই লক্ষ্মণের গুণমুগ্ধ।

রাগে অসামান্য অধিকারী আর আলাপচারিতে রীতিমত পারঙ্গম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজাতে সমর্থ, বিধিসম্মত ভাবে। এজন্যেই বর্ষীয়ান কলাকারদের প্রিয় তিনি।

এমনি এক-একদিনের আসর তাঁর দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে আছে। একটি আসরে পুরিয়া আলাপ শুনিয়েছিলেন রাত এগারোটা থেকে ভোর পর্যন্ত। আরেকবার রাত একটায় ভীমপলশ্রী বাজাতে শুরু করেন। আর তা শেষ হয় সকালবেলা। শ্রোতাদের মনের পটে বহুদিন আঁকা থাকে সেসব অপরূপ আসরের স্মৃতি।

কলকাতা বেতার কেন্দ্রেরও নিয়মিত শিল্পী লক্ষ্মণ। মাসে মাসে, বছরের পর বছর বেতার শ্রোতাদের তাঁর বাজনা শোনা। দশ বছরের বেশি। কত বিচিত্র সঙ্গীতের অভিজ্ঞতা সেই সব অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। কত দুর্লভ রাগে আলাপচারি, গৎকারী। কি মধুর ঝঙ্কারী সেতার বাজনা লক্ষ্মণ শুনিয়েছেন দীর্ঘকাল যাবৎ।

একটি গ্রামোফোন রেকর্ডও করেছিলেন। ভীমপলশ্রী আর ভৈরবী। ভীমপলশ্রী রাগটি তাঁর বড় প্রিয়।

লক্ষ্মণের স্বভাবও শিল্পীজনোচিত। সরল, সহৃদয়, নির্বিরোধী। অর্থলালসাশূন্য। নিরহঙ্কার। ধ্যানমগ্ন, ভাবুকচিত্ত। সবই ভাল। কিন্তু—

সেই এক কিন্তুতে সব গুণরাশি ছায়াবৃত হয়ে যায়, অকালে। সেই এক কিন্তু—যদু ভট্ট থেকে অমিয়কান্তি পর্যন্ত কত কাল গ্রাসে ফেলেছে। সুরের অমৃত জগতে সেই আকারান্ত গরল। শিল্পী-জীবনের সর্বনাশা শত্রু। অথচ তার শিকার হতে দেখা গেছে নানা সঙ্গীতগুণীকে।

লক্ষণের বেলা তার এইভাবে সূচনা। ছেলেবেলা থেকে উদরাময় ছিল। চিকিৎসায় সুরাহা হয় না দেখে, এক আত্মীয় ব্যবস্থা দেন, ওষুধের মাত্রায় আফিঙ্। ফলে রোগ নিরাময় হল বটে। কিন্তু মাত্রা বৃদ্ধি করে রোগী নেশার কবলে পড়লেন। পরে যোগ হল

নতুন মাধ্যম। স্থলপথ থেকে জলপথে। আবার ইন্ধন জোগাত কোন কোন স্বার্থান্বেষী। হিতাকাঙ্ক্ষী কোন কোন শিষ্য তাঁকে বাঁচাতেও চেষ্টা করতেন সাধ্যমতন।

এই দুর্বলতার জন্যে বাদকশিল্পীর জীবনা প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে যায়। অল্পায়ু সেইজন্যে। মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়, ১৯৫৪ সালে। জন্ম সন ১৯১৫। মধ্যমগ্রামে দিদির আশ্রয়ে লক্ষ্মণের শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল।

অন্য কোন চরিত্রদোষ ছিল না, নেশা ভিন্ন। অবিবাহিত জীবন। কিন্তু কোন নারীসঙ্গ হয়নি। গভীর ধর্মভাব ছিল অন্তরে। এক গুরুর সান্নিধ্যে কিছু কিছু যোগ-সাধনও করতেন। কিন্তু তাও সার্থক হতে পারেনি যম নিয়মের অভাবে।

আর তিন পুরুষের উচ্চমান সেতারী বংশ লুপ্ত হয়ে যায় লক্ষ্মণেব মৃত্যুর সঙ্গে। তবে তাঁদের সাধনফল যে একেবারে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাও নয়। কারণ লক্ষ্মণ একাধিক শিষ্য করেছিলেন। সুতরাং সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়নি মহম্মদ খাঁ (+সাজ্জাদ মহম্মদ)—বামাচরণ-জিতেন্দ্রনাথ-লক্ষ্মণের বাদনধারা তথা পরম্পরা।

লক্ষ্মণের রাগবিদ্যা ও বাদ্যবিশেষত্বের কিছু উত্তরাধিকারী হন তাঁর প্রিয় শিষ্য অমিয়ভূষণ চটোপাধ্যায়। অপরেশ চট্টোপাধ্যায়ও লক্ষ্মণের অপর কৃতী শিষ্য। তা ছাড়া সুকুমার বসু এবং আরো কজন তাঁর কাছে শিখেছিলেন এই ধারায়। তবে একথাও সত্য যে বামাচরণ-জিতেন্দ্র-নাথ-লক্ষ্মণের সেতার উত্তরাধিকার কেউ লাভ করতে পারেননি।

লক্ষ্মণের তুল্য আধার হওয়া চাই তো। কিন্তু সে যে ক্বচিৎ দৃষ্ট সহজাত প্রতিভা। কি আশ্চর্য দখল তাঁর যন্ত্রের ওপর, রাগ-রূপের ওপর, সুর সুরমা ও তাল লয়ের ওপর। সপ্তাহের পর সপ্তা হয়ত যন্ত্রে হাত পড়েনি। এমন অবস্থায় বাজাতে এসেছেন কোন আসরে। কিংবা বেতার প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু ঠিক নিজ মানের সপ্রতিভ বাজনায় রসজ্ঞ শ্রোতাদের মন ভরিয়ে দিয়েছেন।

বেশি মুন্সিয়ানা দেখাতেন বিলম্বিত লয়ের গৎ বাদনে, তান-কারিতে। কি সুষম, অলঙ্ঘ্য লয়দার। ঢিমা চালে সে কি নিপুণতা দেখানো। কখনো সোজা সরল লয়ে চলন নয়। বক্রগতিতে আড়িতে কত অপ্রত্যাশিত রসসৃষ্টি। কি মজায় জমানো আসর।

আলাপচারিতেও তেমনি সুদক্ষ লক্ষ্মণ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বড় বড় রাগের আলাপে সমঝদার শ্রোতাদের আবিষ্ট করে রাখার ক্ষমতা। ধ্রুপদাঙ্গের সেই রূপায়নে রাগ যেন অবয়ব ধারণ করে তাঁর সুর-ঝঙ্কারে।

বাজনা আরম্ভের আগেই কি পরিবেশ রচনার ক্ষমতা। যন্ত্র বাঁধতেই কি সুরসৃজনের কায়দা। যে রাগ বাজাবেন তারই ছায়া ফেলে চলেছেন তার বাঁধবার সময়েই। তৎফের তারগুলি একটির পর একটি বাঁধা হচ্ছে। আবার সঙ্গে সঙ্গেই পর্দায় বেজে চলেছে সে রাগের বিন্যাস। তার আওচার। আলাপের আগেই রাগটি আবহে ভরে ওঠে আসর। এমন দখল তারে তারে, মেজ্‌রাবের টোকায়, কানের মোচড়ে মোচড়ে। আগাগোড়া যন্ত্রটিই যেন সুরের খেলনা। সুর, স্বরগ্রামকে নিয়ে পাকা হাতে খেলানো।

বি ফ্ল্যাটে সুর বাঁধা। এত নামিয়ে রাখতে কোন সেতারীকেই দেখা যায় না! লক্ষ্মণ এমন নামিয়ে বাঁধেন, কারণ রেশ স্থায়ী হয় বেশিক্ষণ। আসর গম্‌গম্ করে সুরের গাম্ভীর্যে। যন্ত্রের আকার বড় নয়। যা সহজে ধরা যায়, সহজে বাজাবার সুবিধা, তাই তাঁর প্রিয় যন্ত্র। এমনি ছোটখাটো যন্ত্র থেকেই এত সুরসৃষ্টি লক্ষ্মণের।

কত প্রকার ধ্বনি এই সেতার থেকে বার করতে পারতেন। বাম আঙুলের টিপে আর মেজ্‌রাবের ঘায়ে হেরফের করে অন্য যন্ত্রের আওয়াজ শোনানো সেতারের মধ্যেই। রাগ বেজে চলেছে পদ্ধতি মত। কিন্তু সঙ্গতি রেখে একেকটি বিদেশী যন্ত্রের আওয়াজ তার মধ্যে শোনা যাচ্ছে। এমনি ধ্বনি-বৈচিত্র্য, যেন খেলাচ্ছলে, সৃষ্টি করতেন ইচ্ছে হলে।

একদিন শিষ্য অমিয়ভূষণকে বললেন, 'আজ রেডিও শুনছেন তো?'

ছাত্র মাত্র এক বছরের ছোট। তাই কাছাকাছি বয়স বলে 'আপনি' সম্বোধন। অন্য সকলের বেলাও তাই। এমন নিরভিমান, অহঙ্কার-শূন্য সরলতা। এমন সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার সকলের সঙ্গে।

শিষ্য সেদিন বাজনা শুনলেন। গৎকারী হল বেহাগ-খাম্বাজ। কিন্তু গুরুর কাছে বিস্ময় জানালেন শিষ্য, 'বিলিতি অর্কেস্ট্রার মতন যন্ত্র শোনাচ্ছিল কি করে? ভায়োলিন, ড্রাম, চেলো, ট্রাম্পেট—এসব আওয়াজ কি করে বের করলেন?'

লক্ষ্মণ হাসতে লাগলেন বালকের মতন।

অত বড় গুণী বীণ্‌কার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তাঁরও এই ধরনের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা—'একদিন আমাদেব বাড়িতে লক্ষ্মণের বাজনা হবে। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে ঝড়ের সঙ্গে। সেই কথা হচ্ছিল। অমনি লক্ষ্মণ সেতাব তুলে নিয়ে বসলেন। আর তাঁর যন্ত্র থেকে আওয়াজ বেরুতে লাগল—মেঘ গর্জন করছে। সোঁ সোঁ শব্দে ঝড়ের হাওয়া বইছে। বৃষ্টি পড়ছে ঝর্ ঝর্ শব্দে। লক্ষ্মণের রাগ জ্ঞান, ছন্দের কাজ—এসবের পরিচয় আগেও পেয়েছি। কিন্তু এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখলাম—এত রকমের ধ্বনি সেতার থেকে শোনানো।'

লক্ষ্মণের বলবার মত নানা আসরও ছিল। তার মধ্যে একটির কথা বলা যায় উপসংহারে। দুর্ধর্ষ তবলিয়া ফিরোজ খাঁর সঙ্গে তাঁর বাজনা। ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনীতে। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

মধ্যপ্রদেশের রায়গড দরবারে ফিরোজ খাঁ তখন নিযুক্ত। মহারাজা চক্রধর সিংহের দরবারের আরেক গুণী অনাথনাথ বসু। ফিরোজ খাঁর সঙ্গে তাঁর রায়গড়েই আলাপ পরিচয় হয়েছিল। অনাথনাথ স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত গায়ক এবং তবলিয়া একাধারে।

সেবার বসু মশায়ই খাঁ সাহেবকে প্রথম নিয়ে এলেন কলকাতায়। উদ্দেশ্য, বাংলার সঙ্গীত সমাজে ফিরোজ খাঁকে পরিচিত করা।

তাঁর প্রথম বাজনা হল শোভাবাজার রাজবাড়িতে। বাংলার তবলাগুণী হীরুবাবুর পিতা মন্মথনাথ গাঙ্গুলীর স্মৃতিবার্ষিকী সেদিন। ফিরোজ খাঁ প্রথমে সঙ্গত করবেন। তারপর বাজাবেন লহরা।

দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ শরীর, পাঞ্জাবী ফিরোজ খাঁকে উপস্থিত গুণী-জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন অনাথবাবু।

মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হারমোনিয়মের সঙ্গে খাঁ সাহেব আগে তবলা সঙ্গত করবেন।

তরুণ বয়সেই নামী বাদক মণ্টুবাবু। সৌখীন গুণী। প্রথম জীবনে তবলায় তালিম নিয়েছেন। তারপর ধরেছেন হারমোনিয়ম। হাতের সঙ্গে তাঁর মুখও সমানে চলে। বোল্‌চাল খুব। বনিয়াদী বংশের বলে আত্মসচেতন। আত্মম্ভরিতাও বিলক্ষণ।

হারমোনিয়মে তিনি গৎ আরম্ভ করতেই ফিরোজ খাঁও ধরেছেন একটি লম্বা সেলামী। কয়েক আবর্ত ঘুরে ঘুরে চলেছে বিচিত্র বোলের হিসাব। সমে এসে দাঁড়াবার লক্ষণ নেই যেন।

হট্‌-বুদ্ধি মণ্টুবাবু ভাবলেন, তবল্‌চী সম্ ধরতে পারছেন না, তাই এই বিলম্ব। তাই তিনি ওপর-চালাকি করে বাঁ হাতে তুড়ি দিয়ে তাল দেখালেন—ধা ধিন্ ধিন্ না...

অপমানিত ফিরোজ খাঁ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত হুঙ্কার দিলেন 'হাঁ?' অর্থাৎ আমায় সম্ দেখাচ্ছ—আমি কি এতই উজবুক? আচ্ছা!

মুখে আর দ্বিতীয় শব্দ নেই ফিরোজ খাঁর। হাতের তবলায় কেবল ঝরতে লাগল বোলের ফুলঝুরি। অফুরন্ত ছন্দের চাতুরী, ধ্বনি-তরঙ্গমালায়। তার মধ্যে কোথায় যে সম্ আর ফাঁক, হারমোনিয়ম-বাদক কিছুই আন্দাজ না পেয়ে গোলকধাঁধায় পড়লেন। ঘুরপাক খেতে লাগলেন গতের মুখটি কোনরকমে আঁকড়ে। মুখড়া রাখতেই বিব্রত। হাত বাঁধা, তান বিস্তারে অক্ষম। মূল বাদক

বিপর্যস্ত, সঙ্গতীয়ার দাপটে—নায়কত্বে। এমন প্রকাশ্য আসরে অপদস্থ দুদান্ত বিয়াজী তবলিয়ার হাত। আর তেমনি দ্রুতলয়ে তৈয়ারী।

রিজয়ীর ভূমিকায় ফিরোজ খাঁর সঙ্গত-পর্ব শেষ হল। এবার তাঁর আত্মম্ভরিতার পালা। আসরেই তিনি এক হঠকারী উক্তি করে ফেললেন—কলকাতায় কে এমন যন্ত্রী আছে যার আমার সঙ্গে বাজাবার হিম্মৎ? আমায় জানালে আমি আর একটা মহফিলে বসব তাঁর সঙ্গে।

যেন লড়াইয়ের আহ্বান। মন্টুবাবুকে বিপর্যস্ত করে ফিরোজ খাঁ ভাবলেন, বাংলায় আর কোন যন্ত্রী নেই তাঁর সঙ্গে সমান তালে বাজাবার।

সে আসরেই তারপর লহরা শোনালেন খাঁ সাহেব। দস্তুরমত ওস্তাদের বাজ—মানলেন সবাই। কিন্তু সঙ্গীতরসের আনন্দ অনেক খানি বিস্বাদ হয়ে গেল ফিরোজ খাঁর এই উদ্ধত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের আহ্বানে।

কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে কথাটা নিয়ে আলোড়ন হতে লাগল। বাইরে থেকে এসে এমন চ্যালেঞ্জ জানালেন একজন বাজিয়ে। এটি গ্রহণ না করলে তো সমস্ত বাঙালী গুণীদেরই অপমান।

সেই সঙ্গে একথাও উঠল, বাজাবে কে? ফিরোজ খাঁ গাওয়াইয়াদের আহ্বান করেননি। তাহলে ভাবনাই ছিল না—ভীষ্মদেব আছেন। রয়েছেন জ্ঞান গোস্বামী। আরো গাইয়ে আছেন তখন, খাঁ সাহেবের সঙ্গে পাল্লা দিতে। কিন্তু যন্ত্রী?

অনেকেরই মনে হল—লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য। কিন্তু তিনি শান্তিপ্রিয়, নন্দনচিত্ত। এসব লড়ালড়ি পছন্দ করেন না। তবু তাঁর অনুরাগীরা এসে ধরলেন—'আপনি এই চ্যালেঞ্জ নিন। না হলে বাঙালীদের মান থাকে না। একদিন বাজান।' লক্ষ্মণ প্রথম আপত্তি জানালেন, 'আমার ঝগড়াঝগড়ি ভাল লাগে না।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। অনাথবাবুর মারফৎ জানানো হলো ফিরোজ খাঁকে। বসু মশায় শুনে সন্তুষ্ট। কারণ লক্ষ্মণের গুণগ্রাহী তিনি। কোথায় বাজনা হবে?

ভবানীপুরে সঙ্গীত সম্মিলনীতে। সেখানে আসর বসল নির্দিষ্ট দিনে।

শ্রোতাদের সামনের সারিতে আচার্যস্থানীয় সুরশৃঙ্গারগুণী ধ্রুপদী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পাশে বিশালকায়, ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রবীণ ধ্রুপদগুণী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অনাথনাথ বসু। আরো নানা শিল্পী, সমঝদার, উৎসাহী শ্রোতায় পূর্ণ বিরাট সঙ্গীতকক্ষ। ফিরোজ খাঁর দ্বন্দ্বে আহ্বানের জন্যে অনেকেই কৌতূহলী হয়ে উপস্থিত। সকলের লক্ষ্যস্থল ফিরোজ খাঁ এবং লক্ষ্মণ।

আসরের উদ্বোধন করলেন স্পষ্টভাষী গোপালচন্দ্র। সেতারীর দিকে চেয়ে সস্নেহে বললেন, 'বাবা লক্ষ্মণ, তুমি বাজাও আজ চ্যালেঞ্জের বাজনা।'

একহারা, ক্ষীণকায় বাঙালী শরীর। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের তরুণ। সুর বাঁধতে বাঁধতে, তরফের তার মেলাতে মেলাতেই দেশ-মল্লারের আবহ সৃষ্টি করলেন। আলাপচারীতে বেশি বিস্তারিত না হয়ে ধরে নিলেন গৎ। কারণ ফিরোজ খাঁ দ্বন্দ্বে মাততে চান তাল লয়ের কূট নীতিতে।

এ আসরের আগে, লক্ষ্মণের কোন কোন ঘনিষ্ঠ জন সংবাদ দেন তাঁকে—ফিরোজ খাঁ ঢিমা চালে লহরা বাজাননি। তবে দ্রুত লয়ে দুর্ধর্ষ।

তা ছাড়াও, রীতি অনুসারেই প্রথমে ধর্তব্য—বিলম্বিত লয়ের গৎ। লক্ষ্মণের দুর্লভ দক্ষতা ঢিমা পদ্ধতিতে। রাগরূপ এই লয়েই সম্যক প্রদর্শনীয়।

এখন তাঁর সেতারে কি মুন্সিয়ানায় দেশমল্লার আরম্ভ হল। তার ঠায় লয়ের বহরে মনে মনে হয়ত প্রমাদ গণ্‌লেন ফিরোজ। এত

বিলম্বিত গতি তাঁর ধারণায় ছিল না। এমন ঢিমা তিনি বাজাননি কখনো। ঠেকা আরম্ভ করাই মুস্কিল।

লক্ষ্মণ দুই আবর্ত ঘুরে এলেন। ঠেকা তখন শুরু হল বটে। কিন্তু সেতারের হিসাবে তবলা চৌদুন হয়ে গেল।

প্রমথবাবু, গোপালবাবু, অনাথবাবু সকলেই বুঝলেন ব্যাপারটা।

গোপালবাবু গম্ভীর কণ্ঠে জানালেন, 'এ কেয়া হোতা খাঁ সাব, ঠিকসে ঠেকা দিজিয়ে।'

কেয়া হোতা—তা খাঁ সাহেব নিজে কি বোঝেননি? ঠিক্‌সে ঠেকা দিতেও তিনি চান। কিন্তু অনভ্যস্ত দুরন্ত হাতে এত ঢিমার হিসাব থাকে না যে।

ইজ্জৎ বজায় রাখতে আবার মরিয়া হয়ে ধরলেন। এবারেও তবলায় দাঁড়াল চৌদুনের ঠেকা। যতবার চেষ্টা করলেন, চৌদুনের নীচে আর নামতেই অপারগ। মূল যন্ত্রের লয়ে নিতান্তই বেগতিক।

সমঝদারদের কারুরই নজর এড়াল না দুর্ধর্ষ তবলিয়ার বেহাল অবস্থা।

গোপালবাবু গ্রাম্য শব্দে মনোভাব প্রকাশ করলেন, যা শুদ্ধ ভাষায় বলা যায়—বন্ধ্যার পুত্র, এই বিদ্যা নিয়ে লড়তে এসেছ?

কাছাকাছি যাঁরা ছিলেন তাঁরা উপভোগ করলেন মন্তব্যটি।

ফিরোজ খাঁ অপদস্থ হতেই যে লক্ষ্মণ বাজনা বন্ধ করলেন তা নয়। তিনি এবার রেজা খাঁনি অর্থাৎ দ্রুত লয়ের গৎ ধরলেন পিলু বারোঁয়া।

ফিরোজ খাঁও তখনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন দ্রুত তালের ঠেকায়। আহত সিংহ যেন ক্ষুধায় শিকার পেয়েছে অনেকক্ষণ পরে। এমন দূনে বাজাতে পেয়ে তবলিয়ার সে কি দাপট। ঠেকা দিতে লাগলেন, বোল ফুটিয়ে চললেন আগুন ছুটিয়ে। লয়কে এবার নিজের কব্জায়

পেয়েছেন। খোয়ানো ইজ্জৎ উসুল করে নিতে চাইলেন আশ মিটিয়ে।

সেতারীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি হালকা চালে সুরের নকওা বুনছেন পিলু বারোঁয়ার রঙে। একেকটি ছক এঁকে দিচ্ছেন। ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে রকমারি ছন্দকারু।

ফিরোজ খাঁরও বহুৎ আচ্ছা জবাবী বাজ হচ্ছে। যত বোল্ ওঠাচ্ছেন টুক্‌রা করছেন, দস্তুরমত ওস্তাদী।

কিন্তু দুর্দান্ত হাতে আরো কিছু হাসিল করতে চাইছেন। লয়কে তাঁর টেনে নেবার চেষ্টা আরো দ্রুত গতিতে।

শ্রোতারা উৎকর্ণ হয়ে উপভোগ করছেন জমজমাট বাজনা। সেতারীর সুরের কাজ আর তবল্‌চীর মেশিনে-চলা তালের হিসাব।

কিন্তু লক্ষ্মণের পক্ষীয়রা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন—এমনি পালোয়ানী লয়ের সঙ্গে কি করে পাল্লা দেবেন সুরের ধ্যানী ?

কিন্তু না, লয়কারীতেও প্রবীণ,অকাট্য, অনড় তরুণ সেতারগুণী। তিনি দিব্য মুন্সিয়ানায় দেড়ীর ছন্দ ধরে নিলেন। ফিরোজ খাঁর মেল ট্রেনের গতি কোন বিপত্তি বাধাতে অক্ষম এবার। সুরযন্ত্র ও তালবাদ্য সুষম ছন্দে চলতে থাকে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সেতারীর অনুরাগীরা।

মিশ্র রাগ বিস্তারের সুন্দর সুন্দর পট রচনা করে লক্ষ্মণের বাজনা শেষ হল একসময়।

মৌখিক ভদ্রতায় ফিরোজ খাঁ লক্ষ্মণের সুখ্যাতি করলেন। প্রমথনাথ প্রমুখ প্রশংসা জানালেন অতিথি তবলা-শিল্পীকে।

কিন্তু মনে মনে সকলেই বুঝলেন, অহঙ্কারী ফিরোজের বেইজ্জতি। আর লক্ষ্মণের লয়দারী। আজকের এই মর্যাদার আসরে তিনিই নায়ক।

কিন্তু কি নিরভিমানী অহমিকাশূন্য তরুণ সুর-সাধক। এত বড়

আহ্বান-দ্বন্দ্ব জয় যেন কিছুই নয়। তিনি যেন কোন নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তি। তারিয়ে তারিয়ে আত্মপ্রশংসা শুনতেও আদৌ আগ্রহী নন। বাজনা শেষ হতেই, যন্ত্র ভরে নিলেন গেলাপে। অনুষ্ঠান বেদী থেকে নেমে এলেন সেতার হাতে। সস্মিত, সরল মুখ-ভাব।

গোপালচন্দ্র প্রমুখ প্রবীণদের নতি জানিয়ে বিদায় প্রার্থনা করলেন, 'এবার তাহলে আমি যাই।'

নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়

মঞ্জুলিকা বাই উৎফুল্ল হয়েছিলেন। এ যেন একটি আবিষ্কার। এক অভাবিত আনন্দের আস্বাদ। হঠাৎ কি আশ্চর্য কণ্ঠের সন্ধান পেয়েছেন। আর তাঁর মন ভরে উঠেছে আনন্দে। এক শিল্পীপ্রাণে আর এক শিল্পীসত্তার সংবেদন।

ছাত্রটি ঘরে আসতেই তাকে রেকর্ডখানি বার করে দেখালেন মঞ্জুলিকা বাই।

জিজ্ঞেস করলেন, 'শুনা নেহি ত ইয়ে গানা ?'

'কি গান ?'

'দরবারি কানাড়া কি এক বাংলা গান !' বাই সাহেবা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'লেকিন গলেমে কেয়া জোয়ারি !'

তারপর একটু থেমে এমনি মন্তব্য করলেন, 'কলকাতায় এমন গাইয়ে আছেন ? আর তুমি এতদূরে এসেছ গান শিখতে ?' শেষে বললেন, 'আচ্ছা এখন দরবারিটা শোন।'

চোঙাওয়ালা গ্রামোফোনের পাশে বসলেন মঞ্জুলিকা বাই। যন্ত্রের সবুজ বনাতের চাকতিতে রেকর্ডখানি ঘুরিয়ে দিলেন। তার ওপরে সাবধানে ধরলেন সাউণ্ড বক্স।

দরবারি কানাড়ায় বাংলা ছোট খেয়াল আরম্ভ হয়ে গেল।

আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়···

যেমন দরাজ তেমনি সুরেলা কণ্ঠ। আর কি মনোরম মীড়ের কাজ।

জায়গাটি কাশীর প্রায় এক প্রান্ত। গঙ্গার ধারে নিরিবিলি

একটি ছোট দোতলা বাড়ি। হরিশ্চন্দ্র ঘাটে যে পথটি সদর রাস্তা থেকে এসে পড়েছে, তারই পাশে। দোতলায় মঞ্জুলিকা বাইয়ের একখানি ঘর। সামান্য কিছু আসবাব। আর একদিকের দেয়ালে টাঙানো দুটি তানপুরা। তার নিচে একজোড়া তবলা। মেঝেতে সতরঞ্চ। সেখানেই বাইজী গ্রামোফোনে রেকর্ডটি বাজাচ্ছিলেন।

আর চোঙার সামনে বসে শুনছেন তাঁর বাঙালী ছাত্রটি—

'আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়,

সুরে বেদন বাজে গোপন হিয়ায়।'

গানের উপযুক্ত জায়গায় তারিফ করছেন মঞ্জুলিকা বাই। ছাত্রকে যেন চিনিয়ে দিচ্ছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

গলার জোয়ারি দেখছ? মীড়ের কাজ ভাল করে শুনে নাও। বোল তানের মতন ধরন দেখ। কি সুর, কি আওয়াজ।'

রেকর্ড বেজে চলে—

সুখ স্মৃতি সাথে এই সুর মায়ায়,

কত দুঃখ মেশে যেন আলোতে ছায়ায়।

আজি নিশীথ রাতে জাগি তারার সাথে,

তারি স্মৃতিটি নিয়া নীরব ব্যথায়।

আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়···

সেই গভীর সুরলিপিতে ঘরখানি ভরে গেল।

কণ্ঠস্বর একই সঙ্গে গম্ভীর ও মধুর।

গানের শেষে মঞ্জুলিকা আর একবার তারিফ করলেন, 'এ তানপুরার গলা।'

অর্থাৎ এই গায়ক তানপুরায় দস্তুরমত কণ্ঠ সাধনা করেছেন, হারমোনিয়মে নয়।

তখন রেকর্ডখানা হাতে নিয়ে বাঙালী ছাত্রটি গায়কের নাম দেখলেন—জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী।

কে ইনি?

গায়কের আরো পরিচয় দিতে মঞ্জুলিকা রেকর্ডের আর এক পিঠ বাজালেন—

আমায় বোলো না ভুলিতে বোলো না···

মর্মস্পর্শী বেহাগ গান ধরবার সঙ্গেই মূর্ত হয়ে :উঠল। মিছরির দানার মতন উচ্ছি ত হতে লাগল রাগের স্বর-লহরী—

আমায় বোলো না ভুলিতে বোলো না।
সে কি ভুলিবার ধন রমণীমোহন।
হেরিবারে করি কত সাধনা॥

একেবারে বন্দেশী হিন্দী খেয়ালের ছক। স্থায়ী কলিতেই জমজমাট স্বর :

চাহি না অন্যে চাহি বনমালী,
সে পদে দিয়াছি মন-প্রাণ ডালি,
নহি সখি আমি পথের কাঙালী,
শ্যাম ভিখারিণী ললনা॥
কলঙ্কেরি কথা হতাশেরি ব্যথা
কতই লাঞ্ছনা গঞ্জনা—
করি সোহাগের হার পরেছি গলায়
ভুলিবারে পাই কত যাতনা॥

কাশীর হরিশ্চন্দ্র ঘাটের সেই সাদামাঠা বাড়ি। তার এক ধারে মঞ্জুলিকা বাইয়ের ছোট ঘরখানি। সেদিন দুখানি বাংলা গানের সুরে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। বাংলায় কি চমৎকার ছোট খেয়াল। কি জোয়ারিদার সুরেলা গলা!

সেদিন এক অচেনা বাঙালী গায়ককে অনেক দূর থেকে বড়ই সমাদর করলেন পশ্চিমাঞ্চলের এক সুরশিল্পী।

মঞ্জুলিকা বাই। আগের যুগের কলাবতী খেয়াল গায়িকা তিনি। তাই গুণীর কাছেই গুণীর কদর হল।

তখন তিনি বর্ষীয়সী। আসরে আর গান শোনান না। একরকম

অবসর নিয়েছেন গায়িকা-জীবন থেকে। কারণ তৈয়ারি গান আর শোনাতে পারেন না। অনেকদিন নিযুক্ত ছিলেন রামপুর দরবারে। এখন অবসর নিয়েছেন। কাশীবাস করছেন হরিশ্চন্দ্র ঘাটের এই বাড়িটিতে।

কিন্তু সঙ্গীতসমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নন মঞ্জুলিকা বাই। কাশীর গুণীজন তাঁকে জানেন। সম্মান করেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগও আছে কোন কোন গায়ক-গায়িকার।

বারাণসীর প্রবীণ ধ্রুপদী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় যেমন। তিনিই তো এই ছাত্রটিকে তাঁর কাছে এনে দেন। ছেলেটি কলকাতা থেকে কাশীতে আসেন ভাল করে গান শিখতে। এতদিন হরিনারায়ণের কাছে ধ্রুপদ শিখেছেন। গলা সেধেছেন। তারপর ইচ্ছে হয় খেয়াল শেখবার।

তখন হরিনারায়ণ বলেন, 'ভাল খেয়াল শিখতে চাও তো মঞ্জুলিকার কাছেই শেখো। তিনি এখন কাশীতে রয়েছেন।'

নিজেই তিনি ছাত্রকে সঙ্গে করে এনেছিলেন।

মঞ্জুলিকা তাই যত্ন করে শেখাচ্ছিলেন ছেলেটিকে। এমন সময় সেই আশ্চর্য গলার সন্ধান পান একটি রেকর্ডে।

বাঙালী ছাত্রটিকে তখনই বাই সাহেবা সে গান শুনিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন, 'কলকাতায় এমন গাইয়ে থাকতে তুমি এত দূরে এসেছ গান শিখতে?'

মঞ্জুলিকা বাই নিজে অমন উৎকৃষ্ট খেয়াল গায়িকা, কিন্তু সেটা যেন কিছু নয়। অজানা গায়ককে সম্মান জানাতে বাই-সাহেবা এমন বিনয় দেখালেন।

ছাত্র কিন্তু তখন কাশীতেই রয়ে গেলেন। এই গায়িকার কাছে যেমন খেয়াল শেখা চলছিল, তেমনি চলতে লাগল। কিন্তু মঞ্জুলিকা বাইয়ের সেই কথা ফলে গিয়েছিল সুন্দরভাবে। তবে তা অনেক পরে।

তার আগে কাশীর জনজীবনে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। সেই শোচনীয় প্লেগের মড়ক। কত মানুষ প্রাণ হারাল, কতজন যে ক্ষীণদৃষ্টি স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ল, তার হিসেব নেই। কাশীর বাঙালীটোলা অঞ্চলে আর বাঙালীদের মধ্যেই ক্ষতি হল বেশি। তবে হিন্দুস্থানীদেরও বিয়োগ-পঞ্জী যে ছিল না তা নয়। সেই করাল গ্রাসে, অনেকের সঙ্গে বারাণসীর এক মূল্যবান শিল্পী-প্রাণও হারিয়ে গেল।

একদিনের সেই কালব্যাধিতে গতায়ু হলেন মঞ্জুলিকা বাই।

তার মাত্র একদিন আগে বাঙালী ছাত্রটিকে তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এলাহাবাদে। না হলে তার অদৃষ্টে কি হত কে জানে।

কিন্তু সেসব কথার সঙ্গে সেই দরবারি কানাড়া গায়কের কোন সম্পর্ক নেই।

মঞ্জুলিকা বাই যখন সেই রেকর্ডটি প্রথম শোনেন, কলকাতায় সে গায়ক তার আগে থেকেই বেশ পরিচিত নাম। ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী। সঙ্গীতাচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁরই স্নেহধন্য শিষ্য।

উৎকৃষ্ট গান যাঁরা ভালবাসেন, সুকণ্ঠের যাঁরা আদর করেন, এ নামটি তাঁদের কাছে তখনই খুব প্রিয়। গ্রামোফোন রেকর্ডের শ্রোতারাও জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদকে আগে থেকে জানেন। 'নিঝুম রাতে'রও আগে থেকে। এই দরবারি কানাড়ার আগেও তাঁর অন্য রেকর্ড হয়েছিল। তখন থেকেই উদীয়মান এ নবীন শিল্পী রেকর্ডের গানে জনপ্রিয়।

কি জমাটি সুরের এক একটি খেয়ালাঙ্গ গান তাঁর। বাংলায় ছোট খেয়াল। হিন্দী খেয়ালেরই ছকে এক একটি গান গড়া—বেশ বোঝা যায়। তা হোক। শুনতে বড়ই ভাল লাগে। আলাদা, ছাড়া ছাড়া তান তো বেশি করেন না। গানের ভাষার মধ্যেই মিলে থাকে তান। রাগের ডৌলটি ঠাসবুনানিতে পাওয়া যায়। আর

মুগ্ধ হয়ে যান সাধারণ শ্রোতারও। কারণ রাগসঙ্গীতের সারবস্তু, এক-একটি রাগের সংক্ষিপ্ত রূপ তাঁরা পান। আর কি অপরূপ এই গায়কের স্বর-ধ্বনি। সেজন্যেই এমন চিত্তাকর্ষক হয়। অতি মধুর অথচ দৃপ্ত পুরুষকণ্ঠ। তার তুলনা বিশেষ ছিল না তখন। নিঝুম রাতে'র আগে আরও সেই রাগ গানের আশ্চর্য বাঁশি গ্রামোফোন রেকর্ডে আরম্ভ হয়ে যায়।

যেমন তাঁর মালকোষের সেই গানখানি—

এ কি তন্দ্রা বিজড়িত আঁখি পাত,
এ কি স্বপন ঘোর মোর দিবস রাত॥

ঠিক এ ছকেরই মূল হিন্দী গান একাধিক আছে। 'মুখ মোর মোর মোস কাঁহাতা যাতা' ইত্যাদি। কিন্তু এখানে শুধুই ভাষান্তরের অনুকরণ নয়। চির-নতুন রাগ-সঙ্গীতের এ এক নব রূপায়ণ। গায়কের নিজস্ব অনুভবে উপস্থাপনায় পরম উপভোগ্য সামগ্রী। সুর যেন আপন প্রাচুর্যে উপচীয়মান। সেজন্যে হিন্দী গানের বন্দেশ বাংলা গানেও পরিপাটিভাবে মানিয়ে গেছে। আর কথার মধ্যেই তান। কোথাও বা গমকের ধরন। কিছুই বেমানান নয় সেই অপূর্ব কণ্ঠে। মালকোশের ঘন-বদ্ধ রূপ শ্রোতাদের কানে ভেসে আসে—

কুহকী নিদয় বধুয়া যাদু জানে।
স্বপন আড়ে যেন টানে মায়া টানে,
চলে আকুল মন তাহারি সাথ।
এ কি তন্দ্রাবিজড়িত আঁখি পাত···

সেই রেকর্ডেরই আর একদিকে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ শুনিয়েছিলেন-

'বরষ বরষ থাকি চাহিয়া···

গৌড়সারঙ্গের সেই মনোরম গানখানি—

তোমারি মিলন আশে
আশা পথ পানে
দখিন সমীরণে উদাস আনমনে

হৃদয় আসন মন পাতিয়া।

বরষ বরষ থাকি চাহিয়া...

অল্প অল্প তানে সুরের ঈষৎ বিস্তারে গানের ভাবকে বহতা রেখেছেন গায়ক। গৌড়সারঙ্গের উদাস করা সুরের মায়ায় শ্রোতারা মুগ্ধ হয়েছেন। এমন সুর কি সুলভ? শোনা যায় কি ইচ্ছা মতন?

এই মালকোশ (এ কি তন্দ্রাবিজড়িত আঁখিপাত) ও গৌড়সারঙ্গ (বরষ বরষ থাকি চাহিয়া) গান দুখানি নিয়েই বোধহয় জ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদের প্রথম রেকর্ড হয়ছিল। গ্রামোফোনে তার পরে তাঁর গান ওই দরবারি কানাড়া (আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়) ও বেহাগ (আমায় বোলো না ভুলিতে বোলো না)।

প্রথম গান থেকেই রেকর্ড জগতে তাঁর জয়যাত্রা আরম্ভ হয়ে যায়। ব্যবসায়ের ভাষায় যাকে বলে হিট সঙ, তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গানই তাই। শ্রোতাদের হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়ে দিয়ে ব্যবসায়িক দিকেও সফল হয়েছিল। কারণ ছোট বাংলা খেয়ালকে, বাংলা ভাষায় রাগসঙ্গীতকে চিত্তাকর্ষকভাবে পেয়েছিলেন বাঙালী শ্রোতারা। বাংলা গানে রাগ ঐশ্বর্যের জমাটি আবেদন।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের গানে এক-একটি রাগ সুপরিচিত হয়ে উঠত সাধারণ শ্রোতাদের মনে। আর একটি পরিপূর্ণ সঙ্গীতরসের আস্বাদনে তৃপ্ত শ্রোতৃবৃন্দ। তাঁর প্রায় প্রতিটি গানের বন্দেশ অতি উপভোগের বস্তু। তাঁর তৃতীয় রেকর্ড বোধহয় 'উজল কাজল দুটি নয়নতারা।'

এমন মধুর মালগুঞ্জ বাংলা গানের রেকর্ডে আগে শোনা গিয়েছিল কি?

উজল কাজল দুটি নয়নতারা,

আকুল চঞ্চল কারে খুঁজিয়া সারা।

আসিলে কে পাশে,

লাজে মুদিয়া আসে,

পিয়াসী সদা ফেরে কার দরশ আসে।
দখিনা বাতাসে কুসুম সুবাসে
কারে মনে পড়ে বহে নয়নে ধারা।

সেই রেকর্ডেরই আর একদিকে জয়জয়ন্তীর মর্মস্পর্শী লীলা রূপ—

দামিনী দমকে যামিনী আঁধার গো,
জাগিয়ে একাকী আশে তোমার গো।
কেঁদে ফেরে বনে বাদল বয়ে হায়,
তারি সনে কাঁদে প্রাণ আমার।

এমনিভাবে প্রতি গানে তিনি শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতে লাগলেন। নট রাগে 'ছন্দে ছন্দে নাচে নন্দদুলাল, শিখী পাখা শিরে বাঁকা গলে বনমাল।' ইমনে 'যা সখি আন তারে মোর বুকে ফিরায়ে।' জৌনপুরীতে 'মম মধুর মিনতি শুন ঘনশ্যাম।' কাফিসিন্ধুতে 'বিশ্বজননী ভাগীরথী মাতঃ গঙ্গে।' ভৈরবীতে 'মন বলে তুমি আছ ভগবান।' কৌশিকী কানাড়ায় 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা' পরজে 'গোপাল গোপাল প্রাণে মোর।' বাগেশ্রীতে 'অনিমেষ আঁখি আমার'। কাফিসিন্ধুতে আমার শ্যামা মায়ের কোলে।' ছায়ানটে 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয় ফিরে আয়।' এইসব গানই সুরের আবেশে মন ভরিয়ে রাখে।

রেকর্ড তাঁর আরো হয়েছিল। যেমন—'বাজে মৃদঙ্গ বীণা', 'মুরলির ধ্বনি কার বাজে'। 'মঞ্জু রাতে আজি তন্দ্রা নিমীল কেন', ইত্যাদি। প্রত্যেক গানই শোনবার মতন এবং জনপ্রিয় হয়েছিল। তা ছাড়াও টপ্পা গানের রেকর্ড করেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। কিন্তু তাঁর গানের পূর্ণ তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব হল না।

গ্রামোফোন রেকর্ডগুলি জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদকে খুবই প্রসিদ্ধি দিয়েছিল বটে। কিন্তু তা তাঁর প্রতিভার সঠিক পরিচায়ক নয়। তাঁর সঙ্গীতকৃতির একটি অংশ মাত্র। তিন মিনিটের এক-একটি গানে

হৃদয় আসন মন পাতিয়া।

বরষ বরষ থাকি চাহিয়া...

অল্প অল্প তানে সুরের ঈষৎ বিস্তারে গানের ভাবকে বহতা রেখেছেন গায়ক। গৌড়সারঙ্গের উদাস করা সুরের মায়ায় শ্রোতারা মুগ্ধ হয়েছেন। এমন সুর কি সুলভ? শোনা যায় কি ইচ্ছা মতন?

এই মালকোশ (এ কি তন্দ্রাবিজড়িত আঁখিপাত) ও গৌড়সারঙ্গ (বরষ বরষ থাকি চাহিয়া) গান দুখানি নিয়েই বোধহয় জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের প্রথম রেকর্ড হয়ছিল। গ্রামোফোনে তার পরে তাঁর গান ওই দরবারি কানাড়া (আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়) ও বেহাগ (আমায় বোলো না ভুলিতে বোলো না)।

প্রথম গান থেকেই রেকর্ড জগতে তাঁর জয়যাত্রা আরম্ভ হয়ে যায়। ব্যবসায়ের ভাষায় যাকে বলে হিট সঙ, তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গানই তাই। শ্রোতাদের হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়ে দিয়ে ব্যবসায়িক দিকেও সফল হয়েছিল। কারণ ছোট বাংলা খেয়ালকে, বাংলা ভাষায় রাগসঙ্গীতকে চিত্তাকর্ষকভাবে পেয়েছিলেন বাঙালী শ্রোতারা। বাংলা গানে রাগ ঐশ্বর্যের জমাটি আবেদন।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের গানে এক-একটি রাগ সুপরিচিত হয়ে উঠত সাধারণ শ্রোতাদের মনে। আর একটি পরিপূর্ণ সঙ্গীতরসের আস্বাদনে তৃপ্ত শ্রোতৃবৃন্দ। তাঁর প্রায় প্রতিটি গানের বন্দেশ অতি উপভোগের বস্তু। তাঁর তৃতীয় রেকর্ড বোধহয় 'উজল কাজল দুটি নয়নতারা।'

এমন মধুর মালগুঞ্জ বাংলা গানের রেকর্ডে আগে শোনা গিয়েছিল কি?

উজল কাজল দুটি নয়নতারা,

আকুল চঞ্চল কারে খুঁজিয়া সারা।

আসিলে কে পাশে,

লাজে মুদিয়া আসে,

পিয়াসী সদা ফেরে কার দরশ আসে।
দখিনা বাতাসে কুসুম সুবাসে
কারে মনে পড়ে বহে নয়নে ধারা।

সেই রেকর্ডেরই আর একদিকে জয়জয়ন্তীর মর্মস্পর্শী লীলা রূপ—

দামিনী দমকে যামিনী আঁধার গো,
জাগিয়ে একাকী আশে তোমাব গো।
কেঁদে ফেরে বনে বাদল বয়ে হায়,
তারি সনে কাঁদে প্রাণ আমার।

এমনিভাবে প্রতি গানে তিনি শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতে লাগলেন। নট রাগে 'ছন্দে ছন্দে নাচে নন্দদুলাল, শিখী পাখা শিরে বাঁকা গলে বনমাল।' ইমনে 'যা সখি আন তারে মোর বুকে ফিরায়ে।' জৌনপুরীতে 'মম মধুর মিনতি শুন ঘনশ্যাম।' কাফিসিন্ধুতে 'বিশ্বজননী ভাগীরথী মাতঃ গঙ্গে।' ভৈরবীতে 'মন বলে তুমি আছ ভগবান।' কৌশিকী কানাড়ায় 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা' পরজে 'গোপাল গোপাল প্রাণে মোর।' বাগেশ্রীতে 'অনিমেষ আঁখি আমার'। কাফিসিন্ধুতে আমার শ্যামা মায়ের কোলে।' ছায়ানটে 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয় ফিরে আয়।' এইসব গানই সুরের আবেশে মন ভরিয়ে রাখে।

রেকর্ড তাঁর আরো হয়েছিল। যেমন—'বাজে মৃদঙ্গ বীণা', 'মুরলির ধ্বনি কার বাজে'। 'মঞ্জু রাতে আজি তন্দ্রা নিমীল কেন', ইত্যাদি। প্রত্যেক গানই শোনবার মতন এবং জনপ্রিয় হয়েছিল। তা ছাড়াও টপ্পা গানের রেকর্ড করেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। কিন্তু তাঁর গানের পূর্ণ তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব হল না।

গ্রামোফোন রেকর্ডগুলি জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদকে খুবই প্রসিদ্ধি দিয়েছিল বটে। কিন্তু তা তাঁর প্রতিভার সঠিক পরিচায়ক নয়। তাঁর সঙ্গীতকৃতির একটি অংশ মাত্র। তিন মিনিটের এক-একটি গানে

কোন রাগের পূর্ণ রূপ দেখানো যেমন অসম্ভব, তেমনি গায়কেরও। রাগের বিস্তারবিহীন ডৌলটি মাত্র এমনি ছোট খেয়ালে গায়ক দেখাবার সময় পান। সাধারণ শ্রোতারা অবশ্য সন্তুষ্ট থাকেন রাগের এই সংক্ষিপ্ত রূপে। গায়কের অসাধারণ কণ্ঠসম্পদ তাদের চিত্তাকর্ষণ করে থাকে। মুগ্ধ করে রাখে রাগসঙ্গীতের সুরের বাঁধুনি ও বিন্যাস। কিন্তু তা-ই সব নয়।

সৃজনশীল শিল্পীদের মতন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের প্রতিভা আসরেই পূর্ণভাবে স্ফূর্ত হত। সঙ্গীতাসরেই তাঁর যথার্থ পরিচয়। সম্পূর্ণ রীতির গায়ন-শিল্পী তিনি। ধ্রুপদ ও খেয়ালের নিষ্ঠাবান গায়ক। পদ্ধতিগত শিক্ষা যেমন পেয়েছেন, আসরেও তা পরিবেশন করতেন। নিয়মনিষ্ঠ চর্চার সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর লোকোত্তর সুর-কণ্ঠ।

পিতৃব্য রাধিকাপ্রসাদের হাতে-গড়া শিষ্য জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। ধ্রুপদ ও খেয়ালে তখনকার ভারতের এক শ্রেষ্ঠ কলাবত রাধিকাপ্রসাদ।

তাঁর পুরো তালিম ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানেন্দ্র পেয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে একাদিক্রমে চোদ্দ বছর যাবৎ—রাধিকাপ্রসাদের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত শিখেছিলেন তিনি।

অন্য কোন বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানেন্দ্র করেননি। সঙ্গীতবিদ্যার সাধনই তাঁর ছিল একান্ত। ধ্রুপদ ও খেয়ালের পূর্ণ শিক্ষা রাধিকাপ্রসাদের কাছে তিনি পান। তাঁরই নির্দেশে হয় তাঁর বিধিবদ্ধ কণ্ঠসাধনা। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর সহজাত অনুপম সঙ্গীত-স্বর। তার সেই দুর্লভ জোয়ারিদার সুরেলা কণ্ঠ।

একাধারে বীর্য ও মাধুর্য—জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গীত ও কণ্ঠের এই বৈশিষ্ট্য। এই অনন্যতার জন্যেই তিনি চিহ্নিত হন। প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং স্বাক্ষর রেখে যান সঙ্গীতচর্চার ইতিহাসে। সাধারণ শ্রোতৃবৃন্দ থেকে শ্রেষ্ঠ কলাকারদের পর্যন্তও প্রীতির পাত্র হন। আসরে আসরে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়, অনুরাগে অভিষিক্ত হয় তাঁর সঙ্গীতজীবন।

সঙ্গীতরসেই পরিপূর্ণ ছিল তাঁর সত্তা তাঁর জীবন। সদা সুরে ভরপুর। যৌবনকাল থেকেই সঙ্গীতজগতের নানা দিকে তিনি দেখা দিয়েছেন। সুরের অঞ্জলি নিবেদন করেছেন পরম আনন্দে। আপনি সার্থক হয়েছেন, চরিতার্থ করেছেন শ্রোতাদের। ছোট বড় নানা ঘরোয়া আসরে, বৃহৎ সঙ্গীত-সম্মেলনে, গ্রামোফোন রেকর্ডে, বেতার-কেন্দ্রে—সর্বত্র। প্রাদেশিক এবং সবভারতীয় ক্ষেত্রে।

সর্বক্ষণ সুরে পূর্ণ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। আসরে আসরে গানের মেজাজ তাঁর সদা-প্রস্তুত। সুরে সুরে যেমন নিজে মেতে থাকতেন, তেমনি মাতিয়ে দিতেন শ্রোতাদের। তাঁর কোন আসর ব্যর্থ হত না তাই। কি ধ্রুপদের আসর, কি খেয়ালের আসর—তাঁর প্রতিটি অনুষ্ঠান শ্রোতাদের আশা পূরণ করত। পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরতেন তাঁরা।

ধ্রুপদ ও খেয়াল দুই রীতির ডালি নিয়েই জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ সঙ্গীত-ক্ষেত্রে এসেছিলেন। ক্রমে ধ্রুপদের আসর কমে আসে তাঁর।

তার একটি কারণ—১৯৩২-৩৪ সাল থেকে কলকাতায় ধ্রুপদের আসরে ভাঁটা পড়তে থাকে। ধ্রুপদের আসর তারপর স্বল্পতর হয়ে আসে ক্রমে ক্রমে।

অন্য কারণ, খেয়াল গানে তিনি উত্তরোত্তর স্ফূর্তি লাভ করতে থাকেন। তাঁর প্রতিভা খেয়ালের তান বিস্তারে ও সুরবিহারে আকৃষ্ট হয় বেশি। আমন্ত্রিত হলে ধ্রুপদ তিনি সঙ্গীতজীবনের শেষ পর্যন্ত গেয়েছেন বটে। কিন্তু খেয়াল গানই তাঁর প্রতিভার প্রধান বাহন হয়েছিল।

তবে ধ্রুপদের গাম্ভীর্য তিনি চমৎকারভাবে মিশিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর খেয়ালে। যেমন, গমকের ধরনে কোন কোন তান তাঁর খেয়ালের অঙ্গে মানিয়ে দিতেন। ওজস্বিতার সঙ্গে মধুরতা। যেমন তাঁর কণ্ঠে, তেমনি গানের অবয়বে।

সেই মাধুর্য তিনি মিছরির দানার মতন গানে গানে ছড়িয়ে দিতেন।

আর আসরে আসরে মাৎ হয়ে যেতেন শ্রোতারা। কলকাতার আসর থেকে সেকালের অখণ্ড বাংলার নানা জেলার সম্মেলনে। নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন থেকে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে।

তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যায়।

সেবার চট্টগ্রাম সঙ্গীত সম্মেলনে বাইরে থেকে বেশ কয়েকজন শিল্পী এলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। প্রথম দিন অন্যদের সঙ্গে তাঁরও গান হল। তাঁর গানে সে কি উদ্দীপনা জাগল আসরে। শ্রোতারা এক অপূর্ব অভিজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

আর একটি সনির্বন্ধ অনুরোধ এল শ্রোতাদের পক্ষ থেকে—'আমরা একদিন আশ মিটিয়ে শুধু জ্ঞান গোস্বামীর গান শুনব।'

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ সম্মত হলেন সানন্দে। তখন সম্মেলনের উদ্‌যোক্তারাও সে ব্যবস্থা করলেন।

সেদিন সকলের সে আশা পূরণ করেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। প্রায় তিন ঘণ্টা গান শুনিয়ে চট্টগ্রামবাসীদের তৃপ্তি দিয়ে দিলেন।

একবার রাজশাহী সম্মেলনেও গিয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। শ্রোতাদের মধ্যে সেখানে মনীষী সঙ্গীতজ্ঞ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের গানে সাড়া পড়ে যায় সম্মেলনে। ধূর্জটি-প্রসাদও আন্তরিক প্রশংসা করেছিলেন।

সদাই সুরে ভরপুর থাকতেন তিনি। আর শ্রোতাকে যেমন সেই সুরে উদ্দীপিত করতে পারতেন, তেমনি নিজেও সুরের পরশে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন।

সেবার ভবানীপুরে সঙ্গীত সম্মিলনীতে যাদবকৃষ্ণ বসুর স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠান। এই সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা যাদবকৃষ্ণ। সেজন্যে সম্মিলনীর এটি বড় আসর। বহু শ্রোতা এসেছেন। শিল্পীদের মধ্যে আছেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। এবার তাঁর গানের পালা।

তাঁরই এক শিষ্য হারমোনিয়মে সঙ্গত করতে বসেছেন পাশে। হারমোনিয়মে বেলো করে চাবিতে হাত দিতেই তাঁব প ম প-তে

আঙুল ছুঁয়ে গেল। শিষ্য কোন রাগের কথা ভেবে প ম প পর্দায় আঙুল দেননি, আপনা থেকেই পড়ে যায় হাত। অমনি জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের মনে কেদারার আভাস জেগে ওঠে। অন্য রাগ তিনি গাইবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু কেদারার একটু ছোঁয়াচ মনে লাগতেই ধরে নিলেন কেদারা।

কোমল মধুর কেদারায় মেজাজ এসে গেল। এমন চমৎকারভাবে কেদারার পকড় দেখিয়ে গান ধরলেন যে মনে হল এই রাগের জন্যই প্রস্তুত হয়ে এসেছেন আসরে। তখন প্রাণের আরামে কেদারা গাইতে গাইতে তিনি আসর একেবারে জমিয়ে দিলেন। তাঁরই মতন তন্ময় হয়ে গেলেন শ্রোতারা। বিরাট কক্ষ ভরে গিয়ে জানালার সামনে বারান্দায় পর্যন্ত লোক দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন। গায়কের কণ্ঠে যেন সুরের নির্ঝরিণী। কেদারার এত বিস্তার করতে লাগলেন যা সচরাচর এই রাগে শোনা যায় না। গান থামবার পরেও মনে হল সে প্রস্রবণের বিরাম নেই।

শ্রোতারা কেউ ধারণাও করতে পারতেন না—এই রাগের উদ্দীপন শিল্পীর মনে জেগেছিল গান আরম্ভ করবার আগের মুহূর্তেই। হারমোনিয়মে কেদারার আকস্মিক আভাস পেয়ে।

রাগের রূপ কি মহিমায় প্রতিমা হয়ে উঠত তাঁর সেই অপরূপ সুরেলা কণ্ঠে। সেবার নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনেও তার একটি দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ পরিচালিত এই সম্মেলন সেবার হয়েছিল সেনেট হলে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বাগেশ্রী গেয়েছিলেন ‘কৌন গত ভৈ....।’ এক কথায় বলতে গেলে আসরে সেদিন সাড়া পড়ে যায়।

সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য সুরসাধক আবদুল করিম খাঁ। তিনি গায়কের কণ্ঠের বড় তারিফ করেছিলেন। আর তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করেন, পরিচয় নেন বর্ষীয়ান মহাগুণী। খাঁ সাহেব তারপর যে কদিন কলকাতায় ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর

কাছে যেতেন। আবদুল করিম সাদরে কিছু গানও দিয়েছিলেন তাঁকে। খাঁ সাহেবের সেই একবারই কলকাতায় সঙ্গীত সম্মেলনে আসা। তার কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। যদি তিনি আরো কিছুকাল জীবিত থাকতেন এবং পরে কলকাতায় আসতেন, জ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থেকে যেত। কারণ তাঁর কণ্ঠমাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন আবদুল করিম খাঁ।

বহু রাগেই জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ পারদর্শী ছিলেন। নানা রাগই শুনিয়েছেন আসরে আসরে। সংগ্রহ তাঁর প্রচুর ছিল। রাধিকা-প্রসাদের বিপুল সঞ্চয় তিনি পেয়েছিলেন অনেকখানি। আর তাঁর কাছে শিক্ষাব ভিত্তিও ছিল পাকা। তাই রাগবিদ্যা তাঁর খুব বিস্তৃত, বিভিন্ন রাগরূপের জ্ঞানও যথাযথ ছিল।

কোন রাগের বিকৃতি তাঁর নিজেরও যেমন ছিল না, তেমনি সহ্য করতে পারতেন না অন্যেরও। সিদ্ধ স্বরের জন্যে যেমন, শুদ্ধ রাগ পরিবেশনের জন্যেও গুণীজনের স্বীকৃতি তিনি বরাবর পেয়েছেন। শুধু বাংলায় নয়, পশ্চিমাঞ্চলেও। আগ্রার সেই আসরের কথাও এখানে বলা যায়। সেবার কত সর্বভারতীয় কলাবত এসেছিলেন আগ্রায়। নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের সেই আগ্রা অধিবেশনে।

তাঁদের সামনে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ছায়ানটে গাইলেন—

পল পলহুঁ শেচ্ বিচার কর ম্যয়,
কাহে প্রীতম অবহু নাহি আয়ে ॥
ভোর ভৈ সব আয়ে পিয়ার বা
তুম সোভন কে দ্বার বসায়ে ॥

তখন সমবেত সব ওস্তাদরাই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এই বাঙালী শিল্পীকে। তাঁর সঙ্গীত-কণ্ঠ, তাঁর রাগরূপায়ন, তাঁর দরদী গায়নভঙ্গী—সব কিছুরই তাঁবা তারিফ করেছিলেন।

এমনি নানা প্রশংসাধন্য আসরে তাঁর সঙ্গীতজীবন সার্থক ছিল, পরিপূর্ণ ছিল। এ বিষয়ে আর বেশী উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন।

রাগের কথায় বলা যায়, যা তিনি গাইতেন, সবই হত অতি উপভোগ্য। তবু তাঁর সেই উদাত্ত কণ্ঠে দরবারী কানাড়া, ইমন কল্যাণ, বাগেশ্রী, ছায়ানট, এই ধরনের রাগের যেন তুলনা ছিল না। টানা টানা সুরের আন্দোলন কি হৃদয়স্পর্শী হত তাঁর দরাজ মাধুর্যময় স্বরলহরিতে। যাঁরা সে সব শুনেছিলেন, সঙ্গীতের এক শ্রেষ্ঠ আস্বাদ লাভ করেছিলেন!

'স্বর্ণ-কণ্ঠ' যাকে বলে, তা-ই জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের ছিল। নানা শ্রেষ্ঠ কলাবতের প্রীতির পাত্র তিনি হন সেই গুণে। যেমন আবদুল করিম খাঁ, তেমনি বিষ্ণুদিগম্বর পালুসকর কিংবা ফৈয়াজ খাঁরও।

অমৃতকণ্ঠ গায়ক, সঙ্গীতাচার্য, বিষ্ণুদিগম্বর কয়েকবার কলকাতায় এসেছিলেন। প্রতিবারই অতিথি হন সঙ্গীতপ্রেমী ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের পাথুরিয়াঘাটা ভবনে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদও সে গৃহে দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন। সেখানেই তিনি পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বরের সঙ্গে পরিচিত ও তাঁর স্নেহধন্য হন। পণ্ডিতজী তাঁর সঙ্গীতকণ্ঠে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং রাগবিদ্যাও কিছু দেন তাঁকে।

ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁও জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের গলার দস্তুরমত তারিফ করতেন। বলতেন, 'ওঃ জ্ঞান, তুমারা কেয়া আওয়াজ!'

আর ওই গলার জন্যে ভালবেসে তালিমও তাঁকে দিতেন। খাঁ সাহেবও সে সময় আতিথ্য স্বীকার করতেন ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের। সেখানেই ফৈয়াজ খাঁর কাছে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ শিক্ষা সংগ্রহ করেন। তা ছাড়া একবার খাঁ সাহেবের কাছে সেজন্য বরোদাতেও গিয়েছিলেন কিছুদিন।

এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ পুরো তালিম রাধিকাপ্রসাদেরই পেয়েছিলেন। পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর বা ফৈয়াজ খাঁর কাছে সে সময় কিছু কিছু নেন মাত্র। তার আগেই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং প্রতিষ্ঠিত গায়ক। আবদুল করিম খাঁ সম্পর্কেও একই কথা।

অনিন্দ্য কণ্ঠে ধ্রুপদ খেয়ালেও যে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ রসসৃষ্টি করতেন শিল্পীরূপে সেই তাঁর যথার্থ পরিচয় ছিল। সেই গুণেই অত জনপ্রিয় হয়েছিলেন তিনি।

আসরে রীতিসম্মত খেয়াল ও ধ্রুপদ গাইতেন। বাংলা খেয়াল শোনাতেন গ্রামোফোন রেকর্ড ও বেতারকেন্দ্রে। কিন্তু তা ছাড়া অন্যান্য বাংলা গানও গাইতেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। অবশ্য সবই রাগাত্মক সঙ্গীত। সে সমস্ত বাংলা গানেও তাঁর অন্তরের দরদে রসসৃজন ঠিকই হত।

বাংলা টপ্পা চমৎকার গাইতেন তিনি। নিধুবাবুর টপ্পা গান তাঁর রেকর্ডও হয়েছিল। টপ্পা তিনি শোনাতেন নিতান্ত ঘরোয়া আসরে; সেজন্যে বাইরে অনেকের সেকথা জানা ছিল না। কিন্তু গুণীজনেরা অবহিত ছিলেন সে বিষয়ে। বাংলার দুই টপ্পাশিল্পী কালিপদ পাঠক ও বিজয়লাল মুখোপাধ্যায় সেজন্যে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদকে যথেষ্ট সমাদর করতেন। দুজনেই তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও আসতেন তাঁর কাছে। গান শুনে সম্মান জানাতেন।

'দিন যাবে মা কথাই রবে,
মা তোর নামে কি এমনি ধারা...'

এই টপ্পাটি অপূর্ব গাইতেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। সিন্ধু কাফির সকরুণ সুরে গায়কের ভক্তি-ভাব অতি মর্মস্পর্শী হত মধ্য লয়ের দোলনে। দানাভরা কথার তানগুলি সেই অনুপম কণ্ঠ থেকে মিছরির দানার মতন ঝরে ঝরে পড়ত। আর তার সঙ্গে শিল্পীর অশ্রুপূর্ণ সুনয়ন পরিপূর্ণ করত সেই ভাবের দ্যোতনা।

তাঁর গান ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের বাড়িতে সবচেয়ে বেশী শোনা যেত। সেকাল-একালের সন্ধিযুগের বাংলায় রাগসঙ্গীত প্রচারের সুখ্যাত এক যুগপুরুষ ছিলেন ঘোষ মহাশয়। উচ্চমানের সেই নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন এবং সঙ্গীত প্রতিযোগিতার তিনি প্রধান হোতা ছিলেন বলে কেবল নয়। তাঁর পাথুরিয়াঘাটা-ভবন সুপরিচিত হয় বহু উল্লেখ্য আসরের জন্যে।

আর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ সেখানে বছরের পর বছর বাস করার ফলে কত গানের আসরই সেখানে হয়ে গেছে। সে সব তো সদরের সেই দোতলার বৃহৎ জলসাঘরের কথা।

আরো ঘরোয়াভাবে, ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় জ্ঞান বা জ্ঞেনুর গান এক-একদিন শুনতেন। আর সে সব অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানেও তাঁর গান হত প্রথম শ্রেণীর শিল্পকর্ম। কারণ অন্তর তাঁর নিত্যই সঙ্গীত রসে নিষিক্ত থাকত। শুধু আবাহনের অপেক্ষা। উপযুক্ত উদ্বোধন হলেই দেখা দিত সে সুরধুনির ধারা।···

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা হয়ত উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ এসে বসেছেন সদরের দোতলার ছাদে। মুক্ত দখিনা বাতাসে তখন আকাশ মনোরম হয়ে উঠেছে। একটু দূরের ঘরে ঘরে বিজলী আলো। কিন্তু ছাদে শুধু মৃদু জ্যোৎস্নাকিরণ ঢালা।

পাশের কাউকে ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বললেন, 'জ্ঞেনু কোথায়? ডাকো তো। একটু গান হলে বেশ হয়।'

জ্ঞানেন্দ্রকে হয়ত পাওয়া গেল সদরের সেই তেতলা ঘরে। সেখানেই তিনি থাকতেন। দোতলার ছাদে এখন এলেন ভূপেন্দ্র-কৃষ্ণের কাছে। সরঞ্জামের মধ্যে শুধু একটি হারমোনিয়ম আনা হল।

'এবার একটু গান শোনাও জ্ঞেনু।'

বলা বাহুল্য, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ জানেন এই পরিবেশে কি গান মানায়; কোন্ ধরনের গান ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের অন্তরের প্রিয়। তাই তিনি ধরলেন রবীন্দ্রনাথের গভীর ভাবের আবেগ-বিধুর ধ্রুপদাঙ্গ গান।

জ্যোৎস্না রাতের উন্মুক্ত ছাদ। দক্ষিণের হাওয়া লুটিয়ে বয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর অদূরেই এই পাথুরিয়াঘাটা ভবন।

ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের একটি প্রিয় গান জ্ঞানেন্দ্র আরম্ভ করলেন—

নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে
ওগো অন্তরযামী,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া
তোমারে হেরিব আমি,
ওগো অন্তরযামী ॥

বাগেশ্রীর হৃদয়-মথিত-করা স্বর বিস্তার। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের উদাত্ত মধুর কণ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের বন্দনীয় বাণী। একযোগে মায়াজাল রচনা করতে লাগল গ্রীষ্ম-রাতের সেই মুক্ত আকাশতলে। আর জাগাল বৃহৎ লোকের প্রেরণা—

জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে
তোমার চরণে নমিয়া পুলকে
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম,
তোমারে সঁপিব স্বামী,
ওগো অন্তরযামী ॥
দিনের কর্ম সাধিতে সাধিতে
ভেবে রাখি মনে মনে,
কর্ম-অন্তে সন্ধ্যাবেলায়
বসিব তোমারি সনে।
দিন-অবসানে ভাবি বসে ঘরে
তোমার নিশীথ-বিরাম সাগরে
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা
নীরবে যাইবে নামি,
ওগো অন্তরযামী ॥

স্তব্ধ হয়ে শুনে ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বললেন, 'এবার সেই ছায়ান্ট।'
জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গাইতে লাগলেন তন্ময় হয়ে—

অল্প লইয়া থাকি তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়।

কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে
প্রাণ করে 'হায় হায়' ॥
নদীতটসম কেবলই বৃথাই
প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া
ঢেউগুলি কোথা যায় ॥
যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে
সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে
তবে নাহি ক্ষয়, সবই জেগে রয়
তব মহা মহিমায় ॥
তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু,
হারায় না কভু অণু পরমাণু
আমারই ক্ষুদ্র হারাধনগুলি
রবে না কি তব পায় ॥...

রবীন্দ্রনাথের এই গানখানি জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের নিজেরও অতি প্রিয় ছিল। এটি রেকর্ড করাবারও ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুমতি তাঁকে দেননি। অগত্যা ওই গানেরই ছক হুবহু অনুকরণে কাজী নজরুলকে দিয়ে রচনা করে নেন। তারপর রেকর্ডও করেছিলেন ছায়ানটে—

'শূন্য এ বুকে পাখি মোর
ফিরে আয় ফিরে আয়'

এখানে বলা যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ যেসব বাংলা খেয়াল অঙ্গের গান রেকর্ড করেন তার বেশীর ভাগই নজরুলের রচনা। শুধু 'আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশী বাজায়' ও 'উজল কাজল দুটি নয়নতারা' তাঁর জন্যে লিখে দেন অভিনেতা-নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী।

সুরের বরপুত্র জ্ঞানেন্দ্র। তাঁর জীবনকথা আদ্যোপান্ত সঙ্গীতেরই

প্রসঙ্গ। শুধু শেষের একটি অধ্যায় ভিন্ন। তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানে দেওয়া হল।

সঙ্গীত-কেন্দ্র বিষ্ণুপুরে ১৯০২ সালের বড়দিন (১০ই পৌষ, বৃহস্পতিবার ১৩০৯। ২৫ ডিসেম্বর) তাঁর জন্ম হয়। গোঁসাইপাড়ার এই গোস্বামী পরিবার সঙ্গীতচর্চার জন্যে বিখ্যাত ছিলেন বিষ্ণুপুরে। আর এক কারণেও তাঁদের প্রসিদ্ধি ছিল। তাঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে স্মরণীয় শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর। শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী বাংলার বৈষ্ণব সমাজের ত্রয়ী নেতা নরোত্তম, শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দের অন্যতম শ্রীনিবাস ঠাকুর।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের জন্মের তিনশো বছর আগে থেকে বিষ্ণুপুরে এবং এই বংশে বৈষ্ণব ধর্মচর্চার প্রবর্তন হয়েছিল। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের জীবনকালেও বৈষ্ণব আচার্যের বৃত্তি দেখা যায় তাঁদের পরিবারে। সিমলাপালের রাজা মদনমোহন সিংহ প্রমুখ তাঁদের অনেক শিষ্য বিষ্ণুপুর অঞ্চলে ছিলেন। তাঁদের সেখানে পরিচিতি ছিল গোঁসাই বংশ বলে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের মনেও বৈষ্ণব সংস্কার ভালভাবে ছিল। তাঁর জীবনের সেই সঙ্কটময় পর্বে দেখা গিয়েছিল যার তীব্র প্রতিক্রিয়া। সে ঘটনা অনেক পরের কথা।

তাঁর জন্মের অনেক আগে থেকে এ বংশে সঙ্গীতচর্চা হত। তাঁর পিতা-পিতামহ-পিতৃব্যরা প্রত্যেকেই সঙ্গীতসেবী। তাঁদের মধ্যে রাধিকাপ্রসাদ তো ভারতবিখ্যাত।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের পিতামহ জগৎচাঁদ গোস্বামী ছিলেন বিষ্ণুপুরের সবচেয়ে নামী পাখোয়াজী। বিষ্ণুপুরের আদি ধ্রুপদাচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের পুত্র ও শিষ্য রামকেশব ভট্টাচার্য, রামশঙ্করের আর এক শিষ্য কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতির গানের সঙ্গে জগৎচাঁদ সঙ্গত করতেন। যদু ভট্ট কখনো বিষ্ণুপুরে এলে (বেশীর ভাগই তিনি বিষ্ণুপুরের বাইরে থাকতেন), তাঁর গানের সঙ্গেও পাখোয়াজ বাজাতেন জগৎচাঁদ।

তাঁর পাঁচ পুত্রের সকলেই সঙ্গীতসেবী। প্রথম কীর্তিচাঁদ, পিতার শিক্ষায় পাখোয়াজী হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিপিনচন্দ্র, এসরাজ (এবং তার ময়ূরমুখী সংস্করণ তাউস যন্ত্রের) বাদক ছিলেন—পাঠকপাড়ার নীলমাধব চক্রবর্তী তার গুরু। তৃতীয় রাধিকাপ্রসাদ, বাল্যকাল থেকেই বিষ্ণুপুরে গান শিখতেন। তারপর ১৫ বছর বয়সে কলকাতায় রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করেন। বেতিয়া ঘরানার বিখ্যাত গায়ক ভ্রাতৃদ্বয় শিবনারায়ণ ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে দশ বছরেরও বেশী শিক্ষার পরে প্রতিষ্ঠিত হন কলকাতা তথা বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্র। জগৎচাঁদের চতুর্থ পুত্র লোকনাথও গায়ক হয়েছিলেন এবং শান্তি-নিকেতনে নিযুক্ত থাকেন তাঁর অল্পায়ু জীবনে। সর্বকনিষ্ঠ নকুড়চন্দ্র একাধারে ধ্রুপদ খেয়াল গায়ক এবং সেতার সুরবাহার বাদক হয়েছিলেন। তিনি ধ্রুপদ ও খেয়াল শেখেন রাধিকাপ্রসাদের কাছে এবং সেতার সুরবাহারে হন নীলমাধব চক্রবর্তীর শিষ্য। নকুড়চন্দ্রও শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

জগৎচাঁদের দ্বিতীয় পুত্র এস্রাজবাদক বিপিনচন্দ্র হলেন জ্ঞানেন্দ্রের পিতা। বিপিনচন্দ্রের সঙ্গীতজীবন সম্বন্ধে এখানে আর একটু যোগ করা যায়। এস্রাজ (ও তাউস)-বাদক হলেও তিনি একজন গায়কও ছিলেন বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত সমাজে।

তিন পুরুষের এই সঙ্গীতচর্চার অন্তরঙ্গ পরিবেশে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ লালিত হন। আর শৈশব থেকেই স্বভাবের প্রেরণায় প্রকাশ পায় তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠ। তাঁর গায়ন-প্রতিভা লক্ষ্য করে একেবারে বালক বয়সেই তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করা হয়। বিদ্যাশিক্ষার পরিবর্তে সঙ্গীতের পাঠ দেওয়া হত তাঁকে। পিতৃব্য লোকনাথ জ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদের ছ বছর বয়স থেকে সঙ্গীতশিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন লোকনাথ। জ্ঞানেন্দ্রের সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভের দু বছর পরে চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

তারপরই রাধিকাপ্রসাদের কাছে জ্ঞানেন্দ্রের সঙ্গীতশিক্ষার সূত্র-

পাত। তাঁর বয়স তখন আট বছর মাত্র। তা হল ১৯১০ সালের কথা। রাধিকাপ্রসাদ তখন মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়ে বহরমপুরে বাস করছেন। তার পাঁচ বছর আগে (১৯০৫) বিশুদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষাদানের জন্যে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন মণীন্দ্র-চন্দ্র। কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রে তখনই খ্যাতনামা হয়েছেন রাধিকা-প্রসাদ। তাঁকেই মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র প্রথম থেকে এই বহরমপুর বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত করেন।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বহরমপুরে শিক্ষা পেতে থাকেন রাধিকাপ্রসাদের কাছে। পিতৃব্যের কাছে তিনি তখন থেকেই বাস করতেন এবং বিধিবদ্ধভাবে সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করেন। বিদ্যাশিক্ষা বা অন্য করণীয় কিছু ছিল না তাঁর। একান্তভাবেই রাধিকাপ্রসাদের নির্দেশে তাঁর কণ্ঠসাধনা ও শিক্ষা অগ্রসর হতে থাকে। সহজাত সুকণ্ঠ তাঁর ছিল। সেই সঙ্গে যুক্ত হল রাধিকাপ্রসাদের উপযুক্ত শিক্ষা।

দিন-রাতের অধিকাংশ সময়ই জ্ঞানেন্দ্রের সঙ্গীতের সাধনে অতিবাহিত হত। রাধিকাপ্রসাদ বহরমপুর থেকে যখন কলকাতায় আসতেন কিংবা বিষ্ণুপুরে তখনো সঙ্গে থাকতেন ভ্রাতুষ্পুত্র। রাধিকা-প্রসাদের সঙ্গে নানা সঙ্গীতাসরেও উপস্থিত হতেন। এইভাবে গঠিত হতে থাকে জ্ঞানেন্দ্রের সঙ্গীতজীবন।

তারপর রাধিকাপ্রসাদ বহরমপুরের সঙ্গীত বিদ্যালয় থেকে অবসর নেন। স্থায়ী হন কলকাতায়। তা সম্ভবত ১৯১৯ সালের কথা। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদও তাঁর সঙ্গে থাকেন।

রাধিকাপ্রসাদ এবার কলকাতা নিবাসী হন ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের আতিথ্যে। তাঁর পাথুরিয়াঘাটা আবাসের সদর মহলে তিনতলায় রাধিকাপ্রসাদের বাসের জন্যে স্থান নির্দিষ্ট ছিল। তখনো তাঁর সঙ্গে থেকে নিয়মিত সঙ্গীতশিক্ষা করতেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। ধ্রুপদ ও খেয়াল দুই অঙ্গেরই সাধক ও গায়ক ছিলেন রাধিকাপ্রসাদ। ভ্রাতুষ্পুত্রকেও প্রথম থেকেই ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা দিতেন।

ওই ১৯১৯ সালেই রাধিকাপ্রসাদের প্রধান শিষ্য ধ্রুপদী মহীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তারপর মহীন্দ্রের শিষ্যরা—ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ আসেন রাধিকাপ্রসাদের কাছে। তাঁর শিক্ষাধীনে সঙ্গীতচর্চা করতে থাকেন।

তাঁদের মধ্যে আর একজন ছিলেন মহীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র ললিতচন্দ্র। পিতার সুযোগ্য শিষ্য এবং অতি মধুরকণ্ঠ ললিতচন্দ্রও রাধিকাপ্রসাদের কাছে শিখতে থাকেন। শুধু ধ্রুপদই গাইতেন ললিতচন্দ্র। তাঁর চেয়ে চার বছরের কনিষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ তখন শিক্ষার্থী হলেও আসরে গাইবার উপযুক্ত হয়েছিলেন।

রাধিকাপ্রসাদের জীবিতকালেই ললিতচন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ যুগলবন্দী ধ্রুপদ গাইতেন আসরে। গুরুভ্রাতার সেই সাঙ্গীতিক সম্পর্ক তাঁদের মধ্যে দীর্ঘকাল ছিল। এই দুই মাধুর্যময় কণ্ঠের জুটিতে ধ্রুপদ গান পরম উপভোগ্য হত সেকালে। দুজনের মৃত্যুও হয় এক বছর আগে পরে। ১৯৪৪ সালে ললিতচন্দ্র বিগত হন ছেচল্লিশ বছর বয়সে।

রাধিকাপ্রসাদ জ্ঞানেন্দ্রকে নিয়ে ক'বছর পাথুরিয়াঘাটায় বাস করেছিলেন। তারপর ভূপেন্দ্রকৃষ্ণেরই মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের এক বাড়িতে ছিলেন কিছুদিন। সে সময় তিনি সপরিবারে কলকাতাবাসী হন, সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদও থাকেন। তারপর ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে লক্ষ্ণৌ নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে যোগ দিতে যান রাধিকাপ্রসাদ সেই বাড়ি থেকেই। আর লক্ষ্ণৌ থেকে ফেরার পরই ১৯২৫ সালের জানুয়ারীতে পরলোকগত হন। ইন্দ্রপতন ঘটে যায় বাংলার সঙ্গীতসমাজে।

তাঁর কাছে ১৯১০ থেকে সেই ১৯২৪ সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে গান শিখেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। রাধিকাপ্রসাদের পুরো তালিমে তিনি গঠিত হয়েছিলেন। প্রিয় শিষ্য মহীন্দ্রের মৃত্যুর পর গোঁসাইজীর শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক হন তাঁর এই একান্ত স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র।

ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের ভবনে প্রথম যখন আসেন রাধিকাপ্রসাদ, ঘোষ মহাশয়কে বলেন, 'জ্ঞেমুর হবে। ওকে এখানে রাখব।'

তাঁর আদরের জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের হয়েছিল ঠিকই। সার্থকতায় শ্রীমণ্ডিত হয়েছিল তাঁর সঙ্গীতজীবন। রাধিকাপ্রসাদের মৃত্যুকালে তিনি একুশ বছরের যুবক ও পূর্ণ বিকশিত, সিদ্ধ ধ্রুপদ-খেয়াল গায়ক। সঙ্গীতসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে তাঁকে বিশেষ কষ্ট পেতে হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সঙ্গীতগুণে লাভ করেছিলেন যশ ও সম্মানের আসন।

সঙ্গীতজীবনের প্রথম থেকেই ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষকে তিনি এক প্রধান পৃষ্ঠপোষক পেয়েছিলেন। তাঁর আনুকূল্যে এবং গৃহেই পরে তিনি পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর ও ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কাছে শিক্ষার সুযোগ পান কয়েকবার। রাধিকাপ্রসাদের মৃত্যুর পরও কয়েক বছর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বাস করেছিলেন তাঁর পাথুরিয়াঘাটা ভবনে। আর তাঁর নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের শিল্পীরূপে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ প্রথম থেকেই যুক্ত থাকেন। রাধিকাপ্রসাদের মতন তাঁর সঙ্গীত-জীবনেও অচ্ছেদ্য ছিল ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের উদার হৃদয়ের সহযোগিতা ও আনুকূল্য।

পাথুরিয়াঘাটা থেকে পরে তিনি কলকাতায় বিভিন্ন স্থানে বাস করেছিলেন। কিন্তু ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের গৃহে যাতায়াত ও সঙ্গীত-জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাঁর বিদ্যমান থাকে জীবনের শেষের পর্ব পর্যন্ত। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র মন্মথনাথ রাধিকাপ্রসাদের সঙ্গীতশিষ্য ছিলেন বলে তাঁর সঙ্গেও জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের আন্তরিক প্রীতির সম্বন্ধ ছিল।

ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের গৃহে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ১৯২৮-২৯ পর্যন্ত ছিলেন। তারপর উত্তর কলকাতার নানা জায়গায় থাকেন অস্থায়ীভাবে। আমহার্স্ট স্ট্রীটে। মহাকালী পাঠশালায়। ঘোষ লেনে। চাচার হোটেলে, ইত্যাদি হয়ে শেষ বছর দুয়েক ৩ সি মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীটে।

এটি পুঁটিয়া রাজবংশের কলকাতা আবাস এবং এখান থেকেই জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বিষ্ণুপুরে শেষবার যাত্রা করেছিলেন।

কলকাতায় জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ পেয়েছিলেন নানা গুণমুগ্ধ অনুরাগী। যেমন পুঁটিয়ার রাজবাড়ি কিংবা পাথুরিয়াঘাটার ভবন। তেমনি বাগবাজারের পশুপতিনাথ বসুব গৃহ প্রভৃতিতেও তাঁর সাদর স্থান ছিল। পশুপতিনাথের বংশধর অনাথনাথ তাঁর সঙ্গীত-গুণের জন্যে ছিলেন এক দরদী পৃষ্ঠপোষক।

ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ছাড়া কলকাতায় আর যে সব আসরে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের গান বেশী হত, তা হল—জোড়াবাগান স্ট্রীটের দেবীপ্রসন্ন ঘোষের বাড়ি। রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটের বিশ্বনাথ সান্যালের বাড়ি। বাগ-বাজারের কালিবাবু নামে সুপরিচিত উক্ত অনাথনাথ বসুর বাড়ি। ভগবতীপ্রসাদ খাঁ চৌধুরীর অর্থাৎ পুঁটিয়ার রাজবাড়ি। বাগবাজারের বলরাম মন্দির। ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনী প্রভৃতি। কলকাতার বাইরে মহিষাদল রাজবাড়িতে তাঁর আসর বহুবার হয়েছে।

তা ছাড়া সঙ্গীতই তো ছিল তাঁর জীবনের বৃত্তি ও অবলম্বন। সেজন্যে কলকাতা ও আশেপাশের নানা আসরে তিনি মুজরো করতে যেতেন। যথেষ্ট নাম ডাক তাঁর হয়েছিল সঙ্গীতজগতে। কিন্তু তখনকার আর্থিক মান অনুযায়ী তাঁর মুজরো ছিল এক আসরের জন্যে ত্রিশ টাকা মাত্র। তবে সেসব তাঁর কাছে বাহ্য ছিল। সন্তুষ্ট-চিত্ত থাকতেন তিনি সুরের ধ্যানে, আবাহনে, পরিবেশনে। সরল মন, সত্যকার শিল্পী-প্রাণ। সুরে নিমগ্ন থাকতেই শ্রেষ্ঠ আরাম বোধ করতেন। কলকাতারই বাসিন্দা থাকতেন বেশীর ভাগ সময়। তখন উপার্জনের সব অর্থ এক ছাত্রের কাছে গচ্ছিত রাখতেন; আসরের মুজরো, গ্রামোফোনের আয়, বেতারের রোজগার ইত্যাদি। আর প্রয়োজন মতন নিতেন। হিসেব চাইতেন না কখনো। সে ছাত্র আবার অতি দরিদ্র। কিন্তু তাঁর নিষ্ঠা দেখে বিনামূল্যে তিনি তাঁকে শেখাতেন। আর কি সহানুভূতিশীল মন।

তাই এক একদিন শিষ্যের মুখ লক্ষ্য করে বলতেন, 'এমন শুকনো শুকনো কেন দেখাচ্ছে রে? খাওয়া হয়নি নাকি?'

'আজ্ঞে না। ঘরে কিছু নেই।'

গুরু ধমক দিয়ে উঠতেন, 'বলেছি না, যখনই দরকার পড়বে ওই টাকা থেকে নিবি?'

হাত জোড় করে শিষ্য বলতেন, 'আপনার কত সময় নষ্ট করে অমনি আমায় দয়া করে গান শেখান। আর কি আপনার ঋণ বাড়াতে পারি?'

বিষম রেগে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ জানাতেন, 'ফের যদি কোনদিন জানতে পারি যে না খেয়ে আছিস, তোকে গান শেখানো বন্ধ করে দেব।'

শিষ্য কিন্তু কোনদিন জানতে দেননি নিজের অনাহারে থাকবার কথা। আর কখনো গুরুর উপার্জিত অর্থ স্পর্শও করেননি। সঙ্গীত-শিক্ষাও পেতে থাকেন অবাধে।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গীতশিষ্য বলে কয়েকজনেরই নাম করা যায়। যেমন—নলিনচন্দ্র মালাকার, ধীরেন্দ্রনাথ ঘটক, জয়কৃষ্ণ সান্যাল, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ভগবতীচরণ খাঁ চৌধুরী (পুঁটিয়া), ওঁকারনাথ চট্টোপাধ্যায় (বাঁকুড়া) প্রভৃতি।

এঁদের মধ্যে একজন হলেন কাশীর সেই মঞ্জুলিকা বাঈয়ের ছাত্রটি। মঞ্জুলিকা বাঈয়ের মৃত্যুর অনেকদিন পরে হঠাৎ তাঁর কথা ফলে গেল।

সেদিন গানের আসর বসেছে বিডন স্ট্রীটে শ্রী জে. সি. ব্যানার্জীর বাড়িতে। এক তরুণ গায়ক গান আরম্ভ করেছেন। বিলম্বিত লয়ের বন্দেশী একখানি ইমন কল্যাণের খেয়াল। এমন সময় আসরে একটুখানি চাঞ্চল্য জাগল।

গায়ক দেখলেন—এক সুপুরুষ ব্যক্তি এলেন আসরে। তাঁর দিকে চেয়েই শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন জেগেছিল। ভদ্রলোক এসে সরাসরি বসলেন গানের জায়গাতেই।

তারপর গান একটুখানি শুনেই মজলিসী ঢঙে বলে উঠলেন, 'বাঃ বাঃ ভাই।'

আর গানের ক্ষণিক বিরতির সময় গায়ককে বললেন, 'বেশ হচ্ছে। চমৎকার চাল তো। আমিও সঙ্গে গাই, কেমন? গানটা বড় গাইতে ইচ্ছে করছে।'

বলেই ধরে নিলেন গানখানি। আর তাঁর মধুর, দরাজ গলায় সুর একেবারে ছাপিয়ে পড়তে লাগল।

তরুণ গায়কটি সঙ্কোচে গান বন্ধ করতে ভদ্রলোক বললেন, 'থামলে কেন? গাও।'

শেষ পর্যন্ত গাওয়ালেন নিজের সঙ্গে। এমন অযাচিতভাবে এবং এক অখ্যাত গায়কের সঙ্গে জুটিতে গাওয়া—অথচ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের লেশমাত্র চেষ্টাও নেই। এমন নিরভিমান, অকৃত্রিম, আত্মভোলা, সুরপাগল। কে এই অসাধারণ গায়ক-শিল্পী? আব কি রূপবান পুরুষ? চোখ মুখ ভ্রূ কপাল কেশদাম—সব মিলে তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তরুণ গায়কটি। আর শ্রোতাদের অস্ফুট গুঞ্জন শুনলেন 'জ্ঞানবাবু। জ্ঞান গোস্বামী।'

সেই কাশীতে মঞ্জুলিকা বাঈয়ের ঘরে শোনা জ্ঞান গোস্বামী? সেই নিঝুম রাতের দরবারি কানাড়ার জ্ঞান গোস্বামী? কি আশ্চর্য! এতদিন পরে যোগাযোগ ঘটে গেল তাঁর সঙ্গে!

সেই জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীই তখন তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমার গলাটি তো বেশ ভাই। আর এমন সুন্দর হিন্দুস্থানী উচ্চারণ কি করে করলে? পশ্চিমে গান শিখেছ নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কাশীতে মঞ্জুলিকা বাঈয়ের কাছে কিছুদিন শিখেছিলুম।'

'তোমার নাম কি?'

'শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘটক।'

'আমার কাছে শিখবে?'

'যদি দয়া করে শেখান।'

সেই আসরের পর থেকেই জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের তিনি শিষ্য হলেন।

আরো একজন শিখতে চান জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের কাছে। তিনি তাঁকে শেখাতে আরম্ভও করেন। একমাত্র ছাত্রী তাঁর। তরুণী হলেও গ্রামোফোন রেকর্ডের উদীয়মানা গায়িকা। হালকা চালের গান—কিন্তু বড়ই সুকণ্ঠী। পর পর ১৮খানি গান তাঁর রেকর্ড হয়ে যায়। রেকর্ড জগতের এক সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা হন···

কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের পক্ষে কি সুখের হত এ ছাত্রীর সংসর্গ না হলে! জীবন-যাত্রায় প্রকাশ্য রাজপথেই স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করে যেতে পারতেন। হয়ত অন্য রূপ নিত তাঁর জীবনের পরিণাম। তবে তা আরো পরের কথা। পরেই বলা হবে।···

সঙ্গীতজীবনে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ তখন খ্যাতির শীর্ষে উঠেছেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে, বেতারে, আসরে, সম্মেলনে—সকলের মুখে মুখে তখন উচ্চারিত একটি সুনাম—জ্ঞান গোস্বামী। তখনকার হিসেবে অর্থ-ভাগ্যই বা মন্দ কি? কারণ সেই উপার্জনেই তিনি তো সন্তুষ্টচিত্ত।

গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্যে কাজী নজরুলের সঙ্গে তখন তাঁর বেশ হৃদ্যতা হয়েছে। একদিন হৈ হৈ করে নজরুল তাঁর হাত টেনে নিয়ে ভাগ্য বিচার করতে বসলেন। আর উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন, 'ওঃ কি ভাগ্যই করেছেন! কাউকে যদি জুতো পেটা করেন সেও আপনার পায়ে ধরবে।'

হায়! ভাগ্য তো অদৃষ্ট! সেদিন নজরুলের ভবিষ্যদ্বাণীতে ভাগ্য-দেবতা হয়ত অলক্ষ্যে হেসেছিলেন।

কিমাশ্চর্যম্!

সেই সরল মুক্ত-স্বভাব ভাব-পাগল শিল্পী! তাঁর সে একান্ত সঙ্গীতময় জীবন কি জটিল হয়ে উঠল শেষে। কত কুট গ্রন্থিতে বদ্ধ

হয়ে গেল। আর তিনি সেই সব গ্রন্থি-ছেদ করতে গেলেন কি শোচনীয় উপায়ে।

বিভিন্ন রকমের দুর্দৈব। আর তার যোগফলে অকল্পনীয় পরিস্থিতি।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের সুরের প্রাণ এসবের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তিনি ক্লিষ্ট হতে লাগলেন বিরূপ পরিবেশে। প্রতিকূলতা রূঢ়তর এবং ক্রমেই বাড়তে লাগল। ঘনিয়ে এল নানা সঙ্কট। আর সেই সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল তাঁর ব্যক্তিগত ট্রাজেডি। একটির পর একটি কিংবা একাধিক একই সঙ্গে, তা বলা যাবে না। তার প্রয়োজনও নেই। সময়টা হয়ত তিন-চার বছর হতে পারে। সবই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। সেই যখন থেকে অন্তর-সভ্যতার অনেক মূল্যমান একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

সেই সময় আসরের শিল্পী জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ লক্ষ্য করলেন শ্রোতাদের মন কিরকম তরল হয়ে পড়ছে। খাটো হয়ে যাচ্ছে গানের মান, আসরের মর্যাদা। অযোগ্যের অনুষ্ঠান। বাগরূপে ব্যভিচার। নিষ্ঠা উধাও। সস্তায় কিস্তিমাৎ। অথচ আসরে যেতেও হয়। কারণ এ-ই অবলম্বন এবং জীবনের নিঃশ্বাস-বায়ু। কিন্তু সাঙ্গীতিক আদর্শ ও রুচিকে তো বিসর্জন দেওয়া যায় না।

তাই নিজের গান হয়ে গেলেই অস্থির হয়ে ওঠেন। শিষ্য সঙ্গীদের বলেন, 'এখনি ট্যাক্সি ডাক। পালাই। কান ঝালাপালা হয়ে গেছে রে।'

তখন গান নিয়ে বেসাতি পুরোদস্তুর আরম্ভ হয়েছে। বহুজনের কাছ থেকে পয়সা রোজগারের মাধ্যম দেখা দিয়েছে—সবাক সচিত্র। ইতর রুচির চাহিদা শুধু পূরণ হচ্ছে না। অপ-রুচি সৃষ্টি করাও চলেছে। দুষ্ট ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে সেজন্যেই সুরের জগতে এসেছে বিকট নৈরাজ্য। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের শিল্পী-চিত্র বিপর্যস্ত বোধ করতে লাগল। কিন্তু নিরুপায়। অথচ কানে আসে সবই।

কত মতলবের পেশাদারই তখন দেখা দিচ্ছেন। ওই আবোল-তাবোল সুরের কারবারী হয়ে বরাত ফেরাতে চান এমন কেউ কেউ আবার শিখতেও আসেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের কাছে। এখান থেকে কিছু আদায় করে পয়সা রোজগারের ধান্দায় যদি কাজে লাগে।

স্পষ্টবক্তা জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ তাঁদের মুখের ওপর বলে দেন, 'ওই সব দিকেই থাকুন। শাঁস আছে ওখানে। এসব শিখতে বড় খাটুনি। আর আপনাদের গলা দিয়ে এরকম কাজ বেরুবে?' বলে একটু তানকারি দেখিয়ে দিলেন। তখন পালিয়ে বাঁচলেন আধুনিক গানের সুরকাররা।

তাঁরা না হয় গেলেন। কিন্তু সঙ্গীত-জগতে আরো ভয়ঙ্কর দুর্দিন ঘনিয়ে এল যে। মহাযুদ্ধের মধ্য পর্যায়ে কলকাতার বুকে অন্ধকার নামল। সন্ধ্যার পর থেকে শহর নিষ্প্রদীপ। বিমান আক্রমণের আশঙ্কা এবং তার প্রতিরোধের মহড়া। সমস্ত পথ থেকে আলো বর্জিত হল। আলোকিত বাড়ি-ঘরে সব জানলা বন্ধ। লেশমাত্র আলোক যেন বাইরে না আসে। কিন্তু সঙ্গীতের জগৎ আলোর জগৎ, মুক্ত প্রাণের আরাম-ক্ষেত্র। এই শ্বাসরোধক পরিস্থিতিতে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের এবং সকল গুণীরই সঙ্গীতজীবন হয়ে উঠল দুর্বিষহ। আসর ক্রমে স্বল্পতর হতে লাগল। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও বিলুপ্ত হল বোমার আতঙ্কে। ক্রমবর্ধমান শহর-ত্যাগীদের ফলে কলকাতা প্রায় জনশূন্য মূর্তি ধারণ করল। সঙ্গীতের আসর সেই অদ্ভুত অবস্থায় যেন হাসির কথা।

হতাশ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ছাত্রদের বললেন, 'আর তো কলকাতায় থাকা যায় না। দেশেই ফিরে যাব। কিন্তু গানের কি হবে রে? আর আসর এমন ঘুচে গেলে আমি বাঁচব কি নিয়ে?'

সেই থেকেই তাঁর দেশে অর্থাৎ বিষ্ণুপুরে যাওয়া, থাকা, অনেক বেশি আরম্ভ হল। আগে কখনো বিষ্ণুপুরে থাকতেন না এতদিন করে।

জনহীন আলোহীন সুরহীন কলকাতা। এতদিনের সঙ্গীত জীবনের অঙ্গাঙ্গী কলকাতার সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের বিচ্ছেদ ঘটতে লাগল। এই বিধ্বস্ত নাগরিক-জীবনে তাঁর সাঙ্গীতিক অস্তিত্বের ক্ষতি হল অবর্ণণীয়।

আর অন্তর্জীবনে সেই বিপর্যয়। রেকর্ড জগতের সেই তরুণী গায়িকা। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গীতকণ্ঠে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে গান শিখতে আরম্ভ করেন। আর সঙ্গীত-শিক্ষা শুরু করে ক্রমে রূপ-মুগ্ধা হলেন তাঁর সুদর্শন পুরুষকান্তিতে।

সমাজ নামক বস্তুটি তখনো কিছু ছিল। সেই নিরিখে গায়িকার পরিচয় দিতে হয়—তিনি সমাজ-বহির্ভূতা। তবে নিম্নকোটির নন। শালীন, পরিশীলিত। সেই স্বাধীনা অর্থশালিনীর কাছে সব সমাজ-বিধি, লোকাচার নস্যাৎ হয়ে ছিল। আর এত বড় শিল্পীর গানে মুগ্ধা। রূপমুগ্ধা। সুতরাং শুরু হল, সেই চিরন্তন 'নারীর ললিতলোভন লীলা'—আর অজস্র ছলাকলা।

তবু জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ হয়ত অটল থাকতেন। কিংবা চরিত্রচ্যুতির সম্ভাবনায় বিচ্ছিন্ন করে আনতেন নিজেকে। কিন্তু গায়িকা মধুর-কণ্ঠী হয়েই সুরশিল্পীর কাল হল। সুর-পাগল, সুমিষ্ট-কণ্ঠের পাগল জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ক্রমে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন কিন্নরীতে।

তখন তিনি অতি প্রসিদ্ধ গায়ক। সুতরাং কলকাতার সঙ্গীত-ক্ষেত্রে সংবাদটি প্রচারিত হয়ে গেল। অনেক বাঙালী-চরিত্র পরিতৃপ্ত হল এই মুখরোচক খবরে। কিন্তু অনেকে দুঃখ পেলেন। কেউ বা মর্মাহত হয়ে মন্তব্য করলেন, 'জ্ঞানবাবু এ কি করলেন! এমন গলাটি যাবে।'

কিন্তু না। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ সে মনোরম মোহপাশ ছিন্ন করেছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই। তাঁর অন্তরের সংস্কারই তাঁকে রক্ষা করেছিল। কিন্তু তাঁর মনে অতিশয় তীব্র হয়েছিল এই দুর্গতির প্রতিক্রিয়া। গায়িকা সংসর্গকে তিনি পদস্খলন বলেই গণ্য করতেন এবং তাঁর

মর্মযাতনার সীমা ছিল না। বাইরের সমাজে প্রকাশ পায়নি তাঁর অন্তর্দাহের কথা। কিন্তু ঘনিষ্ঠ মহল তা জানতেন।

অন্তরঙ্গ বন্ধুজনের কাছে তিনি সে সময় বলতেন, 'শ্রীনিবাস ঠাকুরের বংশে জন্মে এমন দুর্মতি আমার।'

হয়ত কোন অনুরাগী বন্ধু-গৃহে অতিথি হয়েছেন। রাত্রে শয়ন করেছেন এক কক্ষে। মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে বন্ধু দেখেন, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ শয্যায় নেই। ঘরে আলো জ্বেলেছেন, দাঁড়িয়ে আছেন আয়নার সামনে। একদৃষ্টে নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখছেন আর গালে চিবুকে হাত দিয়ে বিড়বিড় করছেন—'এই আমি। এই আমি।...'

অনেক বলতেন যে তাঁর বায়ুরোগ শেষ জীবনে খুব বৃদ্ধি পায়। তার সুত্রপাত হয় ওইভাবে।

প্রায়ই নিজেকে ধিক্কার দিতেন। আর সেই অনুশোচনা থেকেই গোপাল-আরাধনার ভাব তাঁর মনে জাগে নতুন করে।

বংশের অনেকদিনের সংস্কার সজাগ হয়ে ওঠে এবং আতিশয্য দেখা দেয়। যেখানে-সেখানে, যার-তার সঙ্গে কথায় গোপালের প্রসঙ্গ আনেন। ক্রমে লোকে এটি মস্তিষ্ক-পীড়া বলে গণ্য করতে থাকে। বাইরে তো প্রকাশ পায় না কার্যকারণের মানসিক গূঢ় সূত্র।

তবে গোপাল-ভক্তির এই আধিক্যতা তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। এই প্রেরণায় প্রকাশ পায় তাঁর ভক্তি-ভাবের গান রচনা। যেমন, কাজী নজরুলের রচিত যে গান তিনি নট রাগে রেকর্ড করেছিলেন, তারই অনুকরণে—

নাচে নাচে আমার গোপাল,
আঁখি প্রেমে ঢলঢল গলে বনমাল॥
যশোদার ননীচোরা ওই ননীচোর
যাদুভরা আঁখি দুটি করেছে বিভোর।
আঁখিতে করেছে আলো জগৎ বিশাল।

নিজের এই গানটিও নট রাগে নিজে গাইতেন। আর একটি

একতালার বিলম্বিত খেয়াল গান রচনা করেন—'জগতের তুমি মা জননী ভবানী···।'

সর্বক্ষণ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের গোপাল-ভাব কিংবা বায়ু-ব্যাধি থেকে শেষে আরো জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তা ছাড়াও তাঁর অন্য প্রসঙ্গ আছে, জীবনের সেই অকাল-অন্তিম অধ্যায়ে।

কোন্ সঙ্কট আগে বা পরে তাঁর জীবনে সেসময় আসে, সেকথা জানা যায়নি। হয়ত সবই সমকালীন। কেউ তা সম্ভবত জানে না। শুধু শোনা যায় নানা বৃত্তান্ত। সবই যুদ্ধের সেই নিষ্প্রদীপ সময়ের কথা।

একবার দেশে যাবার সময় তিনি এক ছাত্রকে বললেন, 'গান বাজনা তো শেষ হবার দাখিল। ভাবছি এবার কাঠের ব্যবসা ধরব। যুদ্ধের সাপ্লাইয়ের কাজ করব।'

তারপর একদিনের কথা। যুদ্ধ তখনো চলেছে।

তখন দুপুরবেলা। সঙ্গীতজগতের সঙ্গে পরিচিত দুজন যাচ্ছিলেন ধর্মতলার মোড়ে। জ্ঞানবাবুর পরিচিত আর গানের ভক্ত তাঁরা।

তখন ট্রাফিক পুলিস একদিকের গাড়ি বন্ধ করে দিয়েছে।

সেই দুজনের একজন হঠাৎ দেখলেন—পাশে একটি মোটর থেমে রয়েছে। তার ড্রাইভারের পেছনের সীটে বসে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ।

'এ কি, জ্ঞানদা যে! গাড়িতে কোথায় যাচ্ছেন?'

'আরে ভাই, আমি যে এখন মিলিটারিতে সাপ্লাই করি।'

দরাজ কণ্ঠে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ জানালেন। আর ভদ্রলোককে দেখে যেন তাঁর সঙ্গীত-জগতের পূর্বস্মৃতি জেগে উঠল। বললেন, 'সারাজীবন গান গেয়ে যা না রোজগার করেছি, এক মাসে তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা পেয়েছি।'

ট্রাফিক পুলিস হাত দেখাতেই গর্জন করে বেরিয়ে গেল তাঁর গাড়ি।

মিলিটারিতে কাঠ, বাঁশ এসব সরবরাহ করেছিলেন তিনি। যুদ্ধের

প্রায় শেষদিক তখন। তবে গান বন্ধ হয়নি। কলকাতার অবস্থা ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ মানসিক সুস্থতা কিংবা স্বাভাবিক.অবস্থা ফিরে আসেনি তাঁর।

এরই মধ্যে সেবার রাঁচিতে একটি বড় আসর হল। সেখানে মুজরো পেলেন তিনি। আর এমন গান শুনিয়ে এলেন যে রাঁচিতে সাড়া পড়ে গেল। দ্যোক্তরা তখনি স্থির করলেন, আবার আসর করলেই তাঁকে আনতে হবে।

অথচ সেই সময়েও কেমন যেন হয়ে থাকতেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। আসরেও আসেন। রেডিওতেও গান। ছাত্রদেরও শেখান। কিন্তু কিরকম যেন। একেবারে আগেকার সেই সদা সুরে ভরপুর, আত্মতৃপ্ত প্রশান্ত হাস্যমুখ, প্রাণোচ্ছল জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ আর নেই। অন্যমনস্ক উদাসীন হয়ে থাকেন অনেক সময়। কলকাতায় আবার আসা-যাওয়া করছেন। কিন্তু ফিরতে পারেননি পূর্বজীবনের পূর্ণ রূপে। জীবনে যেন বীতস্পৃহ।

এক স্নেহাস্পদের বাড়িতে হয়ত আহারে বসেছেন। হঠাৎ হাত গুটিয়ে নিলেন। পাশে কেউ জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল, খাবেন না?'

'লুচিগুলো কাঁচা।'

'কাঁচা? না না, এই তো আমি খাচ্ছি। ভালই ভাজা হয়েছে।'

'কাঁচা নেই?' অন্যমনস্ক জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বললেন, 'তা হবে।'

কখনো আবার কাউকে এমন ধরনে কথা বলেন যেন আর বেশিদিন বাঁচবেন না। নানা প্রকার মানসিক বিপর্যয়ে শরীর একটু খারাপ হয়েছিল বটে। কিন্তু জীবনের আশঙ্কার মতন কিছু নয়। সেকথা কারুর কল্পনায়ও আসেনি। তখনো থাকতেন ৩ সি মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীটে। কলকাতার বা অন্যত্র আসরে গানও গাইতেন। রেডিওতেও মাসে মাসেই গাইতে যেতেন। এখান থেকেই যাতায়াত করতেন বিষ্ণুপুরে। নিঃসন্তান জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। কিন্তু স্ত্রী ছিলেন সেখানে। ভাইয়েরাও থাকতেন সপরিবারে একান্নবর্তী।

সেবার রেডিওতে গান গেয়ে দেশে চলে গেলেন। যেমন যেতেন মাঝে মাঝেই।

তার কিছুদিন পরে রাঁচি থেকে সেই সম্মেলনের উদ্‌যোগীরা কলকাতায় এলেন। সন্ধান করে তাঁরা এসেছেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের এক ঘনিষ্ঠ শিষ্যের কাছে; গোস্বামী মশায়কে আবার রাঁচিতে নিয়ে যেতে চান।

সেবার রাঁচিতে যা গেয়ে এসেছেন, সবাই আবার তাঁর গান শোনবার জন্যে পাগল। হাতে আর সময় নেই। আজই তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছি আমরা।

'তা কি করে হবে? তিনি তো কলকাতাতেই নেই। বিষ্ণুপুরে আছেন। তাঁকে সেখানে খবর দিয়ে আনাতে সময় লাগবে কদিন।'

'তাহলে আপনি চলুন। আপনি তো গুরুর স্টাইলেই গান। সবাই চিনতে পারবে। আমাদেরও মুখ রক্ষা হবে। একেবারে খালি হাতে আমরা মুখ দেখাতে পারব না রাঁচিতে। পরের বারে জ্ঞানবাবুকে যে করে হোক নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হবে।'

অগত্যা জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের শিষ্য সে রাত্রে রাঁচি যাত্রা করলেন।

তার তিনদিন পরের কথা। রাঁচিতে অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। তিনি ট্রেনে ফিরে আসছিলেন কলকাতায়।

ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে মুরি জংশনে।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের শিষ্য চা খেতে প্ল্যাটফর্মে নেমেছেন। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল সামনের বুক-স্টলে, কাগজের ওপর। বাংলা সংবাদপত্র এসেছে। আর তার প্রথম পাতায় মুদ্রিত সংবাদ—পরলোকে বিখ্যাত গায়ক জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী। মৃত্যুর দিনক্ষণ—২৯ অক্টোবর ১৯৪৫। বাংলা সন ১৩৫২, ১২ কার্তিক বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে।

নির্বোধের মতন তিনি চেয়েই রইলেন কালো কালো অক্ষরগুলির দিকে। তারপর ট্রেনের ঘণ্টা বাজতে উঠে পড়লেন গাড়িতে।

কলকাতার সঙ্গীত-সমাজও এমনি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। রেডিওতে শুনে আর খবরের কাগজে দেখেও বিশ্বাস করতে মন চায়নি কারুর। কিন্তু বিশ্বাস করতেই হল। চিরবিদায় নিয়েছেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। আর কোনদিন তাঁর সামনে বসে সেই কণ্ঠে গান শোনা যাবে না।

অভাবিত শোকের প্রথম আঘাত ক্রমে স্তিমিত হয়ে গেল। তখন কলকাতায় তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের মনে বিষম বিস্ময় জাগল—মাত্র ৪৩ বছর বয়সে অমন সুগঠিত স্বাস্থ্যবান শরীর কালগ্রাসে পড়ল কি করে, এমন অকস্মাৎ! (হৃদরোগের তখন এমন প্রাদুর্ভাব হয়নি এবং তাঁরও সে ব্যাধি ছিল না।) মানসিক অসুখের ফলে শরীরের যে অসুস্থতা তার জন্য জীবননাশ তো হতে পারে না। মৃত্যুর কারণ কি?

অনুসন্ধানের ফলে নানা ধরনের কথা শোনা যেতে লাগল। মৃত্যুর পূর্বদিন নাকি সুস্থ ছিলেন সন্ধ্যার পরেও। তিনি নিজেই নাকি এই মর্মান্তিক পরিণতির জন্যে দায়ী। কিন্তু কিছুকাল ধরেই তিনি নানা অশান্তি ও চাপের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন।

নিজেই ছেদ টেনে দিয়েছেন জীবনে। বিষ পানে।

সে বিষয়েও শোনা যায় বিভিন্ন বৃত্তান্ত।

কেউ বলেন, সেই কাঠের ব্যবসায়ে বেশ ভাল রকম সঞ্চয় তিনি করেছিলেন। কিন্তু তা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত না রেখে এক নিকট আত্মীয়ের কাছে রাখেন। সেই ব্যক্তি আর তা ফেরত দেননি তাঁকে। তারই ফলে মানসিক বৈকল্যের শেষে…

আবার কেউ বলেন—না। সে ব্যক্তি ওই টাকা আত্মসাৎ করেননি। পাছে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ 'গোপাল, গোপাল' ভাবের আতিশয্যে সে সম্পদ ঘুচিয়ে দেন সেজন্য সেই অর্থ গায়কেরই আরো নিকটের মানুষকে দিয়েছিলেন।

আবার শোনা যায়—না। তাঁর সে টাকা কেউই নেননি। তবে

বার বার তাঁকে অনুযোগ করা হত সঞ্চিত অর্থ দিয়ে দেবার জন্য। অভিমানী ভাবপ্রবণ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ তাই সমস্তই হস্তান্তর করে দেন—নাও নাও। আমার চেয়েও টাকাই বড় হল। তা বেশ, আমার আর জীবনের প্রয়োজন কি!...

কে জানে কোন্ বৃত্তান্ত সঠিক। কারণ সবই শোনা কথা। তার থেকে সত্য উদ্ধারের পথ কোথায়?

তবে সকল বিবরণের একটি বিষয়ে দ্বিমত নেই। অতি অল্প দিনে উপার্জিত—সারা সঙ্গীত-জীবনের আয়ের চেয়েও অধিক সেই অর্থই তাঁর চরম অনর্থের মূল হয়েছিল।

অদৃষ্টের কি পরিহাস। জীবনে আগে যিনি টাকায় আসক্ত ছিলেন না, এই উপার্জনও করেছিলেন ঘটনাচক্রে, লোভের বশে নয়—তাই হল তাঁর কাল?

কে জানে। মৃত্যু তো চির রহস্যময়। অমৃতকণ্ঠ জ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদের মৃত্যুও হয়ত রহস্যাবৃতই রইল।

এত বড় গায়ন-শিল্পী এমন অকালে প্রয়াণ করলেন, এ-ই সত্য। তার কারণ সন্ধানে আর কি ফল!

স্মরণ মননের শুধু কিছু চিহ্ন রয়ে গেল। সেই বীর্য মাধুর্যে মেশানো সুরে কয়েকটি রাগের তিন মিনিটের রেশ—বেহাগ। মালকোশ। গৌড়সারঙ্গ। জয়জয়ন্তী। পরজ। ভৈরবী। সিন্ধু কাফি। বাগেশ্রী। মালগুঞ্জ। ইমন নট। কৌশিকী কানাড়া। জৌনপুরী। ছায়ানট। দরবারি কানাড়া—মুগ্ধ শ্রোতার কানে কোন্ সুদূরের সুর ভেসে আসে...

আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়,
সুরে বেদন বাজে গোপন হিয়ায়...

জোয়ারিদার কণ্ঠে সে কি রঞ্জিনী-শক্তি! রেকর্ডখানি শুনলেই থমকে দাঁড়িয়ে যেতে হয়।

আহা, কি গান!

॥ তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥